দ্বিতীয়বারের বিজ্ঞাপন।

প্রথমবারের মুদ্রিত দ্বিসহস্র পুস্তক দুই সপ্তাহের মধ্যে একেবারে নিঃশেষিত হওয়ায়, এবং দেশ বিদেশীয় গুণগ্রাহী গ্রাহক মহোদয়গণ পুস্তক প্রাপ্তির জন্য পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা করায়। ইহা পুনর্ব্বার মুদ্রিত ও প্রচারিত হইল। বিখ্যাত বেদবিদ্ শব্দকল্পদ্রুম সংশোধক শ্রীযুক্ত পণ্ডিত কেদারনাথ বিদ্যাবাচস্পতি এবং পণ্ডিত রামগোপাল স্মৃতিভূষণ প্রভৃতি মহামাননীয় অধ্যাপক মহোদয়গণ তথা আয়ুর্ব্বেদ বিশারদ শ্রীযুক্ত ত্রিপুরাচরণ সেন গুপ্ত ও বাবু কালীশচন্দ্র সেন কবিরাজ প্রভৃতি কৃতবিদ্য বিজ্ঞ ও সহৃদয় শিক্ষক মহোদয়গণ এই গ্রন্থখানি শারীরিক, মানসিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক এবং স্বদেশের প্রগাঢ় উন্নতি সম্বন্ধে সুপবিত্র ও ওজোগুণবিশিষ্ট উপদেশাবলী দ্বারা পরিশোভিত হওয়ায় গ্রন্থখানিকে বঙ্গ বিদ্যালয় সমূহের উচ্চশ্রেণীর ছাত্র ছাত্রিগণের পাঠ্য শ্রেণীতে পরিগণিত করিতে অভিলাষ প্রকাশ করিতেছেন। এজন্য এবারে এই পুস্তকখানি অনেকটা নূতন আকারে প্রকাশিত হইল। এবার অনেক অংশ পরিত্যক্ত, পরিবর্জ্জিত, পরিবর্দ্ধিত ও সংশোধিত হইয়াছে। প্রথম সংস্করণের পুস্তকান্তর্গত যুবকযুবতী ও বারবনিতা বিষয়ক প্রস্তাবদ্বয় বিদ্যালয়ের বালক বালিকা বৃন্দের অনুপযোগী বিবেচনায় তাহা পরিত্যাগ

বিজ্ঞাপন।

কলিকাতা-যুবক-সুহৃৎ সভার অনুমত্যনুসারে আমি এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিলাম।

আমার ঘরণী যাঁহার সহিত বিবাহিত হওয়া অবধি আমি ৩৫।৩৬ বৎসর পর্য্যন্ত ঘরকন্না করিয়াছি, এই দীর্ঘকালের মধ্যে তাঁহাকে একটীও দোষের কথা স্বীকার করাইতে পারি নাই। তিনি কোন দোষ করেন নাই, তবে কি জন্য স্বীকার করিবেন, সে ভাবের কথা এখানে হইতেছে না। তবে কি না স্ত্রী কিছু মোটাবুদ্ধি, সেই স্থূলবুদ্ধি বশতঃ তিনি আত্মদোষ অনুভব করিতে পারেন না; কিন্তু নিজ গুণ বুঝিতে বিলক্ষণ নিপুণ।

অন্নদামঙ্গলে ভারতচন্দ্র যেমন হরপার্ব্বতীর দুঃখ-কন্দল বর্ণনা করিয়াছেন, আমাদেরও উভয়ের মধ্যে সর্ব্বদাই তদ্রূপ দারিদ্র্যকলহ উপস্থিত হইয়া থাকে।

আমরা অপুত্রক, নিরাশ্রয় এবং ঋণগ্রস্ত নির্ধন। আমাদের দুইটী কন্যাসন্তান জন্মিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহারা বিবাহিতা হইয়া যৌবনাবস্থায় অকালে কালগ্রাসে পতিতা হইয়াছে। এখন আমাদের যখন তখন স্ত্রীপুরুষ মধ্যে ভাগ্য-দোষ লইয়াই বিবাদ বাধে।

"স্ত্রীভাগ্যে ধন পুরুষের ভাগ্যে পুত্র।"

এই বচন প্রমাণ আমাদের উভয়ের ভাগ্য সমান; কিন্তু মৎসহধর্ম্মিণী তাহা মানেন না। তিনি সমস্ত দোষই আমার উপরেই অর্পণ করেন। তিনি বলেন "আমার সহিত তোমার বিবাহ হওয়া অবধি ক্রমশই তোমার অবস্থার উন্নতি হইতে ছিল; তুমি দশের মধ্যে পাঁচজন ও তার মধ্যে একজন ছিলে,

বিজ্ঞাপন।

বুঝিয়া চলিতে পারিলে আজ তোমার মহড়া নেয় কে ; কিন্তু তুমি কেবল আপন কর্ম্মদোষে অলস ও হীনবুদ্ধি হইয়া, দীনহীন হইয়াছ এবং শোক ও দুঃখের সাগরে নিজে মগ্ন হইয়া, এ নিরপরাধিনী অবলারেও মজাইয়াছ! বলিতে কি, তুমিই কন্যা দুইটীর অকাল মরণের প্রধান কারণ!! জীবনের উত্তমাংশ যৌবনকাল নষ্ট করতঃ এখন পৈতা পোড়াইয়া ভগবান হইয়া বসিয়াছ! এখন কি আর অনুতাপে শাণে? এ বৃদ্ধবয়সে যে আর কিছুতেই শোধরাইবার উপায় নাই।

'প্রথমে নার্জ্জিতা বিদ্যা, দ্বিতীয়ে নার্জ্জিতং ধনং, তৃতীয়ে নার্জ্জিতং পুণ্যং, চতুর্থে কিং করিষ্যতি।'

এখন আর করিবে কি? ঐ দেখ, অনুতাপের তীব্র তিরস্কার, শোক দুঃখের যন্ত্রণাদায়ী ভীষণ প্রহার, চিন্তানলের দুঃসহ উত্তাপ তোমাকে জর্জ্জরিত ও দগ্ধীভূত করিয়া ফেলিতেছে। পাপের এবং মৃত্যুর বিকটমূর্ত্তি নিকটাগত দেখিয়া, তুমি ক্ষণে ক্ষণে কম্পিতকলেবরে মূর্চ্ছিত হইতেছ! আর মহাভয়ে ভীত হওতঃ অজামিলের ন্যায় এক এক বার অশ্রুজল বিসর্জ্জনপূর্ব্বক 'নারায়ণ, নারায়ণ!' স্মরণ করিতেছ!''

সচিত্র গুপ্তগৃহের অপ্রাসঙ্গিক কথা নহে বলিয়া, গ্রন্থরচয়িতা আপন ক্ষুদ্র গৃহের একটু গুপ্তকথারূপ একখানি কুৎসিত মলিন চিত্র বা দর্পণ বিজ্ঞাপন মধ্যে সন্নিবেশিত করিয়া দিল। হয়ত এতদ্দৃষ্টেই কেহ কেহ আপন আপন সুশ্রীকতা লাভে যত্নবান্ অর্থাৎ সাবধান হইতে পারিবেন।

আর এক কথা এই, গ্রন্থ লিখিত হইলে গ্রন্থকারের একটু পরিচয় জানিতে পাঠকের স্বভাবতঃ ইচ্ছা জন্মিয়া থাকে ; এবং গ্রন্থকারেরাও আপন আপন নাম ধাম ও কুল পরিচয় দিয়া

থাকেন। আমিও আমার পাঠকের নিমিত্ত আমার নিজের ঘরের কথা, শুধু ঘরের কথা কেন, যাঁহাকে লইয়া আমার জীবনের যোগ বিয়োগ, তাঁহারই কথা বলিলাম।

ফলতঃ বাল্যকালে কিরূপ সংসর্গে থাকিয়া, কিরূপ শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া, কিরূপ ক্রিয়াকলাপ ও আচার ব্যবহার করিলে, যৌবনাবস্থায় সুখ স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারা যায়, এবং যৌবন কালে কেমন সংসর্গে থাকিয়া কিরূপে ধন উপার্জ্জন ও সঞ্চয়ন পূর্ব্বক, কিরূপ স্ত্রী ও পুরুষকে বিবাহ করতঃ কি প্রণালীতে পবিত্র দাম্পত্য-প্রেম রক্ষা পুরঃসর ইচ্ছামত সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর বলিষ্ঠ শিষ্ট শান্ত আয়ুষ্মান জ্ঞানবান ভাগ্যবান অপত্যোৎপাদন করিয়া সংসার ধর্ম্ম ও সন্তান সন্ততী প্রতিপালন করিতে হয়; যৌবনকাল ও সৌভাগ্য লক্ষ্মী কিরূপে দীর্ঘকাল রক্ষা করা যায়, দুঃখ ও বিপদ সময়ে কিরূপ ধৈর্য্যযোগে কালযাপন করিতে হয়, কিরূপ ভক্তি শ্রদ্ধা সহকারে বৃদ্ধ জনক জননীর সেবা শুশ্রূষা করিতে হয়,দীন দুঃখী, প্রতিবাসী ও সমাজের সহিত কি প্রকার ব্যবহার করা উচিত, আর কিরূপ নিয়মে চলিতে পারিলে; সুস্থ-শরীরে দীর্ঘজীবী হওয়া যায়, বলিতে কি, যাহাতে পশুত্ব ঘুচিয়া প্রকৃত মনুষ্যত্ব জন্মে, এবং বৃদ্ধ বয়সে নিরুদ্বেগে বিশুদ্ধ ভজন সাধন পূর্ব্বক পরকালের পথ পরিষ্কার করা যায়, তৎসমস্তই অতি সংক্ষেপে সরল ভাষায় স্পষ্টরূপে এই ক্ষুদ্র পুস্তকে বিবৃত হইয়াছে।

আর অতি পুরাকাল হইতে বিশেষতঃ পাশ্চাত্য সভ্যতার সংসর্গে যে যে গুপ্ত মহাপাপ মনুষ্য সমাজে শনৈঃশনৈঃ প্রবেশ করিয়া মনুষ্যকে পশু করিয়া দিতেছে। দুর্ব্বল, ক্ষীণকায় বিকল ও হীনাঙ্গ, দরিদ্র, রুগ্ন এবং অল্পায়ু করিয়া ফেলিতেছে। সমাজ

ছারক্ষার করিতেছে, তাহা পরিষ্কাররূপে প্রদর্শন পূর্ব্বক তৎ-প্রতিকারের উপায় সকলও এই ক্ষুদ্র পুস্তকে প্রকটিত হইয়াছে।

লেখক বৃদ্ধ লোক; সুখ, দুঃখ, ভোগবিলাস, রোগ ও শোক সন্তাপাদি বিশেষ ভুক্তভোগী। সংসার তরঙ্গে অনেক নাকানি চোবানি খাইয়া, আপন ও পর, সৎ, অসৎ, রাজা, কাঙ্গাল, বিদ্বান, মূর্খ, উকীল ও ডাক্তার, বিষয়ী ও উদাসীন, মদ্যপ ও লম্পট এবং সতী, অসতী প্রভৃতির হাতে পড়িয়া, দেখে শুনে ঠেকে শিখে শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক বিষয়ে যে সকল অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছে, তাহার অধিকাংশই এতৎগ্রন্থে প্রচারিত হইয়াছে।

শৈশবাবস্থা হইতেই পিতা মাতা প্রভৃতির যত্নে বালক বালিকারা যদি এই সকল বিষয়ে সুশিক্ষিত হইয়া, যৌবনাবস্থা হইতেই লব্ধজ্ঞানানুযায়ী আচরণ করেন, যদি সম্পদ ও সুখ-সৌভাগ্য সময়ে প্রমত্ত না হইয়া "চিরদিন কখন সমান না যায়" ইহা স্মরণ করতঃ বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্ম প্রবৃত্তির বশোবর্ত্তী থাকিয়া নিরলস ও মিতাচারী হইয়া পরিণাম দৃষ্টি করতঃ বুঝিয়া চলিতে পারেন, আরও যদি বিনয়ী হইয়া মাননীয় প্রাচীন ও জ্ঞানবান মহোদয়গণের মর্য্যাদা রাখিয়া চলেন, তাহা হইলে তাঁহারা আজীবন সুস্থ শরীরে জ্ঞানধর্ম্মে বিভূষিত হওতঃ পুত্র পৌত্রাদি ক্রমে পরম সুখে কালযাপন করিতে পারিবেন সন্দেহ নাই।

কলিকাতা—অধমাশ্রম,
২২ চৈত্র চৈতন্যাব্দ ৪০৩। } গ্রন্থকারস্য।

উপক্রমণিকা।

যেমন আহার দ্বারা শরীর পুষ্টি ও অঙ্গ-চালনার দ্বারা স্বাস্থ্য রক্ষা হয়, তেমনি শিক্ষা দ্বারা জ্ঞানের বৃদ্ধি ও জ্ঞান চর্চ্চার দ্বারা আত্মোন্নতি হইয়া থাকে। এই কারণে আজকাল আত্মোন্নতির নিমিত্ত সকলকেই ব্যস্ত থাকিতে দেখা যাইতেছে। সৎসঙ্গ ও সৎগ্রন্থের আলোচনা ভিন্ন অন্য কোনক্রমেই আত্মোন্নতির সম্ভাবনা নাই। সুতরাং জ্ঞানবান ব্যক্তি মাত্রেই সাধুসঙ্গ লাভে ও সৎগ্রন্থাবলীর আলোচনায় বিশেষ ব্যগ্রতা প্রকাশ করিতেছেন। সেইজন্য অধুনা ভূরিভূরি জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থ ও নানা প্রকার লোক হিতকর শাস্ত্রনিকর প্রচারিত হইতেছে। ত্রিকালজ্ঞ ঋষিগণ প্রণীত লুপ্ত শাস্ত্র সকলের অর্থাৎ যোগ-শাস্ত্র, জ্যোতিষ-শাস্ত্র, চিকিৎসা শাস্ত্র, সঙ্গীতশাস্ত্র ও ধর্ম্মশাস্ত্রাদি বিবিধ শাস্ত্রের পুনরুদ্ধার হইয়া বঙ্গসাহিত্যের শক্তি বৃদ্ধি করিতেছে। সমাজের জ্ঞান পিপাসা ও সেই পিপাসা শান্তির অর্থাৎ জ্ঞানোন্নতির সঙ্গে সঙ্গেই সাহিত্যেরও উন্নতি হইয়া থাকে। ইহা স্বভাব সিদ্ধ। ইতিহাস পত্রে পত্রে ছত্রে ছত্রে তাহার প্রমাণ দিতেছে।

যাহা হউক, সাহিত্যের উন্নতি না হইলে কখনই সমাজের উন্নতি হয় না। সাহিত্যের উন্নতি না হইলে কখনই দুঃখ দারিদ্র ও অকাল মরণাদি নিবারিত হয় না। সাহিত্যের উন্নতি না হইলে কখনই মনুষ্য জ্ঞানধর্ম্মে বিভূষিত হয় না। সাহিত্যের উন্নতি না হইলে মানুষ কখনই সম্পূর্ণ মনুষ্যত্ব লাভে সমর্থ হয় না। বলিতে কি, যখনই যে সমাজে সাহিত্যের উন্নতি হইয়াছে,

তখনই সেই সমাজ রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইংরাজজাতি বণিকবেশে এদেশে এসে সাহিত্যের উৎকর্ষ সহকারে শেষে এক ছত্রাধিপতি রাজা হইয়া বসিয়াছেন। যখন মুসলমান সাহিত্য উন্নত ছিল, মুসলমানেরা তখন রাজা ছিলেন। আর্য্যজাতি সংস্কৃত সাহিত্য উন্নত সময়ে সসাগরা ধরাধিপতি হইয়াছিলেন।

এবার বঙ্গসাহিত্যের পালা। তাই আজি বঙ্গ সাহিত্যের উন্নতি স্রোত অবলোকনে আমাদিগের মনে সেই ভাবী আশা-দেবী আনন্দে নৃত্য করিতেছেন। কিন্তু এখানে গুটিকত অত্যন্ত দুঃখের কথাও বলিতে হইতেছে!! এ হেন সর্ব্বগুণ সম্পন্ন সর্ব্বাভিলাষ সিদ্ধকারী সাহিত্যে কীট জন্মিয়াছে! কীট কীটাণু সকল তাহাতে কিলিবিলি করিতেছে!! যখন দেখিতেছি, পুষ্পে কীট আছে, আমাদের কোমল চক্ষে কীট, লোমকূপে কীট, আবার কিনা শুক্রেও কীট রহিয়াছে, তখন সাহিত্যে কীট না থাকিবে কেন? কীট সৃষ্টি করায় দয়াময় জগৎপিতার কোন মঙ্গলাভিপ্রায় থাকিতে পারে সন্দেহ নাই; কিন্তু সকল স্থলে আমরা তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারি না। তবে অনেক স্থলে কীট সকল যে অত্যন্ত ক্ষতিকর ও বিরক্তিভাজন তাহা আমরা বেশ বুঝিতে পারি। সেই জন্য মনুষ্যেরা কীটবংশ ধ্বংস করিবার কারণ নানা উপায়েরও উদ্ভাবন করিয়া থাকেন।

অধুনা সাহিত্যকীটও সাহিত্য-সংসারে ভয়ানক অনিষ্টকর ও সমাজেরও বিষম বিরক্তিকর হইয়া উঠিয়াছে। বঙ্গদেশে লেখা পড়া জানা লোকের মধ্যে এমন একটীও মনুষ্য নাই, যিনি এই সাহিত্যকীটের দংশনে যন্ত্রণানুভব করেন নাই। ইহাদের পেটের জ্বালায় খাঁটী সাহিত্য পাওয়া ভার হইয়াছে। পুত্তিকা ও পিপিলিকা যাহাতে মুখ দেয়, তাহাই যেমন মাটী

হইয়া যায়, তেমনি সাহিত্য-কীটেরাও যে সাহিত্যেই হাত দিতেছে, তাহাই মাটী করিয়া ফেলিতেছে!! ইহা হতভাগ্য বঙ্গ সমাজের উন্নতির বিশেষ অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে! লোকে অর্থদান করিয়া ধর্ম্মোপার্জ্জন করে, উহারা ধর্ম্ম নষ্ট করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিতেছে। ইহারা বক-ধার্ম্মিক সাজিয়া প্রতারণা ও মিথ্যা কথাকে প্রলোভন আবরণে আচ্ছাদিত করতঃ ধর্ম্মের দোহাই দিয়া যোগী ব্রহ্মচারী, রাজা মহারাজা ও অধ্যাপক পণ্ডিত এবং সভা সমিতি প্রভৃতির কৃত্রিম নাম উল্লেখ করিয়া এরূপভাবে বিজ্ঞাপন প্রচার করে যে, বারবার প্রতারিত হইয়াও সরলবিশ্বাসী মনুষ্য সকল আবার তাহাতেই বিশ্বাস স্থাপন পূর্ব্বক অমৃতের পরিবর্ত্তে গরল ক্রয় করিয়া থাকেন। উক্ত কীটেরা বহুরূপী। ইহাদিগকে চেনা ভার।৹ ইহারা নানা নামে নানা সাজে বিচরণ পূর্ব্বক সমাজকে প্রবঞ্চনা করিতেছে।

আমরা সাহিত্যের উন্নতি উন্নতি করিয়া আহ্লাদিত হইতেছি বটে; কিন্তু সাহিত্য সংসারে প্রবেশ করিলে অন্ধকার দেখিতে হয়, বিষাদ সাগরে মগ্ন হইতে হয়। একে ত সাহিত্য কীটের অত্যাচার, তায় আবার সজীব সাহিত্যের অভাব! আমরা কি মৃত সাহিত্য লইয়া জীবিত বা পরিতৃপ্ত থাকিতে পারি? আমরা সজীব সাহিত্য চাই। কালী মাখা কতকগুলি অক্ষর সমষ্টি সাহিত্য নহে। রাশি রাশি মুদ্রিত পুস্তকও সাহিত্য নয়। মুদ্রাকরেরা কোন কোন খানে সজীব সাহিত্যের হস্তপদ ও মস্তকাদি ছেদন করিয়া মৃতপ্রায় করিয়াছে। কোন কোন স্থলে বা নাক কাণ কাটিয়া দিয়া অঙ্গহীন করিয়া রাখিয়াছে এবং কোন কোন স্থানে সাহিত্যকে একেবারে মুদ্রাযন্ত্রে পিষিয়া মারিয়া ফেলিয়াছে। অধুনা বাঙ্গালা

ভাষাতে যে কয়েকখানি যথার্থ সাহিত্য দেখিতে পাওয়া যায়, প্রকৃত প্রস্তাবে তাহাদের একখানিরও এখনও প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয় নাই।

বাণিজ্য—যাহা অবলম্বন করিয়া ইংরাজগণ ভারত সাম্রাজ্য লাভ করিয়াছেন। যে বাণিজ্য প্রভাবে লক্ষ্মীকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করা যায়। সেই বাণিজ্য বিষয়ক একখানিও সজীব সাহিত্য পুস্তক বহু চেষ্টা করিয়াও আমরা এপর্য্যন্ত প্রাপ্ত হই নাই।

যোগ শাস্ত্র—যাহার আশ্রয় গ্রহণ করিলে ঈশ্বরের সহিত সম্মিলিত হওয়া যায়, ভব যন্ত্রণার অবসান হয়, সেই যোগশাস্ত্রের সজীব সাহিত্য বাঙ্গলা ভাষায় কোথায় ?

"দেবাধীনা জগৎসর্ব্বে মন্ত্রাধীনাশ্চ দেবতা।
তে মন্ত্রা ব্রাহ্মণাধীনা স্তস্মাৎ ব্রাহ্মণ দেবতাঃ॥"

এক্ষণে তন্ত্র মন্ত্র সম্বন্ধে বঙ্গভাষায় যে সমস্ত সাহিত্য পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে, কে সাহসপূর্ব্বক বলিতে পারে যে, তন্মধ্যে কোন সজীবতা বীজ নিহিত আছে।

ঐরূপ জ্যোতিষ ও বিজ্ঞানাদি সম্বন্ধীয় বাঙ্গালা সাহিত্য মাত্রই মৃত। এস্থলে পৃথক্ পৃথক্ করিয়া সে সকলের উল্লেখ করিতে গেলে পুথি বাড়িয়া যায়, তজ্জন্য তাহাতে ক্ষান্ত হইলাম। তবে একটী কথা না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না।

সঙ্গীত বিদ্যা—বাঙ্গালা ভাষায় অধুনা সঙ্গীত শাস্ত্রের অনেক পুস্তক পাওয়া যায়, কিন্তু সে সকল সাহিত্য অৰ্দ্ধমৃতবৎ রহিয়াছে। যথাবিহিত তাহারও প্রাণ প্রতিষ্ঠা করা আবশ্যক। প্রকৃত প্রস্তাবে আলাপচারী করিতে পারিলে, রাগ রাগিণীগণকে মূর্ত্তিমান করিয়া আনয়ন করা যাইতে পারে। রাগ

রাগিণী ত তুচ্ছ কথা—কথিত আছে, রামপ্রসাদ সেনের গানে স্বয়ং মহামায়া আবির্ভূতা হইয়াছিলেন। শিবের গান শুনিয়া স্বয়ং ভগবান্ দ্রব হইয়া যান। তাঁহার পদস্বেদনীরে ত্রিলোক তারিণী গঙ্গাদেবীর উৎপত্তি হয়। *

দ্রবময়ী নাম তাই হয়েছে গঙ্গার।
গঙ্গার মহিমাবাণী, ছার আমি কিবা জানি,
মানিয়াছে ব্যাস মুনি নিজে পরিহার।
এই জানি গঙ্গানামে পাপীর উদ্ধার।

জয়দেব ও বিদ্যাপতি প্রভৃতির গীতিরসে কে না প্রীতিমুগ্ধ হইয়া থাকেন। সঙ্গীতবিদ্যা সম্বন্ধে আরও অনেক অদ্ভুত কাহিনী শুনা যায়। সজীব সাহিত্যের অসাধ্য কিছুই নাই। সাহিত্যের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে রাজত্ব লাভ ত সামান্য বিষয়, অনায়াসে স্বর্গলাভ হয়। স্বয়ং ভগবান সাহিত্যবেশে গীতা ও ভাগবতরূপে সাহিত্য সংসারে অবস্থান করিতেছেন। *

যে সাহিত্য মানবের মনে প্রাণে মিশিয়া অস্থি মাংসময় জড় দেহকে আনন্দময় করিতে না পারে, যে সাহিত্য মনুষ্যকে অষ্টাদশ সিদ্ধি লাভে সহায়তা না করে, যে সাহিত্য গগণ হইতে সূর্য্যদেবকে ভূতলে অবতারণ করিতে না পারে, * যে সাহিত্য ভূত ভবিষ্যৎ বলিতে না পারে, যে সাহিত্য সত্যপালনার্থ মনুষ্যকে স্বহস্তে স্বপুত্র কর্ত্তনে সমর্থ, না করে, যে সাহিত্য সাধুদিগকে প্রেমভক্তি প্রদানে অসমর্থ, যে সাহিত্য মনুষ্য

* কুন্তীদেবী কুমারিকাবস্থায় মন্ত্রবলে ভগবান ভাস্করকে ভূতলে আনয়ন করিয়াছিলেন। সূর্য্য, গঙ্গা ও গীতা ভাগবত যে জড়পদার্থ নহে, উহা চিদ্বস্তু, অষ্টম অধ্যায়ে তাহা স্পষ্ট করিয়া লেখা গিয়াছে।

দেহ অবলোকনে তাহার শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক ভাব বলিয়া দিতে না পারে, যে সাহিত্য বৃদ্ধকে যুবত্বে পরিণত করিতে অপারক, যে সাহিত্য চিরযৌবন দানে অক্ষম, যে সাহিত্য অধ্যয়ন করিতে করিতে রণবাদ্য শ্রবণের ন্যায় পাঠক উন্মত্ত প্রায় হইয়া স্বদেশ উদ্ধারার্থে স্বকীয় শোণিতপাতেও দৃক্‌পাত না করে, যে সাহিত্য পাঠে মানুষ আপনাকে অসার ও ও মৃতের সহোদর * জানিয়া মাটী না হয়; ও যে সাহিত্য মরা মানুষকে জীবনদানে অক্ষম, সে সাহিত্য সাহিত্যই নয়, তাহাই মৃত সাহিত্য।

আর্য্যচিকিৎসা শাস্ত্র কেমন সজীব ছিল! অশ্বিনীকুমার, ধন্বন্তরী ও কশ্যপ মুনি প্রভৃতি কেমন বৈদ্য ছিলেন! তাঁহাদের দর্শনে ও নাম শ্রবণে রোগ সকল আপনা হইতেই পলায়ন করিত। এই কলিতেও অনেক ভাল ভাল কবিরাজ ছিলেন, তাঁহারা মনুষ্যের আকৃতি দেখিয়া, কবে কি রোগে কাহার মৃত্যু হইবে, তাহা বলিতে পারিতেন। কি খাইয়া রোগী পীড়িত হইয়াছে, হস্তধারণপূর্ব্বক নাড়ি পরীক্ষা দ্বারা তাহাও বলিয়া দিতেন।

পদার্থ বিদ্যা সম্বন্ধীয় আর্য্যসাহিত্য বিলক্ষণ সজীব ছিল। দ্রব্যগুণে অসাধ্য সাধন হইত। মরামানুষ বাঁচিয়া উঠিত। অনাহারে যাবজ্জীবন দেহ ধারণ করিতে পারা যাইত। মানুষ কি পশুকে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া ফেলিয়া সেই মাংসখণ্ডগুলি একত্র করতঃ দ্রব্যগুণ দ্বারা পুনর্ব্বার তাহা পূর্ব্ববৎ সংযোজিত করিতে পারা যাইত; এবং দ্রব্যগুণে লৌহাদি ধাতু পদার্থ সকল সুবর্ণে পরিণত হইত। কিন্তু এ হেন পদার্থ বিদ্যা সম্বন্ধে

* এক রাহ্‌সে হোতে হ্যাঁয়, মৃত আউর পুত।
রাম ভজেত পুত হ্যাঁয়, নেহিত মৃতকা মৃত ॥

বাঙ্গালাভাষায় জীবন্ত সাহিত্য এ পর্য্যন্ত একখানিও প্রকাশিত হয় নাই। এ বিষয়ে কতগুলি মৃত সাহিত্য মাত্র পূতিগন্ধ বিকীর্ণকরতঃ জনসমাজের পীড়ার কারণ হইতেছে।

জগতের মধ্যে পাত্র আছে চারি জন।
ধনী ও বিদ্বান, বীর, সাধু-স্নুরতন ॥

সংসারই বল, আর স্বর্গই বল, বীরত্ব প্রদর্শন ভিন্ন কোন স্থানেই আসন প্রাপ্ত হওয়া যায় না। পুরাকালে যুদ্ধবীর, সত্য বীর, দান বীর ও ধর্ম্ম বীর প্রভৃতির উৎপত্তি যে নিতান্ত বিরল ছিল না, সদ্‌গুরু সন্নিধানে সজীব সাহিত্য অধ্যয়ন তাহার একমাত্র কারণ। মৃত সাহিত্য ও মরা গুরু * কি কখন বীর উৎপন্ন করিতে পারে? আমরা মরা গুরুর কাছে মৃত সাহিত্য শিক্ষা করতঃ মৃতবৎ হইয়াই রহিয়াছি।

জাতীয় সাহিত্যের সজীবত্ব সন্দর্শনই আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। সেই উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ হইলেই সমাজের সম্পূর্ণ শ্রীবৃদ্ধি ও উন্নতি সাধন হইতে পারে। সমাজ নরনারীর সমষ্টি মাত্র। সুতরাং নরনারীর সর্ব্বাঙ্গীণ মঙ্গলকামনাই গুপ্ত-গৃহের মূল তাৎপর্য্য। এজন্য বালক বালিকা, যুবক যুবতী ও বৃদ্ধ বৃদ্ধার প্রয়োজনীয় শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক মঙ্গলকর নিয়মাবলী এই গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণের চণ্ডীপাঠ ও মুচীর জুতা সেলাই পর্য্যন্ত সকলই আছে। রাজ রাজেশ্বরী ভিক্টোরিয়া দেবীর অতুল সুখ-সম্পদের কথা আছে, এবং নিরাশ্রয় অনা-

---

* কলির বাজারে মরা গুরুর অসদ্ভাব নাই। ইহারাই বালক বালিকাদের মস্তক ভক্ষণ করিতেছে। মিথ্যাবাদী মদ্যপ ও লম্পট শিক্ষকেরাই মরা গুরু। যাহার হৃদয়ে সাধুতা ও সৎ তেজস্বিতা নাই, সে কিরূপে সৎবীরত্ব শিক্ষা দানে সমর্থ হইবে?

থিনী কাঙ্গালিনী পথের ভিখারিণী হাটচালিস্থিত রোগাতুরা বৃদ্ধা পুটী বৈষ্ণবীর প্রাণত্যাগে তাহার মৃতদেহ রাত্রিকালে শৃগাল কুকুরে ভক্ষণ করিয়া ফেলার কথাও আছে। সতীর সতীত্ব সৌরভ গাথা রহিয়াছে। আর কুলটার নিষ্ঠুরাচারের বিবরণও বর্ণিত হইয়াছে।

ইহাতে সৌর, শাক্ত, শৈব, গাণপত্য ও বৈষ্ণব প্রভৃতির ধর্ম্ম কথা আছে। বুদ্ধিমান পরিশ্রমীর যেরূপ সুখ সৌভাগ্যের কথা আছে, তদ্রূপ নির্ব্বোধ অলস ব্যক্তির দুঃখে শৃগাল কুকুরের ক্রন্দন ধ্বনির প্রতিধ্বনিও ইহাতে ধ্বনিত হইয়াছে। আর মাতৃ স্নেহের অনুপম দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করা গিয়াছে, এবং ভূতের গল্পও আছে। বিশেষতঃ যাহাতে কেহ পাপে পতিত বা পীড়িত হইয়া ঐহিক পারত্রিক সুখে বঞ্চিত না হয় তদ্বিষয় সতর্কার্থে যেমন ঘোষণা দেওয়া গিয়াছে, তেমনি আবার অজ্ঞতা অনব-ধানতাদি দোষে কেহ পাপে পতিত বা পীড়িত হইলে, তাহার প্রতিকারার্থে প্রায়শ্চিত্ত ও চিকিৎসা ব্যবস্থা এবং বিহিত ঔষধাবলি ধারণের নিয়ম ও পথ্যাদি লিখিত হইয়াছে।

অবশেষে অকপট চিত্তে ইয়োরোপীয় মিসনরীদিগের বিশে-ষতঃ ব্যাপ্টিষ্ট মিসনরী মহোদয়গণের সন্নিধানে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি যে, তাঁহারা বঙ্গদেশের প্রতি সদয় হইয়া য়ীহুদীয় ও খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মশাস্ত্র অর্থাৎ বাইবল Holy-Bible বাঙ্গালাভাষায় অনুবাদ করতঃ মুদ্রিত ও প্রচারিত করিয়া বঙ্গ-সাহিত্যের পুষ্টি বর্দ্ধন করিয়াছেন।

রসিকমোহন চট্টোপাধ্যায়, রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন ও মহেশচন্দ্র পাল প্রভৃতি আর্য্যজাতীয় প্রাচীন শাস্ত্রসমূহের মূল ও বঙ্গানুবাদ প্রচার পূর্ব্বক হিন্দুমাত্রেরই অনুরাগভাজন হইয়াছেন।

আর বঙ্গবাসী সম্পাদক শাস্ত্রপ্রকাশ প্রকাশ পূর্ব্বক বঙ্গ-সাহিত্যের বিশেষ উন্নতি ও বাঙ্গালা পুস্তকের পাঠকের সংখ্যা বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি করিয়াছেন। ছয় কোটী বঙ্গবাসীর মধ্যে যতদিন পর্য্যন্ত ছয় লক্ষ বঙ্গসাহিত্য পাঠক উৎপন্ন না হইতেছে, ততদিন পর্য্যন্ত সাহিত্যের অদৃষ্ট আর কিছুতেই সুপ্রসন্ন হইবার নহে; ততদিন পর্য্যন্ত বঙ্গের স্বাধীনতা ও সৌভাগ্য লক্ষ্মী প্রত্যাগতা হইতেছে না। অতএব সাধারণ শিক্ষা সম্বন্ধে সকলের যত্নবান হওয়া কর্ত্তব্য।

আহা! সেই ভাবী শুভদিনের শুভাগমন কি আবার হইবে? অধোপতিত বঙ্গদেশ কি আবার মস্তকোত্তোলন করিবে? শুভ ও সমারোহ কর্ম্মের অগ্রে অগ্রে যেমন চিত্র বিচিত্র নানা প্রকার পতাকার গতি হইয়া থাকে, তেমনি বঙ্গসাহিত্যের পূর্ণ উন্নতির দিনে বঙ্গের স্বাধীনতা ও সৌভাগ্য লক্ষ্মীর সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালা সংবাদ পত্ররূপ পতাকা সকলের অগ্রগতি হইবে।

কৈ, সুরভিপতাকা কি ছয় লক্ষ বাঙ্গালি পাঠ করিয়া থাকেন? নবজীবন কি নবলক্ষ লোকের অবলোকনে আসিয়া থাকে? ঢাকাপ্রকাশ ত ঢাকাই রহিয়াছে। চারুবার্ত্তা কি চারি লক্ষ লোকের লক্ষ্য স্থানীয় হইয়াছে? হিন্দু রঞ্জিকা ও স্বারস্বত পত্র কি হিন্দুমাত্রেরই আদরণীয় হইয়াছে? বঙ্গবাসী কি বঙ্গবাসী-দের ঘরে ঘরে দৃশ্য হইয়া থাকে? বিষয়ী মাত্রেই বৈষয়িক-তত্ত্বে চিত্ত সংযোগ করিলেন না কেন? বাঙ্গালার আদিপত্রিকা সমাচার চন্দ্রিকা দৈনিক আশ্রিতা হইয়াও দিনপাত করিতে পারিতেছেন না! স্বাধীন বাণিজ্যের পক্ষপাতী শ্রীমন্ত-সদা-গরের যে দেশে আদর নাই, সে দেশের উন্নতির আশা করা শূন্যে অট্টালিকা নির্ম্মাণের বাসনার ন্যায়। গরীবকে কে গ্রাহ্য

করে? সহচর শিক্ষিত বাঙ্গালীর সহচর হইল কৈ? এ সকল ভাবিতে গেলে বাস্তবিক কাঁদিতে হয়!!

সোমপ্রকাশ সম্পাদক দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ একখানি দৈনন্দিন জাতি সাধারণ পরাক্রান্ত সমাচার পত্র প্রচারণ পক্ষে অনেক লিখিয়াছিলেন। তিনি বলিতেন, এখন সহস্র সহস্র সভা ও লক্ষ লক্ষ আবেদনে যে ফল না হইবে, একমাত্র পরাক্রান্ত জাতিসাধারণ দৈনন্দিন বাঙ্গালা সংবাদ পত্রের দ্বারা তখন অনায়াসে সে ফল লাভ হইবে। অতএব দৈনিক ও সমাচার চন্দ্রিকা খানিকে জাতি সাধারণ পরাক্রান্ত সংবাদপত্র-রূপে প্রতিষ্ঠিত করিলে বঙ্গসমাজ ও সাহিত্যের সর্ব্বাঙ্গীণ মঙ্গল সাধিত হইতে পারে। মাসিক ॥০ আনা মাত্র ব্যয় স্বীকার পূর্ব্বক ভদ্র বাঙ্গালী মাত্রেই ইহা গ্রহণ করিলে সে ব্যয় তাঁহাদের অপব্যয় হইবে না, তাঁহাদের ভাবী উত্তরাধিকারিগণের পরমমঙ্গলের কারণ হইবে।

আমেরিকা, ইংলণ্ড ইত্যাদি সকল স্বাধীন দেশেই ঐ প্রকার জাতি সাধারণ পরাক্রান্ত দৈনিক সংবাদ পত্র সকল আছে। বিলাতে ডেলি টেলীগ্রাফ, ষ্টাণ্ডার্ড ও টাইম্‌স্ প্রভৃতি পরাক্রান্ত সংবাদ পত্র সকলের প্রত্যেকের বার্ষিক আয় এক একটী সম্রাটের আয়ের তুল্য। ইংরাজেরা ভারতবর্ষে আসিয়া কেবল কলিকাতাতেই ইংলিসম্যান ও ডেলিনিউস প্রভৃতি বৃহদায়তনের দৈনিক পত্র চালাইয়া বিস্তর লাভবান হইতেছেন! আর বাঙ্গালা সমাচার পত্র সম্পাদকেরা ঋণগ্রস্ত হইতেছেন!! ইহা পতিত বাঙ্গালীর আরও অধোগতির লক্ষণ।

যখন দেখা যাইতেছে, সাহিত্য ব্যতীত গতি নাই, তখন এই ঘোরতর সাহিত্য বিপ্লবের সময় পরিণামদর্শী চিন্তাশীল

সহৃদয় হিন্দু মহোদয়গণের নিশ্চিন্ত থাকা কোন ক্রমেই উচিত নয়। আমরা বিশেষ ব্যগ্রতার সহিত নিবেদন করিতেছি, আপনারা একবার গাত্রোত্থান করতঃ যথা কর্ত্তব্যাবধারণ করুন, আর উদাসীন থাকিবেন না। যদি এবিষয়ে ঔদাসীন্য অবলম্বন করেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই দেশ উচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে ও সেই সঙ্গে আপনাদের ভাবী উত্তরাধিকারিগণও দুর্দ্দশা-পঙ্কে পড়িয়া হাবু ডুবু খাইতে থাকিবে!!

যাহা হউক এখন প্রকৃত প্রস্তাবের অবতারণা করা যাইতেছে। যথা সময়ে যথাবিহিত শিক্ষার অভাব ও পরমেশ্বর প্রতিষ্ঠিত মঙ্গলকর নিয়ম নিকর অজ্ঞাত থাকা ও সেই নিয়মাবলী নিশ্ছিদ্ররূপে প্রতিপালিত না হওয়া বশতঃ মনুষ্য সমাজের নিদারুণ দুর্দ্দশা উপস্থিত হইয়াছে।

একটী স্ত্রীলোক দশ মাস দশ দিনে পূর্ণ গর্ভবতী হইয়া প্রসব বেদনা উপস্থিতে সন্তান প্রসব করিতে না পারিয়া ভয়ঙ্কর যন্ত্রণা সহ্য করিতে অক্ষম হইয়া, গর্ভস্থ সন্তানসহ কাল কবলে কবলিত হইল! এই দুর্ঘটনা দর্শন করা দূরে থাক্, শ্রবণ মাত্র শরীর শিহরিয়া উঠে। এ বিষয়ে দয়াময় ঈশ্বরের নিয়ম সুচারুরূপে প্রতিপালিত হইলে স্ত্রীলোকটী নির্ব্বিঘ্নে নীরোগী দীর্ঘজীবী সন্তান প্রসব করিয়া সুখ স্বচ্ছন্দে কালযাপন করিতে পারিত সন্দেহ নাই। কিন্তু দম্পতী সেই নিয়ম ভঙ্গ করায় হৃদয় বিদারক এই শোচনীয় ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে। স্ত্রীলোকদের গর্ভ সম্বন্ধীয় নিয়ম সকল স্থলেই লঙ্ঘিত হইতেছে, কিন্তু এস্থলে তাহার আতিশয্য হওয়ায় এই গরলময় ফল উৎপন্ন হইল।

একটী শিশু জন্মান্ধ হইয়া ভূমিষ্ঠ হইল। গর্ভাধান ও গর্ভ

সম্বন্ধীয় নিয়ম লঙ্ঘন এবং শিশুর পূর্ব্বজন্মকৃত পাপই ইহার মূলীভূত কারণ। আর একটী বালক যৌবনের প্রারম্ভেই শমন সদনে গমন করিল, অনুসন্ধান করিলে জানা যাইবে যে তাহার পিতামাতার বা তাহার নিজের শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘন দোষেই এই দুর্ঘটনা হইয়াছে। এইরূপ শোচনীয় ব্যাপার জগতে যে অহরহ কত ঘটিতেছে, তাহার আর ইয়ত্তা নাই। মনুষ্য সুস্থ শরীর, সবল ও দীর্ঘজীবী না হইলে কথনই মনুষ্যত্ব লাভে সমর্থ হয় না। ধর্ম্মই যে মনুষ্য জীবনের একমাত্র লক্ষ্য, তিনি তৎ সাধনেও কৃতকার্য্য হইতে পারেন না।

অতএব আদৌ ঈশ্বরের মঙ্গলময় নিয়মচয় অবগত হইয়া পরিমিত মত আহার বিহারাদি সুখ সম্ভোগ ও বিশুদ্ধ আমোদ প্রমোদ উপভোগ করিলে, মানুষের কাঙ্খিত উন্নতি লাভ হইতে পারে সন্দেহ নাই। বাল্যকালে জ্ঞানলাভের সঙ্গে সঙ্গে যদি নিয়মানুযায়ী পরিমিত আহার বিহার, পরিমিত ইন্দ্রিয় সেবন করা যায়, ব্যভিচারাদি ক্রিয়া হইতে বিরত থাকা যায়, তাহা হইলে আর আমাদিগকে দুঃখ দারিদ্র রোগ শোক অকাল মৃত্যু, ক্ষীণদৃষ্টি, হীনবল, নির্ব্বীর্য্য ও যৌবনে বার্দ্ধক্য আদি বিবিধ উৎপাত ভোগ করিতে হয় না।

যাহা হউক, অধুনা অজ্ঞানতাপ্রযুক্ত যাহারা অনিয়মিত বা অপরিমিত ইন্দ্রিয় সেবন, মদ্যপান, রাত্রিজাগরণাদি দোষে যৌবনে বৃদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন বা ধ্বজ ভঙ্গাদি বশতঃ সন্তানোৎ-পাদনে অক্ষম, তাঁহাদের হিতার্থ ঐ সকল পীড়া উপশমের ঔষধাদি প্রয়োগের সুব্যবস্থা করিয়া দেওয়া গিয়াছে। অতি পুতাত্মা পুণ্যাত্মা রাজা যযাতি যখন জরাগ্রস্ত হইয়াও পুত্রের যৌবন গ্রহণ পূর্ব্বক ভোগ বিলাসে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তখন

এখন যাঁহারা যৌবনে বার্দ্ধক্যাবস্থা বা ধ্বজভঙ্গত্ব প্রাপ্ত হইয়া ভোগ বিলাসে বঞ্চিত হইতেছেন, বা অপত্যোৎপাদনে অক্ষম আছেন, তাঁহারা যদি ঔষধ সেবনাদি দ্বারা পুনরায় যৌবন দশা ও শিশ্ন সবলতা প্রাপ্ত হইয়া বিশুদ্ধ বিলাসসুখ উপভোগ করেন বা করিতে চেষ্টা করেন, তাহাতে দোষ কি আছে?

সচিত্র গুপ্তগৃহ।

প্রথম অধ্যায়।

শিক্ষা ও সঙ্গ।

"আপদা কথিতা পন্থা ইন্দ্রিয়ানামসংযমঃ।
তজ্জয়ঃ সম্পদা মার্গং যেনেষ্টং তেন গম্যতাম্ ॥"
আপদের পথ ইন্দ্রিয়ের অদমন।
সম্পদের পথ হয় ইন্দ্রিয় দমন ॥
এইরূপ দুই পথ আছে বিদ্যমান।
যে পথে গমন ইচ্ছা করহ পয়ান।

(চাণক্য)

সচ্চিদানন্দময় দয়ার সাগর পরমেশ্বর মনুষ্যদিগের মঙ্গল কামনায় অনন্ত উন্নতিশীল কল্যাণকর নিয়ম নিকর সংস্থাপন-পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে সদসদ্বোধ অর্থাৎ বিবেক প্রদান করিয়াছেন। সেই বিবেকবীজ মনুষ্য জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহাদের অন্তঃকরণে নিহিত থাকে। পিতা, মাতা, গুরু প্রভৃতির উপদেশ বাক্যে তাহা অঙ্কুরিত ও ক্রমে ক্রমে পরিবর্দ্ধিত হইয়া উঠে। যাহারা গুরু স্বীকার করে না ও শাস্ত্র মানে না, তাহারাই পশু—দ্বিপদ পশু। সেই দ্বিপদ নরপশুদিগের প্রবোধার্থে আমরা এখানে তিনটীমাত্র দ্বিপদ নরপশুকে উপস্থিত করিলাম। আমাদের সচিত্র—চিত্রবিচিত্র গুপ্তগৃহে স্থান সংকুলান করিতে

পারিলে; আমরা এস্থলে আরও অনেক ঐরূপ দ্বিপদ নর জানোয়ার আনিতে পারিতাম; কিন্তু তাহা হইলে এই গুপ্তগৃহ "পশুশালা" হইয়া উঠে। সেই ভয়ে তাহাতে ক্ষান্ত রহিলাম। যদি পারি, তবে ভবিষ্যতে কখন আমরা আমাদিগের গুণগ্রাহী প্রিয়তম পাঠক মহাশয়গণের কৌতুক বর্দ্ধনের জন্য "গুপ্ত পশুশালা" প্রদর্শন করিব।

শৈশবাবস্থা হইতে শিক্ষা প্রাপ্ত না হইলে মনুষ্যের কিরূপ পরিণাম উপস্থিত হয়, ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখিবার কারণ একজন রাজা সদ্যপ্রসূত দুইটী শিশুকে লইয়া কোন নিভৃত প্রদেশে রক্ষা করিয়াছিলেন। শিশুদ্বয়ের লালনপালন ও রক্ষণাবেক্ষণের ভার যে পরিচারিকার প্রতি অর্পিত ছিল, রাজা তাহাকে এই আজ্ঞা প্রদান করেন যে, "শিশু দুটী প্রকৃতির গতিতে আপনা হইতে কিরূপ অবস্থায় পরিণত হয়, তুমি কেবল তাহাই দেখিবে, উহাদের নিকট কখনই কোন ক্রমে কাহাকেও যাইতে দিবে না এবং তুমি নিজেও উহাদের সহিত কখন কোন কথা কহিবে না কিম্বা হাস্য পরিহাস কি ক্রীড়া কৌতুক কিছুই করিবে না। আর হাঁটিতে, বসিতে, কথা কহিতে কি বস্ত্র পরিধান করিতে তাহাদিগকে আদৌ শিক্ষা দিও না। কেবল জীবন ধারণের নিমিত্ত আবশ্যকীয় অশন বসন প্রদান করিবে।" রাজার এই আজ্ঞা অবিকল প্রতিপালিত হইতে লাগিল। এইরূপে ষোল বৎসর যায়। একদিন রাজা সভারোহণ করিয়া নিজ সিংহাসন সন্নিধানে বালকদ্বয়কে আনয়ন করিলেন। বালক দুইটী তখন যৌবন-সীমায় পদার্পণ করিয়াছে। হাঁটি হাঁটি পা পা ভিন্ন ভালরূপে চলিতে পারে না। কিছুমাত্র বলিতে পারে না। পারে কেবল হাঁসিতে ও কাঁদিতে।

আর থেকে থেকে এক একবার "বেক্ বেক্" এইরূপ শব্দ করিয়া উঠে। মূর্ত্তিমান উলঙ্গ দ্বিপদ নরপশুদ্বয় রাজ-সভায় দণ্ডায়মান। সভাসদগণ অনুমান করিলেন, খেচর পক্ষী বা নিশাচর পশু বিশেষের কোনরূপ রব শ্রবণ করিয়া, তাহার অপভ্রংশে বালকেরা "বেক্ বেক্" শব্দ করিতে শিখিয়াছে।

কিছুকাল পূর্ব্বে প্যাটন নামে একজন সাহেব পাটনার কমিসনর ছিলেন। তিনি একদা মৃগয়ায় নির্গত হইয়া বনের মধ্যে একদল নেক্‌ড়ে বাঘ দেখিতে পাইলেন। বাঘের পাল অবলোকন মাত্র সাহেব বন্দুক ছুড়িলেন। বাঘ সকল শীঘ্র পলাইয়া গেল ; কিন্তু একটী আর পলাইতে পারিল না। সাহেব দৌড়িয়া গিয়া তাহাকে ধরিয়া ফেলিলেন এবং আপন আবাসে আনয়ন করিয়া দেখিলেন, সে প্রকৃত নেক্‌ড়ে বাঘ নহে, মনুষ্য। তাহার বয়স তখন অনুমান ৪৫ বৎসর। সে পশুর ন্যায় চতুষ্পদ হইয়াছে, অর্থাৎ দাঁড়াইয়া চলিতে পারে না। চারিপায়ে অর্থাৎ হাত পা দিয়া হাঁটিয়া বেড়ায়। তাহার গাত্র রোমে আচ্ছাদিত। দাড়ি চুল ও নখ লম্বা লম্বা হইয়াছে। সে পশুর ন্যায় শব্দ করে, কাঁচা মাংস খায়। সাহেব তাহাকে ক্ষৌরী করাইয়া দিয়া মানুষের মত উত্তম খাদ্য দিতে লাগিলেন এবং মনুষ্যের ন্যায় সোজা হইয়া চলিতে, কাপড় পরিতে ও কথা কহিতে শিক্ষা দিতে চেষ্টা করিলেন ; কিন্তু বিন্দুমাত্র কৃত-কার্য্য হইতে পারিলেন না। দ্বিপদ নরপশুটী আশু অসু ত্যাগ করিয়া বসিল। অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে, প্রসূতী আপন শিশু সন্তানটীকে শয়ন করাইয়া কার্য্য ব্যপদেশে গমন করিলে, নেক্‌ড়ে বাঘে আসিয়া তাহাকে লইয়া যায় এবং স্তন্যাদি দিয়া প্রতিপালন করে। প্রসিদ্ধ রোম-সাম্রাজ্যের অধিপতি রেমস্

ও রেমুলস ভ্রাতৃদ্বয়ও না কি শৈশবাবস্থায় নেক্ড়ে বাঘের স্তন্যদুগ্ধে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন।

এখন প্রতিপন্ন হইতেছে, অনন্ত উন্নতির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া চলিলে শিক্ষা ও উপদেশের আবশ্যক করে; সুতরাং গুরু চাই। আর যেরূপ শিক্ষা ও সঙ্গ হইবে, স্বভাব চরিত্র ও অবস্থা সেইরূপই হইবে। তবে কিরূপ গুরু ও শিক্ষা এবং সঙ্গ প্রয়োজন তাহা বালকেরা নির্ব্বাচন করিতে পারিবে না! এই অতি আবশ্যকীয় ও গুরুতর বিষয়ের প্রতি পিতা মাতা প্রভৃতি অভিভাবকগণের সবিশেষ দৃষ্টি রাখা অবশ্য কর্ত্তব্য-কর্ম্ম সন্দেহ নাই। কিন্তু অতিশয় দুঃখের বিষয়! বলিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়! এ হেন গুরুতর ব্যাপারে পিতা মাতার আদৌ লক্ষ্য নাই! পুত্র কন্যার স্বভাব চরিত্র, আধ্যাত্মিক অবস্থা যাহাই হউক না কেন, সন্তান উপার্জ্জন ক্ষম হইলেই হয়। এক একটা পাস দিতে না পারিলে আজ কাল কর্ম্মের ও বিবাহের সুবিধা হয় না বলিয়া, ছেলে যদি এল, এ, ও বি, এ, পাস দিতে পারে, তাহা হইলেই পিতা মাতা আহ্লাদে আটখানা হইয়া অট্টহাস হাসিতে থাকেন; কিন্তু এ দিকে যে গলায় যমের ফাঁস লাগান রহিয়াছে, তদ্বিষয়ে ভ্রুক্ষেপমাত্রই নাই।

মনুষ্য চারিটী ভাব লইয়া জন্মগ্রহণ করেন। দৈবভাব, বীরভাব, মনুষ্য ভাব এবং পশু ভাব। এখন আর মনুষ্য ভাব মনুষ্যে পরিলক্ষিত হয় না, পশুভাব আসিয়া সেই মনুষ্য ভাবের স্থান অধিকার করিয়া লইয়াছে। মধ্যে মধ্যে দুই একটী মনুষ্য-ভাবাপন্ন মনুষ্য জন্মগ্রহণ করেন বটে, তদ্ভিন্ন পশুভাববিশিষ্ট দ্বিপদ নরপশুতেই জগৎ পরিপূর্ণ হইয়াছে। দেবভাব বিশিষ্ট মনুষ্য ভূমিষ্ঠ হইলে অবতার বলিয়া অভিহিত ও পূজিত হইয়া

থাকেন। চৈতন্য মহাপ্রভু ও প্রভু যীশুখ্রীষ্ট * প্রভৃতিই ইহার প্রমাণ। এই গ্রন্থের পঞ্চম অধ্যায়ে দেবভাব, বীরভাব, মনুষ্য ভাব ও পশু ভাব বিশিষ্ট মনুষ্য সম্বন্ধীয় কথা সকল বিশেষরূপে বিবৃত হইয়াছে। পাঠকগণ একবার অনুগ্রহ করিয়া সেইখানে গমন পূর্ব্বক দেব, নর, বীর ও পশুগণের একত্র সম্মিলন সন্দর্শন করতঃ যুগপৎ হর্ষ ও অমর্ষ উপলব্ধি করিবেন।

উপরে বলা হইয়াছে, ইন্দ্রিয় দমনই সম্পদের অর্থাৎ অনন্ত উন্নতিশীল অনন্ত জীবনের অনন্ত সুখ সম্ভোগের স্বর্গীয় পবিত্র পথ। আর ইন্দ্রিয়ের অদমনই আপদের অর্থাৎ আশী লক্ষ বার অশীতি লক্ষ ইতর যোনিতে জন্ম ও মরণরূপ অশেষ ক্লেশ ও যন্ত্রণাদায়ী নরকের পথ। এ সম্বন্ধে কর্ত্তাভজন সঙ্গীতের দুটী চরণ এ স্থলে উল্লেখের যোগ্য, যথা—

---

* অনাচারী পাপীদিগকে উদ্ধার করিবার কারণ পবিত্র আত্মার প্রভাবে মেরী নাম্নী কুমারীর বিশুদ্ধ গর্ব্ভে যীশু জন্ম পরিগ্রহ করেন। এবং পাপীদিগের পাপের প্রায়শ্চিত্ত-স্বরূপ ঈশ্বর প্রীত্যর্থ তিনি নিজদেহ বিক্রয় ও বলিদান করেন। যাঁহারা খ্রীষ্টকে পরিত্রাতা স্বীকার ও বিশ্বাস পূর্ব্বক তাঁহার পবিত্র রক্তদ্বারা আপনাদের পাপের মার্জ্জনা ও পাপ ধৌতের প্রার্থনা করিয়া তাঁহার নামে অবগাহিত হন, তাঁহারা পরিত্রাণ পান। এ কথায় আমাদের কোন আপত্তি নাই। কেন না ঈশ্বরানুরাগী সরল বিশ্বাসীর সকলই সাধ্য। ঈশ্বর রাজ্যে প্রবেশার্থে অধিকারী ভেদে নানাবিধ পথ ও ধর্ম্মপ্রণালী আছে। তবে "ঈশ্বররাজ্যে প্রবেশার্থে যীশুই একমাত্র দ্বার, তাঁহার নাম ভিন্ন অন্য কোন নামে পরিত্রাণ নাই।" এ বাক্যে আমাদের আস্থা নাই।

"অপরাধ মার্জ্জনা কর প্রভু!
আশী লক্ষ বারে, জন্মজন্মান্তরে,
আসিতে না হয় যেন কভু।" *

নানা যোনিস্থিত পুঁয, রক্ত ও মল, মূত্র পরিপূরিত ঘোর অন্ধকারময় দুর্গন্ধ যুক্ত গর্ভ কারাগারে বার বার বাস করা ও ভীষণ তরঙ্গ সঙ্কুল ঘোর আবর্ত্তময় সংসার সাগর পার হইবার সময় মৃত্যুমুখে পতিত হওয়া যে ভয়ঙ্কর নরক যন্ত্রণা দ্বিতীয় অধ্যায়ে তাহার সবিশেষ বর্ণনা আছে। পাঠক মহোদয়গণ রাজা যুধিষ্ঠিরের নরক দর্শনের ন্যায় সেই স্থানটুকু শীঘ্র অতিক্রম করিয়া যাইবেন। নতুবা নরকগুলজার মনে করিয়া যাহারা তাহাতে মুগ্ধ হইবে,তাহারাই দুর্দ্দশা ভোগ করিবে।

সে যাহা হউক দেহরথ, আত্মারথী ও মন তাহাতে সারথী। ঐ রথে ইন্দ্রিয়গণ অশ্ব স্বরূপ সংযোজিত রহিয়াছে। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য রিপু সকল ইন্দ্রিয়ের সহচর। এই সহচরদিগের পরামর্শ ও ইচ্ছানুযায়ী পথে গমন করিতেই ইন্দ্রিয়গণ ভালবাসে ও নিয়ত ব্যগ্রতা প্রকাশ করিয়া থাকে।

অশ্বারোহী যেমন অশ্বকে বশীভূত করিতে না পারিয়া তাহার ইচ্ছামত গমন করতঃ তৎক্ষণাৎ পতিত হইয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়েন এবং অশ্বকে দমন পূর্ব্বক আত্মবশে গমন করিতে পারিলে নিরুদ্বেগে সুখস্বচ্ছন্দে অনায়াসে অভিলষিত স্থলে উত্তীর্ণ হয়েন; তেমনি মন-সারথি ইন্দ্রিয় অশ্বগণকে বশীভূত করিতে অক্ষম হইয়া যদি ইন্দ্রিয়ের ইচ্ছামত রিপুসম্মত আপদের পথে দেহরথকে ছাড়িয়া দেন বা চালান, তাহা হইলে রথ,

* শ্রীযুক্ত বাবু বৈষ্ণবচরণ বসাক কর্ত্তৃক প্রকাশিত সঙ্গীত-কল্পতরু দেখুন।

রথীসহ সারথি নিশ্চয়ই ক্ষত বিক্ষত শরীরে ভবসাগরে পড়িয়া হাবু ডুবু খাইয়া মরিয়া যাইবেন। এইরূপে মনুষ্যের মৃত্যু হয়, নতুবা মৃত্যু হইবার কারণ নাই। এইরূপ মৃত্যুই নরক ও অনন্তকালীয় নানা যন্ত্রণার মূল।

ফলতঃ সাধু লোকের মৃত্যু নাই, যন্ত্রণাও নাই। তাঁহারা কেবল আপনাদের জরাজীর্ণ দেহ (সর্প বা চিঙ্গড়ি মৎস্যের খোলোস ছাড়ার ন্যায়) পরিত্যাগ করেন মাত্র। কিন্তু ইচ্ছা করিলে স্থিরযৌবন ও জ্যোতির্ম্ময় দেহ ধারণ পুরঃসর সশরীরেই স্বর্গে গমন করিতে পারেন। ধ্রুব, যুধিষ্ঠির, চৈতন্য মহাপ্রভু, ঈশা, মূসা ও হনোক প্রভৃতি সকায় স্বর্গে গমন করিয়াছিলেন। সাধুলোকের উপর যমের কোন প্রভুত্ব বা অধিকার নাই। তাঁহারা দেহরথে রথীরূপে আরূঢ় থাকিয়া মন সারথিরে ইন্দ্রিয় অশ্বগণ সহিত স্ববশে আনিয়া সতত উজান অর্থাৎ উর্দ্ধে গমন করিয়া থাকেন। এমন আশ্চর্য্য দেব দুর্লভ মঙ্গলপ্রদ সুন্দর নিয়ম সৎস্বরূপ সেই মহান্ পরমেশ্বর ভিন্ন আর কাঁহা কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে?

এ হেন সুন্দর মঙ্গলকর নিয়মসত্তে আমরা ইন্দ্রিয় দমন পূর্ব্বক সম্পদের পথে গমন করিয়া অমর হইতে অর্থাৎ যমের নিষ্ঠুর হস্ত হইতে মুক্তি পাইতে ইচ্ছা করি না, চেষ্টাও করি না এবং এই স্বর্গীয় সুখ সম্পদের পথে আমাদিগকে কেহ চলিতে বলিলে সেই দেববাণী গ্রাহ্যই করি না? হা..! আমি কি দুর্ভাগ্য নারকী জীব! আমি নিজের মঙ্গল বুঝিতে পারি না! আমার কোন জ্ঞান নাই, চৈতন্য নাই! বিবেক বুদ্ধিও নাই! সাধু-প্রদর্শিত এমন সুন্দর অমৃত পথ থাকিতে যন্ত্রণাযুক্ত মরণপথে নরকগর্ত্তেই আসিয়া পড়ি কেন? কর্ম্মসূত্রে বন্ধন পূর্ব্বক কাম,

ক্রোধ, লোভ, মদাদি অরি সহচর অবশীভূত ইন্দ্রিয়-অশ্বগণ আমাকে এই দুর্দ্দশায় আনিয়া ফেলিয়াছে।

তবে কি আর উপায় নাই? উপায় আছে। সাধুগণ বলেন—যতক্ষণ পর্য্যন্ত তুমি মৃত্যুমুখে না যাইতেছ, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তোমার আশা ভরসা আছে। এখনও যদি তুমি ইন্দ্রিয়গণকে স্ববশে আনিয়া বেগ ফিরাইয়া উক্ত অমৃত পথে দেহরথকে উজান চালাইয়া দিতে পার, তবে আর ভাবনা কি? কিন্তু তাহা বড় কঠিন কাজ। ইহাতে নিরলস হইয়া পরিশ্রম করিতে হইবে। ত্যাগ স্বীকার ও দুঃখ সহ্য করিতে হইবে। আপাততঃ মধুর ও পরিণাম বিষবৎ সুখ সকল বিসর্জ্জন দিয়া অবিচলিত অধ্যবসায় সহকারে সাধন করিতে অর্থাৎ ইন্দ্রিয় দমন অভ্যাস করিতে হইবে।

আলস্য ত্যাগপূর্ব্বক এই সদভ্যাস করিতে পারিলে নিশ্চয়ই কৃতকার্য্য হওয়া যায়। সাধন বলই ত সাধুদিগের সম্বল। কিন্তু পশু স্বভাব বিশিষ্ট নিতান্ত মুর্খ ও হতভাগ্য মনুষ্য কখনই সৎপথে গমন করিতে পারে না, কেননা স্ব স্ব কর্ম্মফল তাহাদিগকে অবশ্যই ভোগ করিতে হয়। "অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃতকর্ম্ম শুভাশুভং" তাহারা জড়বৎ অলস প্রকৃতির লোক, স্রোতে গা ঢালিয়া দিয়া মৃত্যু মুখে ভাসিয়া যাইবে, তবু একটু উজান বাহিয়া বাঁচিতে চেষ্টা করিবে না। দিনকত উজান বাহিতে আরম্ভ করিলে অচিরে জুয়ার প্রাপ্ত হওয়া যায়। তবু কেমন স্বভাব দোষ, তাহারা অভ্যাসের দাস হইয়া বিষ্ঠাভোজী শূকরের তৃপ্তি সুখের ন্যায় বর্ত্তমান জঘন্য ঐহিক ইন্দ্রিয় সুখেই মত্ত থাকে। ভবিষ্যৎ স্বর্গীয় সুখে তাহাদের মন কিছুতেই আকৃষ্ট হইবার নহে।

কবি রায় গুণাকর বলেন ;——

"ভবিষ্যৎ ভাবি কেবা বর্ত্তমানে মরে।
প্রসবের ভয় তবু পতি সঙ্গ করে।"

তদ্রূপ ঐ দুরাত্মারাও ভবিষ্যতে নরক ভোগের ভয়সত্ত্বেও বর্ত্তমান ইন্দ্রিয়সুখে বিরত নহে। এরূপ অচেতন জ্ঞানহীন পশুবৎ দুরাত্মা মূর্খলোকের নরক ভোগ ত অবশ্যই হইবে।

পাঠকগণের স্মরণ আছে, এই অধ্যায়ে আমরা গুরু, শিক্ষা ও সঙ্গ সম্বন্ধীয় কথা কহিতেছি। গুরু ও সঙ্গ সম্বন্ধে দ্বিতীয় অধ্যায়ে কিছু বলা হইয়াছে। এক্ষণে শিক্ষা বিষয়ে দুই একটী কথা বলি। কোন কর্ম্ম শিখিতে গেলে একেবারে আলস্য বিহীন হইয়া অবিচলিত অধ্যবসায় সহকারে প্রগাঢ় পরিশ্রম পূর্ব্বক নিয়ত অভ্যাস করিতে হয়; কিন্তু অনিয়মিত ও অপরিমিত পরিশ্রমাদি করিলে, বিপরীত ঘটিয়া উঠে। তন্নিমিত্ত বুধগণ সর্ব্ববিষয়েই অতিশয়তাকে দূষিত করিয়া গিয়াছেন। এমন কি অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ বলিয়াও কথিত আছে। আবার কি না "অতি বুদ্ধির * * দড়ী" লোকে ইহাও বলিয়া থাকে। ফলে যে কোন কাজ হউক অবিচলিত অধ্যবসায়, দৃঢ় প্রতিজ্ঞতা ও অপ্রতিহত নিয়মবদ্ধ সহকারে নির্ব্বাহ না করিলে কখনই সুসিদ্ধ হইবার নহে। ক্রমে ক্রমে এক একটী বিষয় ভাল করিয়া শিক্ষা না করিয়া একেবারে বহু বিষয়ের শিক্ষালাভে প্রয়াস পাইলে চেষ্টা বিফল হইয়া থাকে। যাহা হউক অভ্যাসের অসাধ্য কিছুই নাই। অভ্যাস আবার এমনি জিনিস যে, সৎ হউক আর অসতই হউক, যে বিষয় লইয়া তুমি দিনকত অভ্যাস করিবে, তাহাই তোমার ভাল লাগিবে এবং পুনঃ পুনঃ তাহা করিতে ইচ্ছা জন্মিবে।

এক দিন তাহা করিতে না পাইলে মহা অসুখ উপস্থিত হইবে। তামাক, অহিফেণ ও সুরাদি মাদকসেবী এবং বেশ্যাসক্ত পুরুষগণই ইহার প্রমাণ। ইহারা কু অভ্যাস বশে এরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াও তাহাতেই সুখ বোধ করিতেছে। অভ্যাসানুযায়ী কার্য্য এক দিন করিতে না পারিলে ইহাদের প্রাণ যেন বিয়োগ হইয়া পড়ে। এ বিষয়ের কু দৃষ্টান্তই অধিক; সদ্দৃষ্টান্ত অতি বিরল। কেননা জগতে সকল বিষয়ে—ভালর ভাগ অল্প, মন্দই বেশী। তথাপি এ সম্বন্ধে আমরা সদ্দৃষ্টান্তও অনেক দিতে পারি। বহু পীড়নেও যবন হরিদাস ঠাকুরকে কি ম্লেচ্ছাধিপতি তাঁহার অভ্যস্ত হিন্দুধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত করিতে পারিয়াছিলেন? প্রসিদ্ধ লালাবাবুকেই বা তাঁহার আত্মীয়গণ তাঁহার অবলম্বিত কঠোর বৈরাগ্য পথ হইতে অতুল সুখ সম্পদের পথে ফিরাইয়া আনিতে পারিলেন না কেন? ইহার কারণ আর কিছুই নহে, অভ্যাস ত্যাগ করা বা তাহা ত্যাগ করান বড় কঠিন ব্যাপার। এ কারণ অনেকে অভ্যাসকে দ্বিতীয় স্বভাব বলিয়া পরিগণিত করেন। স্বভাব সম্বন্ধে মেয়েলী কথায় বলে, "ইল্লোৎ যায় ধুলে, স্বভাব যায় ম'লে।"

যাহা হউক পিতৃমাতৃগণ। আমি এখন আপনাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলি, আপনারা যখন সন্তান-সন্ততীর জন্ম দিয়াছেন, তখন তাহাদের ভাল মন্দ, উন্নতি অবনতি ও পাপ পুণ্যের দায়ী আপনারাই আছেন। কেন না পুত্র কন্যা সৎকার্য্য করিলে পিতা মাতার মুখোজ্জ্বল এমন কি কুলের গৌরব বৃদ্ধি হয়। আর কুকর্ম্ম করিলে পিতামাতা গালি খান, কুলেরও কলঙ্ক হয়। তাহারা যাহাতে দ্বিপদ নরপশু না হইয়া মানুষ হয়, এবং শৈশবকাল হইতেই সুশিক্ষা ও সদুপদেশ পাইয়া

এবং সদ্দৃষ্টান্ত দেখিয়া ইন্দ্রিয় দমনরূপ সম্পদের পথেই গমন করে, তৎপক্ষে আপনারা বিশেষ দৃষ্টি রাখিবেন। উত্তরসাধক না থাকিলে কখনই পুত্র কন্যা মানুষ হয় না, ইহা নিশ্চয়ই জানিবেন। তাইবলি যদি উপেক্ষা করেন, তবে তাহারা অবশ্যই পশুত্ব প্রাপ্ত হইবে ও আপদের পথে পড়িয়া মৃত্যু ও নরকযন্ত্রণা ভোগ করিবে।

মনুষ্য আত্মার যে কত মূল্য, তাহা বলা বাহুল্য। এই নশ্বর সামান্য মনুষ্য কোন বাধা বিঘ্ন না পাইয়া যদি ক্রমশঃই উন্নতি লাভ করিতে থাকে, তবে ঈশ্বর সদৃশ সৎ, মহান্ জ্ঞানী ও শক্তিমান হইতে পারে। কোন সতেজ চারা গাছে পোকা ধরিলে যেমন সেই গাছটী মাটী হইয়া যায়, তেমনি মনুষ্য শরীরে একবার অলসকীট লাগিলে আর নিস্তার নাই!! আবার সেই সঙ্গে সঙ্গে কু-সংসর্গ দোষ সংস্পর্শ হইলেই প্রতুল!! অতএব পঞ্চমবর্ষ বয়ঃপ্রাপ্ত হইবামাত্র শিশুদিগকে শাসনাধীনে আনিয়া যত্নসহকারে লালন পালন ও শিক্ষাদান করা পিতামাতা বা শিক্ষকের অবশ্য কর্ত্তব্য। কিন্তু পিতামাতা বা শিক্ষককে সর্ব্বদা সাবধান থাকিতে হইবে, যেন কোন মতেই বালক বালিকারা তাঁহাদের আচার ব্যবহারে কি চরিত্রে কোনরূপ দোষ দৃষ্ট না করে। কেন না বালকেরা বড় অনুকরণ প্রিয়, তাহারা যাহা দেখে তাহাই শিখে বা শিখিতে চেষ্টা করে। কিন্তু ইহারা দোষের বেলায় যত অনুকরণ করিতে পারে, গুণের দিকে তত ঘেঁসিতে পারে না। কারণ দোষ অনুকরণ করিতে গেলে স্রোতে গা ঢালিয়া দিলেই হয়, তাহাতে আশু একটু আরাম আছে এবং সুখ বোধও হইয়া থাকে। কিন্তু গুণ অনুকরণ করিতে হইলে উজান বাহিতে হয়, ইন্দ্রিয়

সংযমরূপ পরিশ্রম করিতে হয়। সুতরাং সুখ বোধ না হইয়া কিছু বা বিষয় বিশেষে বেশী কষ্ট হয়। যদি ইন্দ্রিয় সংযমরূপ সম্পদের পথে চলিতে ক্রমে ক্রমে অভ্যাস করা যায়, তবে প্রথমে ঐ পথে যেন হাঁটী হাঁটী পা পা করিতে হইবে, এক একবার টলিতে, ঢলিতে বা পড়িয়া যাইতে হইবে। এইরূপে চলিতে শিখিলে পর, তখন আর দৌড়িয়া যাইতেও দুঃখ বোধ হইবে না, বরং অতিশয় সুখ বোধ হইবে। অভ্যাসের এই মহৎগুণ আছে। অভ্যাস বলে দুঃখ সুখ ও সুখ দুঃখে পরিণত হয়। কোন কোন ব্যক্তির এরূপ অভ্যাস আছে যে, তাহাদের পৃষ্ঠদেশে অর্দ্ধ ঘণ্টা ধরিয়া গুম্ গুম্ করিয়া কিল না মারিলে তাহাদের ঘুম হয় না। কিন্তু অনভ্যস্ত ব্যক্তির পৃষ্ঠে উক্তরূপে কিল মারিলে তিন দিন তাহার ব্যথা থাকে। আমরা অর্দ্ধ তোলা অহিফেণ খাইলে তৎক্ষণাৎ মরিয়া যাই, কিন্তু অল্প অল্প করিয়া ক্রমে মাত্রা বাড়াইয়া এককালে পাঁচ তোলা পর্য্যন্ত আফিম খাইয়াও অনেককে সুস্থ থাকিতে দেখিতে পাই।

শক্তি বৃদ্ধি করিবার বাসনা করিয়া আমরা যদি পঞ্চমবর্ষ বয়ঃক্রম হইতে ক্রমে ক্রমে মাত্রা বাড়াইয়া প্রত্যহ ক্রমাগত ভার উত্তোলন করিতে অভ্যাস করি, তাহা হইলে ষোড়শবর্ষ বয়ঃক্রম সময়ে অনায়াসে পাঁচ মণ ভার বহন পূর্ব্বক এক ক্রোশ পথ গমন করিতে পারিব সন্দেহ নাই। বেশী দিনের কথা নয়, আজ প্রায় ৭০।৮০ বৎসর হইল, শান্তিপুর নিবাসী আশানন্দ ঢেঁকি (ঢেঁকি লইয়া সর্ব্বদা যষ্টির ন্যায় ব্যবহার করিতেন বলিয়া ইহাঁর উপাধি ঢেঁকি হয়) নামক জনৈক ব্রাহ্মণ গঙ্গাস্নান করিতে গিয়া বৃষ্টিপতন সময়ে ১০।১২ মণ ওজনের একখানি

জেলে ডিঙ্গী ছত্রের ন্যায় বাম হস্তে ধারণ পূর্ব্বক মস্তক আচ্ছাদন করতঃ আপন বাটীতে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন।

আমরা এক মিনিটও জলে ডুব দিয়া থাকিতে পারি না, কিন্তু অভ্যাস বলে ডুবারিরা ৩ ঘণ্টা পর্য্যন্ত জলে ডুবিয়া থাকিতে পারে। বাজীকরেরা শূন্যমার্গে এক গাছা দড়ির উপর দিয়া চলিয়া যায়। অভ্যাস করিলে ঊর্দ্ধে পদ রাখিয়া মাথা হেট করিয়া কেবল দুটী হস্ত দ্বারা অক্লেশে চলিয়া যাওয়া যায়। এবং প্রায় ১৭।১৮ তালা প্রমাণ উচ্চ অট্টালিকার উপরিস্থিত গোলাকার গুম্বেজের মাথায় উঠিয়া নির্ভয়ে বেড়ান যায়। অধিক কথায় কাজ নাই, যোগাভ্যাস করিতে পারিলে ঊর্দ্ধগতি লাভ করতঃ সশরীরেই স্বর্গে গমন করিতে পার সন্দেহ নাই। অভ্যাস বলে আমাদের দেশের পূর্ব্বতন দস্যুগণ দুই হস্তে দুইটী বংশ ধারণ করতঃ উভয় বাঁশে উভয় পদস্থাপন পূর্ব্বক হস্ত পদ দ্বারা সেই বাঁশ চালাইয়া ৫।৬ ঘণ্টা রাত্রির মধ্যে ৩২।৩৬ ক্রোশ পথ চলিতে পারিত। একটী ছেলে এক ঘড়ির নিকট বসিয়া ঘড়ির সঙ্গে সঙ্গে টিক টিক শব্দ করিত এবং যথন ঘণ্টা বাজিত, ছেলেটীও তথনই নিজমুখে ঠং ঠং শব্দ করিয়া উঠিত। এইরূপে কিছুকাল পর্য্যন্ত অভ্যাস করিতে করিতে সে নিজমুখে টিক টিক করিয়া ঠিক ঘড়ির মত সময় রাখিতে পারিত।

অভ্যাস দ্বারা সাহস ও পরাক্রম যারপর নাই বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। কুরু সেনারা যথন বিরাট রাজার গোধন হরণ করিয়া লইয়া যায়, তথন অসীম সাহসী ও অমিত পরাক্রমী অর্জ্জুনের সমভিব্যাহারী বিরাটপুত্র উত্তর অসংখ্য কৌরব সৈন্য অবলোকন করতঃ ভয়ে অচৈতন্য হইয়া পড়িয়াছিলেন। কিন্তু

এই মহাভীরু উত্তর আবার অভ্যাস বলে উত্তরোত্তর সাহস সম্পন্ন বীর মধ্যেও গণ্য হইয়াছিলেন।

আমরা ছোট খাট কথা কহিতেছি না, অতি অসম্ভব নিরর্থক বড় বড় কথা সকলের আলোচনা করিতেছি, ঈশ্বর অবিশ্বাসী অতি সংকীর্ণমনা নীচ লোকেই ইহা বলিবে। এরূপ জনকত লোকের পুস্তকাদি পাঠ করিয়া আমাদের দেশীয় বালকেরা জাতীয়ত্ব হারাইয়াছে, ধর্ম্মবল হীন হইয়া পর কালের মাথা খাইয়া বসিয়াছে।

এখন পিতা মাতা ও শিক্ষক মহোদয়গণ যাহা কর, তাহাই হইবে। তোমরাই ত আপন আপন আচার ব্যবহারের কুদৃষ্টান্ত দেখাইয়া উহাদিগকে নষ্ট করিতেছ। তোমরা যদি নিজে সৎ আদর্শ স্বরূপ হইতে,—ইন্দ্রিয় দমনরূপ সম্পদের পথে আপনারা চলিতে এবং বালক বালিকাদিগকে সেই সুপথে চলিতে শিক্ষা দিতে ও অভ্যাস করাইতে, তাহা হইলে কি আজি দেশের এই নিদারুণ শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া কাঁদিতে হইত?" কখনই না। তোমরা যেমন ছেলেদের ইহকাল পরকাল নষ্ট করিতেছ, তেমনি (হে দেশীয় বদমাইশ পুরুষগণ তোমরাও) বালিকাদেরও অনেকের ইহকাল পরকাল নষ্ট করিলে!! ভারত-ললনাদের তুলনা জগতের কুত্রাপি নাই। তাঁহারা দয়া ধর্ম্ম, শ্রদ্ধা ভক্তি, স্নেহ মমতা, বিনয় নম্রতা, যথার্থ ভদ্রতা, লজ্জা, সরলতা, সতী সাধ্বীতাদি অশেষ গুণালঙ্কারে বিভূষিতা ও মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মী বিশেষ। কিন্তু দুষ্টেরা কি না তাঁহাদের অনেককে অসহায়াবস্থায় পাইয়া কুপথ গামিনী করিয়া জ্বালাদায়ী সাক্ষাৎ নরকরূপ বেশ্যাবাসে আনিয়া ফেলিতেছে!! গুপ্তগৃহের চতুর্থ অধ্যায়ে নবঃ দম্পতী বিষয়ক প্রস্তাবে তাহা আনুপূর্ব্বিক প্রকাশিত হইয়াছে।

শিশুদিগকে কথা কহিতে শিখিবার সঙ্গে সঙ্গে খেলনা দ্রব্যের সহিত খেলনার স্বরূপ, নানা বর্ণে রঞ্জিত স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র অক্ষর সকল ক্রমে ক্রমে এক একটীর নাম বলিয়া দিয়া তাহা তাহাদিগকে দেওয়া কর্ত্তব্য। এইরূপে বর্ণপরিচয় হইলে, কৌশলক্রমে ক্রীড়া কৌতুকচ্ছলে উহাদিগকে সরল বানান সকল শিক্ষা দিতে হইবে। তৎপরে ক্রমান্বয়ে শিশুদের প্রবৃত্তি অনুসারে পশু, পক্ষী ও মনুষ্য প্রভৃতির চিত্র দেখাইয়া তাহা আঁকিতে তাহাদিগকে দিলে, তাহারা আহ্লাদিতচিত্তে খেলা বলিয়া তাহা অঙ্কিত করিতে আরম্ভ করিবে। সেই সময়ে সেই খেলার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদিগকে উক্ত বর্ণমালা ও বানান লিখান আবশ্যক।

ছেলেরা হাঁটিতে শিখিলেই লাফালাফি ও দৌড়াদৌড়ি করিয়া খেলিয়া বেড়ায়; কিন্তু এই দৌড় পর্য্যন্তই অঙ্গ-চালনার সীমা নয়। জ্ঞানচর্চ্চা যেমন অনন্তকালেও শেষ হয় না, অঙ্গ পরিচালনাও ঠিক তদ্রূপ। আমরা রিপুর সহিত ইন্দ্রিয়গণকে বশীভূত করিয়া বিবেক কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া, ক্রমোন্নতির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া, যদি পবিত্রভাবে শরীর ও মন নিয়ত সঞ্চালন করি, তাহা হইলে আমরাও সাধুদিগের ন্যায় উজান বাহিয়া ঊর্দ্ধগতি লাভ করিতে পারি সন্দেহ নাই। কিন্তু আমরা তাহা করি কৈ? আমরা শরীর সঞ্চালন করি না, মন পরিচালনাও করিতে পারি না; সুতরাং ইন্দ্রিয় দ্বারা চালিত হইয়া স্রোতে ভাসিয়া মৃত্যুমুখে নীত হই।

ছেলেরা পুতুল লইয়া খেলা করিতে ভালবাসে। অতএব তাহাদিগকে দেব, দেবী, সাধু ও বিষয় বিশেষে বিখ্যাত পুরুষ দিগের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রতিমূর্ত্তি এবং গো, মেষাদি পশু, তথা পিক,

শুক প্রভৃতি পক্ষীগণের এক একটী পুতুল দিয়া তাহাদের সমস্ত বৃত্তান্ত বলিয়া দিতে হইবে এবং তদ্বিষয়ক সরল পুস্তক সকলও তাহাদিগকে পড়াইতে হইবে। এবং এক একটী নীতিগর্ভ গল্প বলিয়া তাহা পুস্তক হইতে তাহাদিগকে পড়িতে দিলে আরও ভাল হয়। এইরূপে তাহারা ক্রমশঃ শব্দার্থও বুঝিতে সক্ষম হইবে। শিশুরা পদ্য ভালবাসে, এজন্য তাহাদিগকে সর্ব্বাগ্রে গদ্যপদ্যময়ী সরল পুস্তিকা সকল পড়িতে দেওয়াও উচিত।

ছেলেবেলায় বাঁশী ও ঢোলকাদি বাদ্য লইয়া ছেলেরা খেলা করিতে বিশেষ ব্যগ্রতা প্রকাশ করে। অতএব প্রবৃত্তি অনুসারে এই সময় হইতেই উহাদিগকে বাদ্য ও সঙ্গীত বিদ্যা শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেও উপকার ভিন্ন অপকার হইবে না। কেননা ঈশ্বর প্রাপ্তির জন্যই আমাদিগকে সকল বিদ্যা শিক্ষা করিতে হয়।

পঞ্চম বর্ষ বয়স্ক বালকগণ বিলক্ষণ দৌড়িতে পারিলে, তাহাদিগকে পদ্মাসন, যোগাসন, বীরাসন, স্বস্তিকাসন প্রভৃতি কতগুলি আসন ক্রমে ক্রমে শিখাইতে হইবে। আর বল বিক্রম ও সাহস বর্দ্ধনার্থে ক্রমে ক্রমে মাত্রা বাড়াইয়া তাহাদিগকে ভার উত্তোলন ও কৃত্রিম যুদ্ধ কার্য্যেও নিযুক্ত রাখা অতি আবশ্যক।

অধুনা পাশ্চাত্য প্রথা অবলম্বন করিয়া দেশীয় বিদ্যালয় সকলে যেরূপ ব্যায়াম চর্চ্চা হইয়া থাকে, আমরা তাহার বড় একটা পক্ষপাতী নহি। যেহেতু উহা ঈশ্বরোদ্দেশে নহে, কেবল জড়দেহের উপকারার্থে প্রযুক্ত হইয়াছে, তদ্দ্বারা পারমার্থিক কোন উপকারই নাই; কিন্তু উক্ত আসন এবং প্রাণায়াম প্রভৃতি দ্বারা পবিত্র ভাবে শরীর সঞ্চালন ও ইন্দ্রিয় সংযমন করিতে পারিলে, আয়ু বৃদ্ধি সহকারে ঐহিক ও পারত্রিক বিশেষ মঙ্গল লাভ হয় সন্দেহ নাই।
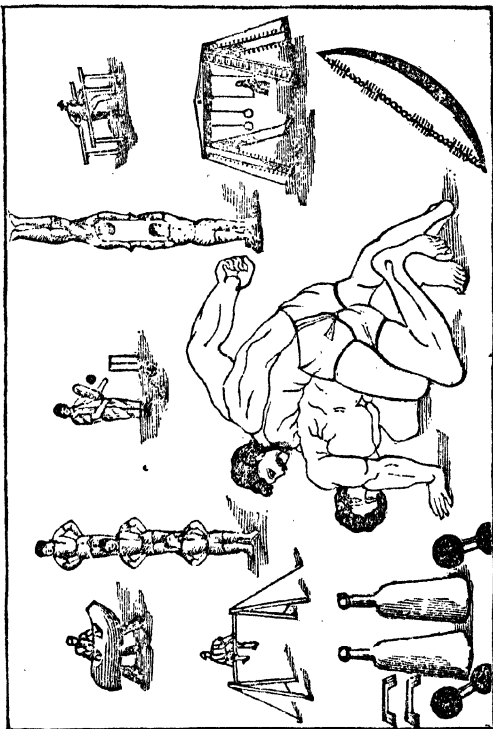
পদার্থ বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিতে বাল্যকাল হইতেই শিশুদের নিতান্তই ইচ্ছা থাকে। তাহাদের সেই ইচ্ছানুসারে চালিত হইয়া দ্রব্যগুণ সহকারে সেই সময় হইতেই তাহাদিগকে কৃষি ও চিকিৎসা বিদ্যা অল্পে অল্পে শিখাইতে পারিলে বড়ই ভাল হয়। কৃষি বিদ্যা শিক্ষা করা সকল বালকেরই কর্ত্তব্য। পিতা মাতা প্রভৃতি অভিভাবক গণের এবিষয়ে সবিশেষ মনোযোগ করা উচিত। এক্ষণে দেশের যেরূপ অবস্থা, তাহাতে চাকরী পাওয়া

ভার। কৃষিকার্য্য না করিলে আর কাহারও অন্নের সংস্থান হইবে না। মহারাজ কুরু স্বহস্তে ক্ষেত্র কর্ষণ করিতেন, অদ্যাপি সেই ক্ষেত্র "কুরুক্ষেত্র" নামে মহাতীর্থ স্থান হইয়া আছে। রাজর্ষি জনকও নিজে কৃষিকার্য্য করিয়া ছিলেন। আর বলদেব স্বয়ং হল চালনা করিতেন বলিয়া তাঁহার নাম হলধর হইয়াছে। শঙ্করও স্বকরে কৃষিকর্ম্ম করিয়াছিলেন। যাহাহউক বাণিজ্য ও কৃষিকার্য্যে মনোনিবেশ না করিলে এদেশের দরিদ্র দশা আর কিছুতেই ঘুচিবার নহে। কৃষিকার্য্য করিবার জন্য যেমন বর্ষাকাল বিশেষ উপযোগী, তদ্রূপ বিদ্যা শিক্ষা করিবার কারণ বাল্যকালই অতি উপযুক্ত সময়। এই বাল্যকাল বিফলে বহিয়া গেলে জন্মই বৃথা হয়।

আমরা উপরে যে সকল শিক্ষার কথা উত্থাপন করিলাম। একাধারে তত শিক্ষা ধারণ করা অসম্ভব। অতএব বালকগণ ইচ্ছা ও প্রবৃত্তি অনুসারে একটী কি দুইটী বিষয়ে বিলক্ষণ বুৎপত্তি লাভ করিতে পারিলেই, যথেষ্ট হয়।

বালক বালিকাগণকে প্রাণের সমান ভাল বাসিবে ও আদর করিবে। বিশেষ সহিষ্ণুতাপূর্ব্বক ইহাদের উচিত আব্দার সকল সহ্য করিবে। কোন অন্যায় দেখিয়া কখনও ক্রোধপূর্ব্বক উহাদিগকে প্রহার করিবে না, কিম্বা কর্কশভাবে তাড়না করিবে না। উহাদের সহিত সতত ভদ্র ব্যবহার করিবে। তাহা হইলে তাহারা তাহাই অনুকরণ করিয়া লইবে। বালক বালিকারা যদি কথা না শুনে, কি মিথ্যা বাক্য বলে, অথবা কোন দুষ্টকার্য্য করে তাহা হইলে ২।১ দিন তাহাদিগকে আদর করিবে না ও তাহাদের সঙ্গে কোন কথা কহিবে না, তাহা হইলে তাহারা শীঘ্র আপনাদের দোষ সকল সংশোধন করিয়া লইবে এবং দোষ বুঝিয়া

তৎসংশোধন অভ্যাস আরম্ভ করিলে তাহারা শিষ্ট শান্ত ও ভাল মানুষ হইবে।

পিতামাতা প্রভৃতি গুরুজনকে এবং প্রাচীন লোকদিগকে ভক্তি, মান্য ও ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিবে এবং সমবয়স্কদিগের সহিত সতত আত্মবৎ ব্যবহার করিবে। বালক বালিকাগণকে সর্ব্বদাই, এই শিক্ষা দিতে হইবে। আর ক্রোধপূর্ব্বক কাহারও সহিত বিবাদ বিসম্বাদ করা কি কাহাকেও গালি দেওয়া কি প্রহার করা অথবা ক্রীড়া কৌতুক ছলে কোন পশু পক্ষী কি কীট পতঙ্গকে কোন প্রকারে যাতনা প্রদান করা যে ইতর, নিষ্ঠুর ও পাপী লোকের স্বভাব, এই সকল বিষয় স্পষ্টরূপে দৃষ্টান্ত দ্বারা বালক বালিকাদিগকে বুঝাইয়া দিতে হইবে। সকল কার্য্যই যে ঈশ্বরের জন্য ও তাঁহারই উদ্দেশে করিতে হয়; এই ভাবটী বালক বালিকাদের অন্তঃকরণে বিশেষরূপে মুদ্রাঙ্কিত করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। বাল্যকাল হইতেই এরূপ সংস্কার জন্মিলে পরিণামে মনুষ্য নামে পরিচিত হইতে পারিবে। বাল্যকালে ধূলি খেলার সময় হইতেই প্রহ্লাদের এই ভাব ছিল, যথা—

"অন্যান্য বালক নাচে ধূলা উড়াইয়া।
প্রহ্লাদ নাচেরে সদা শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া॥"

তিন বৎসর বয়স হইতেই বালক বালিকাদিগকে সত্য কথা কহিতে ও পিতামাতা প্রভৃতি গুরুলোকের কথার বশীভূত হইয়া চলিতে বিশেষরূপে শিক্ষা দিতে হইবে। আর উহারা যেন কোন কুসংসর্গে বেড়াইতে না পারে, উহাদের পাঁচ বৎসর বয়সের সময় হইতে তৎপক্ষে সবিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। কুসঙ্গে থাকিয়া বালক বালিকারা কিরূপ বিকৃত চরিত্র প্রাপ্ত হয়, তাহা ক্রমে ক্রমে প্রদর্শন করা যাইতেছে।

চারি বৎসর বয়সের একটী বালক পড়িতে আরম্ভ করিয়া পাঁচ বৎসর বয়সের সময় উত্তমরূপে লিখিতে পড়িতে ও পঠিত পুস্তকের শব্দার্থ বুঝিতে পারিত। এই এক বৎসর কাল বালকটী মনোযোগের সহিত লেখা পড়া শিখে। তাহার পর একটী ৭। ৮ বৎসর বয়স্ক বালক তাহার সহপাঠী ও সঙ্গী যোটে। সেই অবধি সে ঐ সঙ্গদোষে এত মন্দ হইয়া পড়িল, যে, আর লেখা পড়ায় আদৌ মনোযোগ করিত না। কেবল খেলিয়া বেড়াইত। তাহার অভিভাবকগণ বিশেষ শাসন ও তাড়নাদি করিয়া কিছুতেই তাহাকে আর লেখা পড়ায় মনোনিবেশ করাইতে পারিলেন না। সে বনে বনে গাছে গাছে পক্ষী শাবক ধরিতে লাগিল এবং খেলা করিয়া বেড়াইতে থাকিল। আর অত্যন্ত অবশীভূত হইয়া উঠিল। এক বৎসরে সে যে লেখা পড়া টুকু শিখিয়াছিল, দুই বৎসরের মধ্যে তৎসমুদায়ই ভুলিয়া গেল। তদনন্তর ৮ বৎসর বয়ক্রম কালে সে আত্ম বিহার * আরম্ভ করিল। এখন সে এই কুঅভ্যাসের ক্রীতদাস হইয়া নানারূপ শাসন তাড়নেও ক্ষান্ত হইল না। কি সর্ব্বনাশের কথা! এই দোষে বালকেরা অল্পবয়সে আপনাদের মাথা আপনারাই খাইয়া বসে। এরূপ কদভ্যাস ও শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘন এবং পাপ কার্য্যে পরিণামে যে কি পর্য্যন্ত ভয়ানক শাস্তি হইয়া থাকে, বালকেরা যদি পূর্ব্বে তাহা জানিতে পারে, তাহা হইলে অবশ্যই ভয়ক্রমে কোন মতে এই ঘৃণিত পাপ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে পারে না। পাপ কর্ম্মের সংবাদ যতই গুপ্ত থাকে, ততই ভাল; কিন্তু যে পাপ সংক্রামক

---

* '[illegible]'। এই কথাটী শুনিতে যেন ঘৃণায় গা বমি বমি করে। তজ্জন্য আমরা ঐ কথার পরিবর্ত্তে "আত্মবিকৃতি" লিখিব।

হইয়া সকলকেই আক্রমণ করিয়াছে, যে পাপে মনুষ্য সমাজ উচ্ছিন্ন হইতেছে, তাহা প্রকাশ করিয়া সকলকে সতর্ক পূর্ব্বক তৎপ্রতিকারের চেষ্টা করা দোষাবহ নহে।

রক্তই আমাদের শরীর, রক্তই আমাদের প্রাণ। রক্তই আমাদের মাংস, আর রক্তই আমাদের হাড়। রক্তই আমাদের মজ্জা ও শরীরের ভিত্তিমূল বা বুনিয়াদ। মনুষ্য যখন প্রথমে গর্ভে জন্মে, তখন সে রক্ত; পরে রক্তপিণ্ড; তার পর ক্রমান্বয়ে সেই রক্তই অস্থি মাংস নখ ও কেশরূপে পরিণত হয়। এই রক্তরূপ ভিত্তিমূলের উপরই আমাদের দেহ ও জীবন সংস্থাপিত রহিয়াছে। ঐ রক্ত আবার আমাদের ভুক্ত খাদ্যদ্রব্য হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। সুতরাং শোণিতই আমাদের বল, বীর্য্য ও পরাক্রমের মূল। শোণিত পরিপাক হইয়া নরদেহে শুক্রের উৎপত্তি হইয়া থাকে। আত্মবিকৃতি দ্বারা বালকেরা সেই শুক্র-ক্ষয় করিয়া ভিত্তিমূলসহ দেহ ভগ্ন করিয়া ফেলিতেছে! আমাদের দেহে যে কোন রোগ উৎপন্ন হউক না কেন, সকলই রক্তের বিকৃতিতে হইয়া থাকে। অপরিণামদর্শী হতভাগ্য বালকগণ আত্মবিকৃতি দ্বারা রক্ত বিকৃত করত আবার নানা রোগে রুগ্ন হইতেছে; তাহাদের দেহ কঙ্কাল সার হইতেছে! এরূপ দুর্ভাগ্য বালকদের মধ্যে অনেকেই ৬। ৭ মাস, কেহ কেহ বা বৎসরাবধি ঐরূপে আত্মবিহার করিয়া কঠিন পীড়িত হইয়া অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিতে করিতে অকালে কাল কবলে কবলিত হইতেছে। আর কেহ কেহ বা শীঘ্র না মরিলেও আপন দুষ্কর্ম্মের ফলভোগ ও রোগের যন্ত্রণা ভোগ করিবার কারণ কিছুদিন জীবন্মৃতবৎ হইয়া থাকে।

মনুষ্য সকল যে ক্রমে ক্রমে অল্পায়ু, হীন বীর্য্য, দুর্ব্বল, ক্ষীণ

দৃষ্টি ও স্বল্লাহারী হইতেছে এবং তাহাদের সন্তান-সন্ততী যে অল্প বয়সে প্রাণত্যাগ করিতেছে ; বাল্য কালে এই আত্মবিকৃতিরূপ মহাপাতকই ইহার প্রধান কারণ। এই মহাপাপ কিরূপে দেশ হইতে দূরীভূত হয়, তাহার উপায় বিধান করা, বালকদিগকে সর্ব্বদা সাবধানে রাখা প্রত্যেক বয়স্থ ব্যক্তির কর্ত্তব্য।

অষ্টমবর্ষ বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে য়ীহুদী ও মহম্মদীয় বালকদের যে ত্বকচ্ছেদ করণের প্রথা প্রচলিত আছে। বাইবল ও কোরাণে যে ব্যবস্থা স্পষ্টাক্ষরে লিখিত আছে, বোধ হয় আত্মবিকৃতি পাপ দূর করাই ইহার প্রধান উদ্দেশ্য।

পূর্ব্বে পুণ্যদেশ আর্য্যভূমে এ পাপ কলঙ্ক ছিল না, থাকিলে ঋষিগণ অবশ্যই এ বিষয়ের কোন সদ্বিধান প্রদান করিতেন। ইহা বিশ্বামিত্রের সৃষ্টি বলিয়া যে একটী প্রবাদ আছে, তাহা নিতান্ত অলীক। তাহার বিশেষ কথা বলিতে গেলে পুস্তক বৃহৎ হইয়া উঠে, যদি কখন পারি তবে তাহা গুপ্ত পশুশালায় প্রকাশ করা যাইবে।

যাহা হউক এরূপ অস্বাভাবিকরূপে আত্মবিহার সহস্র বেশ্যাগমনাপেক্ষা অধিক অনিষ্ট জনক। বিশেষতঃ বাল্যকালে এরূপ আত্মবিহার জীবন সংশয়কর সন্দেহ নাই। যদিও আত্ম বিহারী মানব কোন কারণে শীঘ্র শীঘ্র মৃত্যুমুখে নিপতিত না হইয়া বিবাহ করিয়া যৌবনকালে অপত্যোৎপাদন করে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই সে সন্তান-সন্ততী অল্প বয়সেই মৃত্যু গ্রাসে পতিত হইবে।

এই অত্যন্ত লজ্জা ও ঘৃণাকর পাপ কার্য্য দ্বারা বালকেরা কি কি উৎকট রোগে আক্রান্ত হয়, ও কিরূপে তাহার প্রতিবিধান করা যায়, তৎসমস্ত বিষয় দ্বিতীয় অধ্যায়ে লিখিত আছে। সুতরাং এস্থলে তাহা পুনরুল্লেখ করা অনাবশ্যক।

কুসঙ্গদোষে বালকেরা চোর হয়। পক্ষী ধরিতে কি জামাদি ফল পাড়িতে গিয়া বৃক্ষ হইতে পড়িয়া হাত পা খোঁড়া করে এবং অনেক স্থলে আপনাদের জীবন নষ্ট করিয়া, পিতামাতা প্রভৃতি আত্মীয় স্বজনকে শোকসাগরে নিমগ্ন করিয়া যায়। অনেক ছেলে দুষ্ট বালকদের সঙ্গে খেলিতে খেলিতে জলে ডুবিয়া মরে। কেহ কেহ ছাদের উপরে ঘুড়ি উড়াইতে উড়াইতে পড়িয়া মরিয়া যায়। বাজী ছুড়িতে গিয়া পুড়িয়া মরে। কুকুরকে তাড়া করিয়া তাহার দংশনে প্রাণ হারায়। ইত্যাদি।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

কিশোর কিশোরী।

অকালে অনিয়মিত বা অপরিমিত ইন্দ্রিয় পরিচালনার ফল।

যৌবনের অব্যবহিত পূর্ব্বেই কিশোর কালের আবির্ভাব হইয়া থাকে। বালকেরা চতুর্দ্দশ ও বালিকারা দ্বাদশবর্ষ বয়সে কিশোর ও কিশোরীত্ব প্রাপ্ত হয়েন। এই সময় হইতেই প্রকৃত প্রস্তাবে উহাদের বুদ্ধি বৃত্তির বিকাশ, জ্ঞানের উন্মেষ ও কামনাদির সূত্রপাত হইয়া ক্রমে ক্রমে তাহা পরিবর্দ্ধিত হইয়া উঠে।

বাল্যকালে উহাদিগকে শারীরিক নিয়ম, সৎসঙ্গ ও নীতি সম্বন্ধে যে সমস্ত শিক্ষা প্রদান করা যায়, তখন তাহা বীজ বপনের ন্যায় হয়। এখন সেই শিক্ষা-বীজ সকল অঙ্কুরিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

এই সময় হইতে সৎসঙ্গ, বিশুদ্ধ আমোদ প্রমোদ, সৎগ্রন্থ আলোচনা ও সদ্‌গুরু কর্ত্তৃক সদ্দৃষ্টান্ত সংযুক্ত সদুপদেশরূপ বারি সিঞ্চন দ্বারা তাহা শাখা পল্লবে পল্লবিত করতঃ বৃক্ষরূপে পরিণত করিতে পারিলে, উহাদের যৌবনকালে ঐ শিক্ষাবৃক্ষ ফলপুষ্পে সুশোভিত হইয়া সৌরভ ও গৌরব বিস্তার করিতে থাকিবে সন্দেহ নাই।

আর এই কৈশোর কালেই উহাদের অন্তঃকরণে ধর্ম্মশিক্ষা বীজ রোপণ করা কর্ত্তব্য। তাহা হইলে যৌবনকালে উহা

অঙ্কুরিত হইয়া বৃক্ষরূপে পরিণত ও পুষ্পবতী হওত সুগন্ধে জগত আমোদিত এবং সুস্নিগ্ধ ছায়াদানে আপ্যায়িত করিবে, আর বৃদ্ধকালে অমৃতময় ফলদান করিবে।

যে ক্ষুদ্র বালক বালিকা জগদীশ্বরের বিশ্বরাজ্যের এই সুবৃহৎ মনুষ্য সমাজের অঙ্গ প্রত্যঙ্গস্বরূপ; যাঁহারা পরিণামে সন্তান সন্ততির পিতা মাতা ও গুরু প্রভৃতি হইয়া সমাজের নেতা হইবেন; যাঁহাদের দোষ গুণের উপর সমাজের শুভাশুভ সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে, তাঁহারা স্ব স্ব কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিষয়ে সুশিক্ষিত হইয়া তদনুসারে না চলিলে, তাঁহাদের দোষে সমাজ উচ্ছৃঙ্খল হইয়া যাইবে।

অভিনিবিষ্ট চিত্তে অনুধাবন করিয়া দেখিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে, সমাজ একটী মনুষ্য স্বরূপ। আর প্রত্যেক নরনারী এমন কি সদ্যপ্রসূত শিশুটী পর্য্যন্ত তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ। যেমন একটী অঙ্গুলীতে কণ্টক বিদ্ধ হইলে সমস্ত শরীরেই যন্ত্রণা বোধ হয়, তেমনি একটী মনুষ্য দুষ্ট হইলে অথবা একটী শিশুর মৃত্যু হইলে সমস্ত সমাজেরই কষ্ট হইয়া থাকে। যদি বল "অঙ্গুলী শরীরে সংযুক্ত, সুতরাং অঙ্গুলীতে কণ্টক বিদ্ধ হইলে শরীরেই লাগে। কিন্তু মনুষ্য সকল পরস্পর বিচ্ছিন্ন, আর কোন কোন সময়ে স্ত্রীপুরুষেই মিল থাকে না। তবে কোন মনুষ্য দুষ্ট হইলে বা কাহারও শিশুসন্তান মরিলে সমাজের দুঃখ হইবে কেন?" আপাততঃ এইরূপ বোধ হয় বটে, কিন্তু উহা সম্পূর্ণ ভ্রম।

প্রত্যেক মনুষ্যই এমন কি ক্ষুদ্র বালক বালিকাটী পর্য্যন্ত জগতীস্থ মানব সমাজের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ স্বরূপ, ইহা পূর্ব্বেই বলা গিয়াছে। জগতীস্থ প্রত্যেক মনুষ্যের পরস্পর সাহায্যে সমাজ পরিচালিত

হইতেছে। যে দিন পরস্পর সাহায্যদানে বা পরস্পর সাহায্য গ্রহণে সমাজ বিরত হইবে; সেইদিনেই সমাজ ধ্বংস হইয়া যাইবে।

অদ্য আমরা যে অন্নব্যঞ্জন ভোজন করিলাম, যে বস্ত্র পরিধান করিলাম, তাহা যে কতলোকের পরিশ্রম ও সাহায্য দ্বারা প্রস্তুত হইয়াছে, তাহা ঠিক করিয়া কে বলিতে পারে? অতএব নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, মনুষ্য সকলেই পরস্পর সাহায্য সাপেক্ষ। সর্ব্বশক্তিমান জ্ঞানস্বরূপ করুণানিধান ভগবান তাঁহার সৃষ্টি রক্ষার্থে অদ্ভুত কৌশলজাল বিস্তারিত করিয়া রাখিয়াছেন।

মনুষ্য যদি পরস্পর উদর পালনের জন্য বিব্রত না হইত, পুত্র কলত্রাদি পরিজনের ভরণ পোষণের নিমিত্ত পরিশ্রম পূর্ব্বক অর্থোপার্জ্জন না করিত, তাহা হইলে মনুষ্য কখনই বর্ত্তমান সুখ সম্পত্তির মুখাবলোকন করিতে পারিত না। উত্তমোত্তম অট্টালিকা, সুরম্য উদ্যান, মণিমুক্তাদি বিবিধ অলঙ্কার, নানাবিধ উপাদেয় খাদ্য, মূল্যবান মনোহর পরিচ্ছদ সকল, রাজপথ, জ্ঞানগর্ভ ও বিজ্ঞানপূর্ণ রাশি রাশি পুস্তক, বাষ্পীয়পোত ও বাষ্পীয় রথ, শিবিকা ও শকট এবং আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য বৈজ্ঞানিক যন্ত্র, বিচিত্র চিত্রাবলী তথা মনোমুগ্ধকর বিবিধ বাদ্য যন্ত্রাদিও মনুষ্যের প্রয়োজনীয় অশেষ উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট সামগ্রী সকল কেবল মনুষ্যের পরিশ্রমেই প্রস্তুত হইতেছে। মনুষ্য সমষ্টির পরিশ্রমে জগতে যে কত আশ্চর্য্য কাণ্ড হইয়া গিয়াছে, তাহা বর্ণনাতীত। সমুদ্রে সেতুবন্ধন, বাবিলের গগণস্পর্শী উচ্চ দুর্গ, ঝুলান বাগান, মিসরের পিরামিড, চীনের প্রাচীর, লণ্ডনের ক্রীষ্টাল প্যালেস (স্ফটিক নির্ম্মিত রাজপ্রাসাদ) টেম্স

নদীর তলবর্ত্ম, আগরার তাজমহল প্রভৃতি মানুষের পরিশ্রমের অতুল কীর্ত্তি সকল অদ্যাপি দেদীপ্যমান রহিয়াছে।

যাহারা অলস ও শ্রম বিমুখ এবং বুদ্ধিহীন এ জগতে তাহারাই দুর্ভাগ্য এবং দীনহীন কাঙ্গালী। তাহারাই মলিন ও ছিন্ন বস্ত্র পরিধান করতঃ নিরাশ্রয়ে বাস করে এবং নানা প্রকার রোগে রুগ্ন হওতঃ জীর্ণশীর্ণ কলেবরে অনাহারে কত যন্ত্রণা ভোগ করতঃ প্রাণত্যাগ করে। জগতে দরিদ্রলোকের সংখ্যাই অধিক। বার আনা দরিদ্র, চারি আনা ধনী। দরিদ্রলোকের মধ্যে আবার অনেক কাঙালী আছে, তাহারা ভিক্ষা দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে। আজ কাল কলির প্রভাবে লোকের অন্তঃকরণে দয়া অতি বিরল। সুতরাং ভিখারিরা আর বড় ভিক্ষা পায় না। অতিথি ও দীন সেবক ভারতবাসিরা যে আজ কাল অতিথি বৈমুখ করিতে পরাঙ্মুখ বা কুণ্ঠিত নহেন, পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও সভ্যতাই ইহার প্রধান কারণ।

যাহা হউক মনুষ্য সকল ঈশ্বর কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া পরস্পর পরস্পরের সাহায্য করতঃ ঈশ্বরের কার্য্যই সাধন করিতেছে। স্বার্থভাবেই হউক আর নিঃস্বার্থভাবেই হউক সকল মনুষ্যই পরস্পরের সেবা করিতেছে। কৃষক কৃষিকার্য্য করিয়া অন্যের জন্য অন্ন প্রস্তুত করিতেছে। তন্তুবায় বস্ত্র বয়ন করিয়া অপরের কারণ পরিচ্ছদ প্রস্তুত করিতেছে। রাজমিস্ত্রী গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া অপরের বাসস্থান প্রস্তুত করিয়া দিতেছে। এইরূপে যিনি যে কোন কর্ম্ম করুন না কেন, তদ্দ্বারা অন্য লোকেরই সেবা করিতেছেন। বৈদ্য ঔষধাদি প্রস্তুত পূর্ব্বক রোগীর সেবা শুশ্রূষা করিয়া থাকেন। অধিক কি মাতা পুত্রের সেবা ও পুত্র মাতার সেবা করেন। রাজা প্রজার সেবা ও প্রজা

রাজার সেবা করেন। মনুষ্যদিগের সেবা করিতে আমার জন্ম হইয়াছে। অতএব আমি মানবগণের সেবাকার্য্য করিয়া ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন করিতেছি। যিনি এরূপ ভাবে কর্ম্ম করেন, তিনিই নিঃস্বার্থভাবে কর্ম্ম করিতেছেন এবং তিনিই ঈশ্বর ভক্ত মনুষ্য। আর যে ব্যক্তি আমি নিজের কার্য্য করিতেছি মনে করিয়া কোন কর্ম্ম করে, সেই ব্যক্তিই স্বার্থপর বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে।

এস্থলে আবার বলিতেছি সমাজ পরস্পর সাহায্য সাপেক্ষ এবং প্রত্যেক ব্যক্তি সমাজের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ স্বরূপ। একটী শিশু সন্তান প্রাণত্যাগ করিলে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে যেমন তাহার পিতা মাতার ক্ষতি ও দুঃখ হয়, অসাক্ষাৎ সম্বন্ধে সমাজেরও তদ্রূপ দুঃখ ও ক্ষতি হইয়া থাকে। উক্ত শিশুটী জীবিত থাকিয়া যথার্থ মানুষ হইলে পিতা মাতা প্রভৃতি স্বজনবর্গের হিত সাধনের সঙ্গে সঙ্গে দেশের ও সমাজেরও হিতসাধন করিত। মনুষ্যভাব বিশিষ্ট মনুষ্য যেমন সমাজের উন্নতি বর্দ্ধন করিতে পারেন, পশুভাব বিশিষ্ট মনুষ্য তেমনই সমাজের অনিষ্ট সাধন করিয়া থাকে। সমাজ যদি ইহা বুঝিয়া পরস্পর নিঃস্বার্থভাবে পরস্পরের সেবা করিয়া সৃষ্টিকর্ত্তার অভিপ্রায়ানুযায়ী কার্য্য করিতেন, তাহা হইলে সমাজের আর এ দুর্দ্দশা ঘটিত না। স্বার্থপরতাই পাপের মূল ও সমাজের অবনতির প্রধান কারণ। প্রাচীন আর্য্য সমাজ ইহা বুঝিতেন এবং বুঝিয়া তদনুযায়ী চলিতেন। সেই জন্যই আর্য্য সমাজ জগতের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও পূজনীয় হইয়াছিলেন এবং ধর্ম্মনীতি, সমাজনীতি, রাজনীতি ও শারীরিক, মানসিক এবং আধ্যাত্মিক উন্নতি সহকারে কি সঙ্গীত কি চিকিৎসা কি দর্শন কি জ্যোতিষাদি

বিবিধ বিজ্ঞান শাস্ত্রের উন্নতির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

যবন ও ম্লেচ্ছ সংস্পর্শেই আমাদের অধোগতি হইয়াছে। মুসলমান বাদশাহেরা হিন্দু রাজত্ব লোপের সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুদের বিদ্যা বুদ্ধি জ্ঞান গরিমা ও শৌর্য্য বীর্য্যাদি সকলই হরণ করিয়া লইয়াছে। এবং হিন্দু রাজাদের ও নানা মঠের পুস্তকালয় স্থিত প্রায় দুইলক্ষ সংস্কৃত গ্রন্থ দগ্ধ করিয়া ফেলিয়াছে! সেই হইতেই হিন্দুদিগের অসাধারণ বিদ্যা বুদ্ধি জ্ঞান ধর্ম্ম ও প্রতিভাদি সকলই বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। যাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল, ইংরাজ রাজত্বে তাহাও ক্রমে ক্রমে লোপ পাইতেছে। ক্রমশই আমরা জাতীয়ত্ব, মনুষ্যত্ব ও পবিত্রতা হারাইয়া পশুত্ব প্রাপ্ত হইতেছি। লেখক শিরোমণি শ্রীযুক্ত পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও মৃত অক্ষয়কুমার দত্ত আমাদিগের ভক্তিবৃত্তি, জাতীয়ত্ব ও পবিত্রতার প্রতি আঘাত করিয়াছেন। বিদ্যাসাগর ও দত্ত মহাশয়ের প্রচারিত 'বোধোদয়, আখ্যানমঞ্জরী, চরিতাবলী ও চারুপাঠ এবং বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার প্রভৃতি পুস্তক পাঠে বালক বালিকারা জাতীয়ত্ব হারাইয়া পাশ্চাত্য ভাবে বিভূষিত হইতেছে। দত্তজা সর্ব্বজ্ঞ ঋষিদিগের আবিষ্কৃত বিজ্ঞান শাস্ত্রাদি পদতলে বিদলিত করিয়া পাশ্চাত্য বিজ্ঞান,মস্তকে ধারণ করিয়া গিয়াছেন। আর্য্যধর্ম্ম ও আর্য্যপণ্ডিতগণকে যেন একেবারে পাতালে বসাইয়া দিয়াছেন। তাই আজ আমাদিগের প্রাণপ্রতীম সর্ব্বস্বধন বালক বালিকাগণ দেবসাজ পরিত্যাগ করিয়া বানর সাজিতে ভালবাসিতেছে।

গ্রাম্য পাঠশালাতে ব্রাহ্মণ কায়স্থ প্রভৃতি বিবিধ জাতীয় বালকেরা লেখা পড়া শিক্ষা করে। গুরু মহাশয় হীনজাতীয় হইলেও

ঐ সকল বালক প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে বিদায়কালে ভক্তিভাবে সরলমনে গুরুমহাশয়ের পদতলে পড়িয়া "গুরু মহাশয় বিদ্যা দাও" বলিয়া প্রণাম করিয়া থাকে। কিন্তু এখন ইংরাজী স্কুলে ব্রাহ্মণ জাতীয় কোন পণ্ডিত বাঙ্গালা পড়াইতে আসিলে, সেই বালকেরাই পণ্ডিত মহাশয়ের পশ্চাৎভাগে থাকিয়া তাঁহার টিকি ধরিয়া টানাটানি করে। এই সকল বিভৎস ব্যাপার ঐ সকল পুস্তকের দোষে, শিক্ষক বা উপদেশকের দোষে এবং সঙ্গ দোষে ঘটিয়া থাকে। সুখের বিষয় এই যে, অধুনা অনেক সহৃদয় মহাশয় এবিষয় বুঝিতে পারিয়া আর্য্যভাব ও দেশীয় সদ্দৃষ্টান্তাদি পরিপূরিত নীতি ও জ্ঞানগর্ভ পুস্তক সকল প্রচারিত করিয়া বালক বালিকাগণকে জাতীয়ভাবে ও দেবসাজে বিভূষিত করিতে যত্নবান হইয়াছেন। এজন্ত তাঁহাদের নিকট আমরা আন্তরিক কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি।

৮।৯ বৎসর বয়স্ক হইলেই প্রায় বালকেরা সঙ্গদোষে আত্ম-বিহার করিতে শিক্ষা পায়। এই কুশিক্ষা অভ্যাস করিতে করিতে তাহারা কৈশোর অবস্থায় আসিয়া পড়ে। তাহারা গোপন ভাবে ঐ ঘৃণিত কার্য্য সম্পাদন করে বটে, কিন্তু তাহার চিহ্ন সকল তাহার শরীরে প্রকাশ হইয়া পড়ে। বদনমণ্ডলে বহু ব্রণ জন্মে। মুখ মলিন ও প্রভাশূন্য হয়। এবং কণ্ঠাদ্বয় বাহির হইয়া পড়ে। আর রগ দুটী ও কপোলদেশ বসিয়া যায়। নেত্রকূপে চক্ষুদ্বয় প্রবিষ্ট হয়। দৃষ্টিক্ষীণ হইয়া পড়ে। বক্ষঃস্থলে কূপ নির্গত হয়। পৃষ্ঠে ও বক্ষে বেদনা জন্মে। শিরোঘূর্ণন, শরীর কম্পন ও মৃগী-রোগ উপস্থিত হয়। অরুচি ও উদরের পীড়া জন্মে। অণ্ডকোষ ঝুলিয়া পড়ে। আবার অনেকেরও জলদোষের পীড়া হয়। ধারণা ও মেধাশক্তি এবং বুদ্ধি প্রায়

কিছুই থাকে না। অতিশয় চঞ্চল প্রকৃতি ও নিতান্ত অলস হয়। পরিশ্রম ক্ষমতা আদৌ থাকে না। অধিকক্ষণ বসিয়া থাকিতে কষ্ট বোধ করে। শয়ন করিয়া থাকিতেই ভাল বাসে। কোন কার্য্যে উৎসাহ বা অধ্যবসায় থাকে না। কাম ও ক্রোধ রিপু অতিশয় প্রবল হইয়া উঠে। শরীর ও মন দুই পৃথক পদার্থ হইলেও উভয়ের বিলক্ষণ মিল আছে। এজন্য শরীর অসুস্থ হইলে মনও অসুস্থ হয় এবং মানসিক কোন দুঃখ কি কষ্ট উপস্থিত হইলেও শরীরেও কষ্ট হইয়া থাকে। মনের সহিত শরীরের নৈকট্য সম্বন্ধ থাকিলেও জননেন্দ্রিয়ের সহিত মনের যেমন আরও নিকট সম্বন্ধ, এমন আর কোন ইন্দ্রিয়ের সঙ্গেই নহে। এ কারণ জননেন্দ্রিয়ের অকারণ বা অকালে কি অনিয়মিত বা অপরিমিত যথেচ্ছ পরিচালনা দোষে, বিশেষতঃ আত্ম বিকৃতিরূপ মহাপাপে মানসিক সৎবৃত্তি সমুদায় একেবারে নিস্তেজ অকর্ম্মণ্য ও বিকৃতি হইয়া পড়ে। একেবারে নির্লজ্জের শেষ ও হীন সাহস হয়, নির্জ্জনে থাকিতে ভাল বাসে। লোকালয়ে কি কোন সভাস্থলে, দশজন ভদ্র লোকের নিকটে যাইতে লজ্জিত হয়। এমন কি কোন মতে যাইতে পারে না। চিন্তাশক্তি হীন ও উন্মাদগ্রস্ত হয়। সুতরাং এরূপ মহাপাপী মনুষ্যপদে কথনই বাচ্য হইতেপারে না।

বালকেরা বাল্য ও কৈশোর কালে আত্মবিকৃতি দোষে লিপ্ত হইলে, যৌবনকালে তাহাদিগকে সেই পাপের ফলভোগ করিতে হয়। এরূপ মহাপাতকিদের মধ্যে অনেকে পূর্ণ যৌবন প্রাপ্ত হইয়া নারী সঙ্গমরূপ শারীরিক সার সুখে একেবারে বঞ্চিত হইয়া থাকে। তন্মধ্যে কেহ কেহ বা ধ্বজভঙ্গ হইয়া কামাভিলাষ চরিতার্থ করিতে না পারিয়া মনোদুঃখে আত্মহত্যা সম্পা-

ন করিয়াছে। অনেকের মেহ ও শিরঃপীড়া জন্মে। শ্লাকাশ ও ক্ষয়কাশ উপস্থিত হয়, পাথরি রোগ জন্মায়। াতুদৌর্ব্বল্য উপস্থিত হয়। উক্ত পাপে এই সকল পীড়ায় অনেকে যৌবন দশায় কালগ্রাসে পতিত হইতে থাকে। ঐরূপ কোন কোন পাপী রুগ্ন ও অল্পায়ু সন্তান-সন্ততীর জন্ম দিয়াই যমের অতিথি হইয়াছে।

কৈশোর অবস্থা হইতেই শারীরিক-তত্ত্বে সুশিক্ষিত হইয়া সাবধানে চলা আবশ্যক। এজন্য কৈশোরকালে আত্মবিহার ও যৌবনাবস্থায় অনিয়মিত ও অপরিমিত ইন্দ্রিয় চালনা করিলে অথবা বেশ্যাসক্ত হইলে, যৌবন ও বৃদ্ধদশায় যে সকল পীড়া জন্মিয়া থাকে, তাহা এস্থলে বর্ণনা করা যাইতেছে।

জননেন্দ্রিয়ের অপব্যবহার দোষই সকল পীড়ার আকর, তাহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি; কিন্তু ৩৫।৩৬ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত মানুষের শরীরে বিলক্ষণ রক্তের তেজ থাকে। সে সময়ে উক্ত পাপের বীজ সকল ধাতুবিশেষে সকল দেহে অঙ্কুরিত হইতে পায় না। ৪০ বৎসরের পর হইতে, কাহার কাহার বা ৫০ বৎসর বয়সের সময় হইতেই ঐ দুষ্কর্ম্মের ফল সকল ফলিতে থাকে। কেহ কেহ একেবারে দৃষ্টিহীন হন। কেহ কেহ বাতে পঙ্গু হইয়া যান। কাহার কাহার মস্তকসহ গ্রীবা ও স্কন্ধদেশ নত হইয়া পড়ে এবং কোমর ভাঙ্গিয়া যায়, উঠিতে বসিতে পারে না, কষ্টসাধ্যে যষ্টি অবলম্বন পূর্ব্বক দণ্ডায়মান হইতে এবং কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত গুড়ি গুড়ি চলিয়া যাইতে পারে। স্মরণশক্তি কিছুই থাকে না। অর্শের পীড়া আসিয়া উপস্থিত হয়। হাঁপানী কাশী জন্মে। কর্ণ বধির হয়। বহুমূত্রের পীড়া জন্মিয়া থাকে। পঞ্চাশ বৎসর বয়ঃক্রমের পূর্ব্বেই দন্ত সকল পড়িয়া যায়। অগ্নিমান্দ্য হইয়া অজীর্ণ

এবং অতিসার রোগ উপস্থিত হয়। উপদংশ অর্থাৎ গরমীর ব্যারাম হয় ও বাধি হইয়া থাকে। একেবারে পুরুষত্ব হীন হইয়া যায়। শৌচপ্রস্রাবের বেগ আদৌ ধারণ করিতে পারে না। ইহাতে অনেকে রাত্রে নিদ্রিতাবস্থায় বিছানায় প্রস্রাব করিয়া থাকে। অনেকের ধবল ও গলিত কুষ্ঠ রোগ পর্য্যন্ত হয়। কাহার কাহার অণ্ডদ্বয় পেটের ভিতর প্রবিষ্ট হইয়া যায়।

অকালে বা অনিয়মিত ও অপরিমিতরূপে ইন্দ্রিয় পরিচালনা দ্বারা শুক্রক্ষয় করতঃ রক্ত বিকৃত করিলে সকল পীড়াই হইতে পারে। আমরা এস্থলে পৃথক্ পৃথক্ করিয়া সে সকল পীড়ার নাম উল্লেখ করিতে আর ইচ্ছা করি না; ইহাই যথেষ্ট হইয়াছে। তবে উক্ত মহাপাপে নিম্নলিখিত কতিপয় রোগে কয়েক ব্যক্তি যাবজ্জীবন যন্ত্রণাভোগ করতঃ কেহ ৫০, কেহ ৬০, কেহ ৬৫, কেহ বা ৭০ বৎসর বয়সে প্রাণত্যাগ করিয়াছে। স্বয়ং গ্রন্থকার তাহার চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের সাক্ষী আছে।

একব্যক্তি ঐ পাপে পাপী ছিল। সে মধ্যে মধ্যে ধনুষ্টঙ্কার পীড়ায় পীড়িত হইয়া ভয়ানক যন্ত্রণা ভোগ করিত। শেষে সে সেই পীড়াতেই দেহত্যাগ করিল।

আর একজন পাপীর মধ্যে মধ্যে মলদ্বার দিয়া তাহার নাড়ী ভুঁড়ি সকল বাহির হইয়া পড়িত। সেই অবস্থায় তাহার কাতরাণী দেখিয়া কে না অশ্রুপাত করিত। অনেক দিন পর্য্যন্ত সে ঐ রোগ ভোগ করিয়া পরে সেই রোগেই যমালয়ে প্রস্থান করিল।

আর এক পাপী পক্ষাঘাতে চিররোগী থাকিয়া অবশেষে ৬৫ বৎসর বয়সে ওলাউঠায় প্রাণত্যাগ করিয়াছে।

একজন যৌবন কালে তাহার গুরুকন্যা হরণ করে। ২২ বৎসর বয়সের সময় তাহার শূল রোগ উপস্থিত হয়। দুই এক মাস অন্তর তাহার সেই পীড়া প্রবল হইয়া উঠিত। শূল-বেদনা যে দিন তাহারে আক্রমণ করিত, সেদিন সে প্রথমতঃ ৬।৭ ঘণ্টা কাল অবিচ্ছেদ যন্ত্রণায় ছট্‌ফট করিতে থাকিত এবং উচ্চৈঃস্বরে আর্ত্তনাদ করিত। তার পর ক্রমে ক্রমে ৪।৫ ঘণ্টা কাল গোঁ গোঁ শব্দ করিতে করিতে ২।৩ ঘণ্টা সংজ্ঞাহীন ও মূর্চ্ছাগত হইয়া থাকিত। পরে ক্রমশ কিঞ্চিৎ সংজ্ঞালাভ করতঃ আবার ৪।৫ ঘণ্টা গোঁ গোঁ করিত। তার পর পুনরায় ৬।৭ ঘণ্টা ডাক ছাড়িয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ছটফট করিত এবং ভয়ানক কাতরাণী প্রকাশ করিত। সেদিন ২৪ ঘণ্টা তাহার কেবল পাপের নরক যন্ত্রণা ভোগ ভিন্ন আহার নিদ্রাদি আর কিছুই হইত না। সে বলিত যেন একটা জ্বালাদায়ী ভীষণ লৌহ মুষল তাহার গুহ্যদ্বারে প্রবিষ্ট হইয়া ক্রমে ক্রমে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত ঠেলিয়া উঠিত। আবার আস্তে আস্তে নামিয়া আসিত। এইরূপে ৪৮ বৎসর পর্য্যন্ত স্বকৃত জ্ঞানকৃত পাপের ফল ভোগ করিতে করিতে ৭০ বৎসর বয়সে সে প্রাণত্যাগ করিল।

আর এক ব্যক্তি অতিশয় ইন্দ্রিয়াসক্ত ছিল। সে কলে বলে ছলে কৌশলে অনেক কুল বধূর সতীত্ব রত্ন অপহরণ করিত। "য্যায়সা করেগা, অয়সা পাওয়েগা" অর্থাৎ যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল, পরমেশ্বর তাহার দুষ্কর্ম্মের ফল হাতে হাতে প্রদান করিলেন। সে ব্যক্তির নাভিকুণ্ড সহিত বস্তিদেশ ও অণ্ডদ্বয় সহিত শিশ্ন সমুদায় পচিয়া পোকা পড়িল। বৎসরাবধি সে এই রোগ ভোগ করে ও তাহাতেই মরে। রোগের যন্ত্রণা ও কীটের দংশনে সর্ব্বদাই সে চীৎকারপূর্ব্বক ক্রন্দন করিত। এবং

দুর্গন্ধে পাড়া প্রতিবাসী সকলে স্থান পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। পথিকেরা সেই পুতি গন্ধে থু থু করিয়া নাসারন্ধ্র বন্ধ করতঃ অতি দ্রুত বেগে রোগীর অবস্থানের স্থানটুকু অতিক্রম করিয়া যাইত। লোকে বলে এখানকার পাপ এই খানেই ভুগিতে হয়। এ কথা বড় মিথ্যা নয়। তবে কি না ঈশ্বর ক্রোধে ধীর ও অনুগ্রহে মহান্। এইজন্য তিনি সর্ব্বক্ষণ ইহকালে পাপীর সমুচিত দণ্ড বিধান না করিলেও পরলোকে পাপীর অব্যাহতি নাই। তবে লোক সকলকে সতর্ক করিবার ও তাহাদিগের মঙ্গল কামনায় ভগবান ইহ কালেই কখন কখন কোন কোন পাপীর দণ্ড বিধান করিয়া থাকেন।

কোন লোক আত্মবিকৃতি, অপরিমিত ইন্দ্রিয় পরিচালনা, বেশ্যাসক্তি ও সুরাপান দোষে দোষী ছিল। মধ্যে মধ্যে সে জননেন্দ্রিয়ের পীড়ায় পীড়িত হইত। তাহার প্রস্রাবের দ্বার বন্ধ হইয়া যাইত। ডাক্তার আসিয়া সলা পাশ করিত। সে যন্ত্রণা ও চিকিৎসা প্রণালী এখনও মনে পড়িলে ভয়ে শরীর আড়ষ্ট হইয়া থাকে। সেই হতভাগ্য পাপীকে ইন্দ্রিয়দোষ পরিত্যাগ করিতে ডাক্তার বারবার উপদেশ দিয়াছিলেন। কিন্তু সে কোন মতে অভ্যস্ত পাপ ত্যাগ করিতে পারে নাই। অবশেষে তাহার পাথরি রোগ জন্মিলে অস্ত্র চিকিৎসায় প্রাণ বিয়োগ হইয়া উঠে। আমরা উপরে অভ্যাসের দোষগুণ ব্যক্ত করিয়াছি। এখন দেখ, এই পাপী প্রাণত্যাগ করিতে সম্মত হইল, তথাপি অভ্যাস ত্যাগ করিতে পারিল না। অতএব সাবধান প্রাণান্তেও কু অভ্যাস রূপ যন্ত্রণাদায়ী মরণ পথে পদার্পণ করিও না। অতি কষ্টসাধ্য হইলেও সর্ব্বক্ষণ সদভ্যাস রূপ অমৃত পথে গমন করিবে। তাহা হইলে পরিণামে অমৃতধামে অনুপম আরামে অবস্থিতি করিতে

হইবে। প্রথমে কষ্ট ভিন্ন শেষে সুখ হয় না ইহা নিশ্চয় জানিবে।

এখন আর এক জনের কথা বলিব। ইনিও উক্ত মহাপাপে পাপী ছিলেন। ইহাঁর ভয়ানক প্লীহা ও অতি উচ্চ উদরী রোগ জন্মে, নিদ্রার সহিত প্রায় সাক্ষাৎ হইত না। অনেক দিন পর্য্যন্ত লোকসমাজে নিজ বিভৎস আকৃতি প্রদর্শন পূর্ব্বক পরিশেষে যন্ত্রণা বেষ্টিত হইয়া যমালয়ে নীত হয়েন।

আমরা উপরে যে সপ্ত পাপীর পরিচয় দিলাম। উহাঁরা সকলেই অপুত্রক, নিষ্ঠুর, খিটখিটে স্বভাব এবং পূর্ণ যৌবনে বার্দ্ধক্য দশা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। রোগের যন্ত্রণায় ইহাঁদের যত কষ্ট হইয়াছিল, অনিদ্রা বশতঃ ইহাঁরা ততোধিক ব্যথিত ছিলেন। ইহাদের সকলেরই অন্তঃকরণ সর্ব্বক্ষণ কাম ভাবে পরিপূর্ণ থাকিত। খেতে শুতে পথ চলিতে চলিতে ঐ চিন্তাই করিত; আর স্ত্রীলোক দেখিলেই উহাদের মনের কুভাব প্রবল হইয়া উঠিত। বিনা সহবাসেও যখন তখন রেতঃপাত হইত। সঙ্গম ইচ্ছা বা তদুপক্রম করিলে অথবা স্ত্রীলোককে স্পর্শ করিতে গেলেই শুক্র নিঃসারণ হইয়া যাইত। আর প্রত্যহ রাত্রে অতি ভয়ানক ও কদর্য্য স্বপ্নসকল দর্শন করিত। হতভাগারা না বুঝিয়া আগে বড় বাড়াবাড়ি করিয়াছিল, এখন তৎপ্রতিফল স্বরূপ তাহারা সময় কালে পূর্ণযৌবনের সুখভোগের উপযুক্ত সময়ে অনুপযুক্ত হইয়া পড়িল। উহাদের সকলেরই জননেন্দ্রিয় হীনবল, ক্ষীণ ও ক্ষুদ্র হইয়াছিল।

ডাক্তার প্লেটীরিয়স বলিয়াছেন—সুইজারলণ্ডের এক ধনী মানী ভদ্রব্যক্তি শৈশবাবস্থা হইতেই আত্মবিকৃতি পাপে লিপ্ত থাকিয়া ক্রমে ধ্বজ ভঙ্গ হন। যৌবনকালে সেই অবস্থাতেই

তিনি দারপরিগ্রহ করেন। স্ত্রী সহবাস করিতে প্রয়াস পাইলেই তাঁহার শ্বাসরোধ হইয়া যাইত। উক্ত ডাক্তার সাহেব তাঁহার চিকিৎসা করেন। তিনি তাঁহাকে স্ত্রীগমন চেষ্টা করিতে নিষেধ করিয়া ঔষধাদি ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, কিন্তু মন্দমতি হতভাগা সে প্রতিষেধ না শুনিয়া একদা সহবাসের চেষ্টা করিয়া ভার্য্যা-বক্ষেই প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছিল।

এই পাপে অনেকের রক্ত এতদূর বিকৃত হইয়া পড়ে যে, ৪০।৫০ বৎসর বয়সের পর তাহাদের শরীরে একটু আঁচড় লাগিলে ঘা হয়, পাকিয়া উঠে এবং পচিতে থাকে। তাহাতে কেহ কেহ বা ৩।৪ মাস ও কেহ কেহ ৫।৬ মাস ভুগিয়া আরোগ্য লাভ করে। আর কেহ কেহ বা ক্রমে ক্রমে পচিয়া মরে।

ছেলেদের মধ্যে কেহ কেহ ৮।১০, কেহ কেহ ১১।১২ কেহ কেহ ১৩।১৪, কেহ কেহ ১৫।১৬ ও কেহ কেহ বা ১৭ ১৮ বৎসর বয়স হহলে কুসঙ্গ প্রভাবে আত্মবিকৃতি পাপে লিপ্ত হয়। তাহারা এবং যাহারা যৌবনের প্রাক্কালাবধি অপরিমিত ও যথেচ্ছ ইন্দ্রিয় চালনা করে, তাহাদের শরীর অত্যন্ত কৃশ ও খর্ব্বাকৃতি হয়। কাঁচাবাঁশে ঘুণ ধরার ন্যায় হয়। কাঁকড়ার এবং চিঙ্গড়ী মাছের দাড়ার ভিতর যে শাঁস থাকে, পাঁটা প্রভৃতির অস্থির অভ্যন্তরে যে মেদ আছে, তাহাকে মজ্জা বলে। মানুষের অস্থির ভিতরেও তদ্রূপ মজ্জা থাকে। যাহারা উপরোক্ত পাপে পাপী, তাহাদের অস্থি মধ্যে মজ্জা জন্মিতে পারে না, সুতরাং তাহাদের অস্থি সকল অতি ক্ষীণ ও সংকীর্ণ হইয়া থাকে। কাজে কাজেই তাহারা নিতান্ত দুর্ব্বল, নিস্তেজ, হীনবীর্য্য ও অল্পায়ু হইয়া পড়ে। জগতের দুর্ভাগ্য বশতঃ যদি এরূপ লোকেরা কিছু দিন জীবিত থাকিয়া সন্তান উৎ-

স্বাদন করে, তবে সে সন্তানের চেহারা ঘুঘুর মত হইবে সন্দেহ নাই। এই অবস্থা আশু উন্নতি প্রাপ্ত না হইয়া ক্রমশঃ অবনতির দিকে ধাবিত হইতে থাকিলে বেগুণগাছে আঁকশী দিবার সময় অতি নিকটবর্ত্তী হইবে।

বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের মধ্যে অধিকাংশই বদমাইস। তাহার কারণ, কতগুলি শিক্ষকের চরিত্র বড় ভাল নহে। আর অনেকগুলি অসৎ ছেলে সহপাঠী সঙ্গীরূপে জুটিয়া থাকে। বিশেষতঃ বিদ্যালয়ে প্রকৃত জ্ঞান, ভক্তি ও নীতি বিষয়ে সুশিক্ষার সম্পূর্ণ অভাব রহিয়াছে। নীতি সম্বন্ধীয় দুই একখানি পুস্তক পঠিত হয় সত্য বটে, কিন্তু তাহা জিহ্বা দ্বারা আবৃত্তি করা হয় মাত্র, বালকদিগের চরিত্রে তাহার বিন্দুমাত্রও প্রতিফলিত হয় না।

"যেমন গুরু তেমনি চেলা, টক্ ঘোল তায় ছেঁদা মালা।" বোধ করি ভদ্রের পক্ষে এই ইঙ্গিতটুকুই যথেষ্ট হইবে।

অধিকাংশ ছাত্রই আত্মবিকৃতি পাপে লিপ্ত আছে। আর অল্প সংখ্যক বালক পুংমৈথুনেও মত্ত। পুংমৈথুন বা পশুমৈথুন করিলে রাজদ্বারে দণ্ডিত হইতে হয়। এ কারণ এখানে ঐরূপ পাপ অতি বিরল, কিন্তু পশ্চিমে ও সৈনিকদলে ইহার বিলক্ষণ প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। উহা অতি গুরুতর পাপ। পুংমৈথুন পাপে ঈশ্বরের ক্রোধানলে সদোম অমোরা প্রদেশ একেবারে ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। মুসলমান রাজত্বকালে এক ব্যক্তি একটী ছাগীকে বলাৎকার করিয়াছিল। কাজীর বিচারে সেই ছাগীকেও নাপাক অর্থাৎ অপবিত্র বলিয়া তৎসহ পাপী মনুষ্যকে জীবিতাবস্থায় দগ্ধ করা হইয়াছিল। পুরাকালে এক ঋষিপুত্র মৃগরূপ ধারণ পূর্ব্বক মৃগী রমণ করিতেন, মৃগয়া তৎপর এক নরবর তীক্ষ্ণশর দ্বারা হরিণ জ্ঞানে তাঁহার প্রাণ সংহার করিয়া-

ছিলেন। পাপের ফল হাতে হাতে ফলে; কিন্তু কলিকালে কিছু বিলম্বে ফলিয়া থাকে।

অস্বাভাবিকরূপে অকালে আত্মবিকৃতিরূপ অপরিমিত ও যথেচ্ছ ইন্দ্রিয় পরিচালনাই ছাত্রগণের ক্ষীণ দৃষ্টির প্রধান কারণ। আর সক করিয়া অকালে চসমা চোকে দেওয়া, অধিক অধ্যয়ন করা, রাত্রে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অক্ষর সকল পাঠ করা, কেরোসিন-তেলের আলো ব্যবহার করা, সুরাপান করা, রাত্রি জাগরণ করা, রৌদ্রের আলোকে অধ্যয়ন করা, সর্ব্বক্ষণ লোহিত বর্ণ নিরীক্ষণ করা, অতিশয় পরিশ্রম ও নিয়ত বা নিরম্বু উপবাস করা, রুক্ষ স্নান করা এবং চক্ষের অতি নিকটে ধরিয়া কিছু দেখা বা লেখা দৃষ্টিক্ষীণতার আর আর কারণ। ক্ষীণদৃষ্টি বলিয়া চস্‌মা চোকে দিয়া যে সকল লোককে সচরাচর ভবের হাটে বেড়াইতে দেখিতে পাওয়া যায়; তাহার অধিকাংশই ঐ ধাতুর লোক; তদ্ব্যতীত যাঁহারা নব্য সভ্যাভিমানী, তাঁহাদের অনেকেই সকের কাণা সাজিয়া থাকেন। এই অভিমানীদের চস্‌মা পরা চোকের চাউনী দেখে, বোধ হয় যেন ইহাঁরা অহঙ্কার ভরে ধরাকে সরাখানির ন্যায় দেখিতেছেন!! রে দুর্গন্ধযুক্ত পচা মড়া! তোর আবার অহঙ্কার! তুই সেই সকের খাতিরে হকের বিচারে পড়িয়া, অচিরে সত্য সত্যই কাণা হইয়া যাইবি, আর অহ-ঙ্কারে ছারে ক্ষারে গিয়া নরকে পচিবি। সাধুগণ বলেন "দয়া ধরম কি মূল হেঁয়, নরকমূল অভিমান।" বিদ্যালয়ের বালকগণ দিন দিন সকের কাণা সাজিতেছে! অভিভাবকগণের বারণ করা উচিত। ছেলেরা মনে করে, চসমা প'রে বড় বাহা-দুরই হইয়াছি; কিন্তু তাহারা যে চোকের মাথা ও সেই সঙ্গে পরকালের মাথাও খাইতেছে, তাহা বুঝিতেছে না।

এই গ্রন্থখানি প্রণয়ন করিতে অনুরুদ্ধ হইয়া আমাকে কতগুলি পুস্তক ঘাঁটিতে হইয়াছিল। জন্মাবচ্ছিন্নে যাহা কখনই শুনি নাই, স্বপ্নেও দেখি নাই, কল্পনাতেও আনিতে পারি নাই, এ দেশে কখনও এমন কি এখনও যাহার আমদানি হয় নাই, এমন কতগুলি অতি জঘন্য ঘৃণিত জ্ঞান বিজ্ঞান ও সভ্যতা-সম্ভুত কুৎসিত মহাপাপের কথা পাঠ করিয়া একেবারে আকাট মারিয়া অবাক হইয়া গিয়াছি! এরূপ বিজ্ঞান ও সভ্যতার খুরে দণ্ডবৎ করিয়া তৎক্ষণাৎ সেই পুস্তকগুলি পরিত্যাগ করি। যে দেশের পাপ, সেই দেশেই থাক; আমাদের দেশে যেন না আসে, কায়মনোবাক্যে ভগবান্ সন্নিধানে এই প্রার্থনা করিতেছি। যাঁহারা ঈশ্বরদত্ত হাত থাকিতে কাঁটা চাম্‌চে দ্বারা ভাত খান, জল থাকিতে কাগজে শৌচের কাজটা সারিয়া লন, তাঁহাদের পক্ষে সকলই শোভা পায়!!

যাহা হউক কুসঙ্গ, কুশিক্ষা ও কুদৃষ্টান্ত সত্তেও বালক বালিকাবৃন্দ যাহাতে উক্ত ভয়ানক কু-অভ্যাস ও পাপ প্রলোভনে পতিত হইয়া নষ্ট হইতে না পারে এবং পতিত হইলেও তাহা হইতে যাহাতে উদ্ধার হইতে পারে, এখন হইতে সতর্ক হইয়া তাহার উপায় বিধান করিতে হইবে। কৈশোরকাল হইতেই প্রকৃত প্রস্তাবে পবিত্রভাবে শরীর ও মন সঞ্চালন করিতে পারিলেই উপরোক্ত মহাপাপ সকলের প্রতিকার হইতে পারে। শরীর সঞ্চালন সম্বন্ধে আমরা পূর্ব্বে আসন প্রাণায়াম প্রভৃতির কথা ও ক্রমান্বয়ে মাত্রা বৃদ্ধিপূর্ব্বক ভার-উত্তোলনের বিষয় বলিয়াছি। এক্ষণে নিশা-জলপান, কুম্ভকাদি এবং নৃত্য সম্বন্ধে দুই চারি কথা উল্লেখ করিতে পারি। কিন্তু তৎসমস্ত বিষয় কেবল পুস্তক পাঠে শিক্ষা করিলে চলিবে না, ফলও পাইবে

না, তত্ত্বদ্বিষয়ে পারদর্শী গুরুর নিকটে তাহা শিখিতে হইবে। গুরুহীন বিদ্যা মৃত ও স্ফূর্ত্তি বিহীন হইয়া থাকে।

কুম্ভক (শ্বাসরোধ) করতঃ শূন্যমার্গে উঠিতে এবং দ্বিতল বা ত্রিতল বাটীর ছাদের উপর হইতে শূন্যে ভর করিয়া নির্ব্বিঘ্নে অতি লঘু দ্রব্যের ন্যায় নিম্নে নামিতে পারা যায়।

ঈশ্বর ভজন বা তাঁহার গুণানুকীর্ত্তন শিক্ষা করিতে হইবে, ও তৎকালে ভক্তিরসে বিভোর হইয়া ভাবাবেশে ও প্রেমোল্লাসে নৃত্য করিতে অভ্যাস করিতে হইবে। সময়ে সময়ে এরূপ করিতে পারিলে কদভ্যাস-মতি ও পাপচিন্তা আপনা হইতেই পলায়ন করিবে। অভ্যাস করিলে অর্থাৎ সাধিলেই সিদ্ধি।

সন্ধ্যা সময়ে কোন একটা পাত্রে জল রাখিয়া দিবে। ৪ দণ্ড রাত্রি থাকিতে ঈশ্বরের নামোচ্চারণ পূর্ব্বক গাত্রোত্থান করতঃ সেই জল উভয় বা একটী নাসারন্ধ্র দিয়া ক্রমে ক্রমে পান করিবে। এইরূপ অভ্যাস করিতে করিতে যখন অধিক পরিমাণে জল পান করিতে ক্ষমবান হইবে, তখন ঐ পান করা জল, হয় বমি না হয় ক্রম বিশেষের দ্বারা গুহ্য দেশ দিয়া নিভৃত স্থানে অথবা জলমধ্যে গিয়া নির্গত করিবে। এ প্রকার করিতে পারিলে অল্প কালের মধ্যে কুম্ভক করিতে কোন কষ্ট হইবে না। এতদ্দ্বারা ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না নাড়ী পরিষ্কৃত হয়। ক্রমাগত ৬ মাস কাল এরূপ করিতে পারিলে নাড়ী শুদ্ধি হইয়া কুম্ভক সিদ্ধ হইতে পারে। সিদ্ধ কুম্ভক ব্যক্তি যতক্ষণ ইচ্ছা ততক্ষণ শ্বাস ধারণ করিয়া নিরুদ্বেগে আত্মাতে চিত্ত সমর্পণ করিয়া মানব জন্ম সফল করিতে পারেন।

নিয়ম পূর্ব্বক ৬ মাস নিশা জল পান করিতে পারিলে আর কিছু হউক বা না হউক, শরীর ব্যাধি বিবর্জ্জিত, হৃষ্ট, পুষ্ট, শ্রীমান

ও বলবান এবং চক্ষু জ্যোতিষ্মান হইবেই হইবে। কৈশোরকাল হইতে আরম্ভ করিয়া যে ব্যক্তি যাবজ্জীবন নিশাজল পান করিতে থাকিবে, তাহার দীর্ঘজীবন লাভ হইবে সন্দেহ নাই। শত বৎসর বয়ক্রমের পূর্ব্বে তাহারে কথনই জরা বার্দ্ধক্য আক্রমণ করিতে পারিবে না, তাহার দন্তও পড়িবে না; শ্রবণ ও দর্শনশক্তি চির অব্যাহত থাকিবে।

নিশাজল পানান্তে শৌচকর্ম্ম সমাধান পূর্ব্বক দন্তধাবন করিয়া প্রাতঃস্নান করিবে। তৎপরে পরিস্কৃত শুষ্ক বস্ত্র পরিধান করতঃ পুষ্পোদ্যানে গমন ও যথাবিধি তুলসী ও পুষ্প চয়ন করিয়া নির্জ্জন স্থানে পবিত্র গৃহে আসনে উপবেশন পূর্ব্বক ধুপ ধূনা দিয়া সচন্দন তুলসী পত্র ও পুষ্পাঞ্জলী প্রদানে ইষ্ট দেবের পূজার্চ্চনা করিবে।

দীক্ষা গ্রহণ ও সাত্ত্বিক আহার করা আবশ্যক। এ সম্বন্ধে সবিশেষ বৃত্তান্ত পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য।

আমাদিগের ভুক্ত খাদ্য দ্রব্য যথন পরিপাক হইয়া রক্তে পরিণত হয়। আর সেই রক্তই যখন আমাদের দেহ ও মনের মূলাধার। তখন পবিত্র বস্তু হবিষান্ন ভগবৎপ্রসাদাদি সাত্ত্বিক ভোজন করিলে রক্ত পবিত্র হইয়া দেহ মনও পবিত্র হইবে সন্দেহ নাই।

রাজস তামস অপবিত্র দ্রব্য আহার করিলে, হীন বর্ণের অন্ন ভোজন ও মদ্য মাংসাদি ভক্ষণ করিলে কদর্য্য রক্ত উৎপন্ন হইয়া দেহ ও মনের রোগ জন্মে। মনের রোগ হইলে স্বতই লোকের পাপে প্রবৃত্তি জন্মিয়া থাকে। আহারের সঙ্গে ধর্ম্মের কোন সংস্রব নাই, যাহারা একথা বলে তাহারাই নিরেট মূর্খ।

আভ্যন্তরিক অপবিত্রতা বিনাশার্থে হরিনাম স্মরণ, হরিতকি ভক্ষণ, গায়ত্রীজপ, গঙ্গাজল পান করা কর্ত্তব্য। যথা—

"হরিং হরিতকিঞ্চৈব সাবিত্রীং জাহ্নবীজলং
অন্তর্ম্মল বিনাশায় স্মরেৎ খাদেৎ জপেৎ পিবেৎ।"

আরও একাগ্র চিত্তে ভক্তপালক ভগবানের কথা শ্রবণ কর, কীর্ত্তন কর, পূজা কর এবং অনুক্ষণ তাঁহারই অনুধ্যান করিতে থাক। *

যে সকল মহাত্মা একাগ্রমনে কৃষ্ণ কথা শ্রবণ করেন, পুণ্য শ্রবণ কীর্ত্তন ভগবান কৃষ্ণচন্দ্র স্বয়ং তাঁহাদের সুহৃৎ হয়েন এবং অন্তরস্থ অশুভগুলি বিনষ্ট করেন। †

এইরূপ প্রত্যহ ভাগবত শ্রবণ দ্বারা অশুভগুলি প্রায় সমস্ত বিনষ্ট হইয়া আসিলে যখন চিত্তমোহর কীর্ত্তি ভগবানে অচলা ভক্তি হয়; তখন আর রজস্তমোগুণোৎপন্ন কাম ক্রোধাদি দ্বারা চিত্ত ব্যথিত হয় না; শুদ্ধ সত্ব স্বভাবে অবস্থিত হইয়া শান্তি সুখ লাভ করে। †

কৈশোর কাল হইতেই শারীরিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক সকল সৎকার্য্যেই অভ্যাস করা কর্ত্তব্য। এখন হইতে বদ্ধ পরিকর হইয়া না থাকিলে যৌবন সময়ে মত্ত মাতঙ্গ সদৃশ প্রবল ইন্দ্রিয় বৃন্দের সহিত কিরূপে সংগ্রাম করিতে সমর্থ হইবে?

---

* তস্মাদেকেন মনসা ভগবান্ সাত্বতাম্পতিঃ।
শ্রোতব্যঃ কীর্ত্তিতব্যশ্চ ধ্যেয়ঃ পূজ্যশ্চ নিত্যদা॥

† শৃণ্বতাং স্বকথাঃ কৃষ্ণঃ পুণ্যশ্রবণ কীর্ত্তনঃ।
হৃদ্যন্তঃস্থো হ্যভদ্রাণি বিধুনোতি সুহৃৎসতাম্॥
নষ্টপ্রায়েষ্বভদ্রেষু নিত্যং ভাগবতসেবয়া।
ভগবত্যুত্তমশ্লোকে ভক্তির্ভবতি নৈষ্ঠিকী॥
তদারজস্তমোভাবাঃ কামলোভাদয়শ্চয়ে।
চেত এতৈরনাবিদ্ধং স্থিতং সত্ত্বেপ্রসীদতি॥

কৈশোরাবস্থায় সদভ্যাস না করিলে যৌবন কালে তাহা করা বড় কঠিন। যদিও যৌবনাবস্থায় দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়া সদভ্যাসারম্ভ করিলে সিদ্ধ কাম হওয়া যায় বটে, কিন্তু বৃদ্ধকালে তাহা কোনক্রমেই হইবার নহে। এইজন্য আজ কাল হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দু আচার ব্যবহারের পক্ষপাতী অধিক বয়স্ক হিন্দুধর্ম্ম প্রচারক অনেক লোককে (তাঁহাদের বাল্য বা কৈশোর কাল হইতে অভ্যাস না থাকা হেতু) প্রাতঃস্নান ও জপ তপাদি হিন্দু আচার করিতে অশক্ত দেখিতে পাই। অতএব এইবেলা আলস্য বিহীন হইয়া উপরোক্ত মতে পবিত্রভাবে শরীর ও মন সঞ্চালন করিতে হইবে। এই সকল কার্য্য সাধনে অবশ্য কিছু সময়ের প্রয়োজন। প্রত্যহ অতি প্রত্যূষ হইতে এক প্রহর কাল পর্য্যন্ত এই পবিত্র কার্য্যে নিযুক্ত থাকিলে যথেষ্ট হয়। এই সময়টুকু অপব্যয় হইবে না। প্রত্যুত এতদ্দ্বারা শরীর ও মন সুপরিষ্কৃত, পবিত্র ও জ্যোতিষ্মান্ হইবে এবং আয়ু বৃদ্ধি হইবে সন্দেহ নাই। পূর্ব্বে আর্য্যগণ এই প্রণালী অবলম্বনপূর্ব্বক শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন। কালপ্রভাব এবং হিন্দু রাজার অভাবই বর্ত্তমান অবনতির কারণ।

এখন কথা জন্মিতে পারে যে, এই সকল শারীরিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক ও নৈতিক ব্যাপারে বালকেরা যদি সময় ব্যয় করে, তবে তাহারা কিরূপে অর্থকরী বিদ্যা উপার্জ্জন করিতে পারিবে? ইহা আলস্যমূলক ওজরমাত্র এবং প্রস্তাবিত বিষয়ের গুরুত্ব বুঝিতে অসমর্থতা ভিন্ন আর কিছুই নহে।

১২ বৎসর বয়স হইলে পর, বালকেরা যদি প্রত্যহ একঘণ্টা রাত্রি থাকিতে শয্যা ত্যাগ করিয়া নিশাজল পান, স্নান,

আসন, প্রাণায়াম ও পূজাদি সমাধানপূর্ব্বক ভাগবতাদি পাঠ বা শ্রবণ করেন, তাহা হইলে ঋতুভেদে প্রাতে ৭।৮ ঘণ্টার পর হইতে অপরাপর বিদ্যা অভ্যাস করিতে তাঁহাদের কোন মতে বাধা হইতে পারে না। রাত্রির শেষ এক ঘণ্টা এবং প্রাতঃকালের প্রথম দুই ঘণ্টা, এই তিন ঘণ্টা কাল উক্ত পবিত্র কর্ম্মে ব্যয়িত হইলে, অনন্ত লাভ হইতে পারে। বিশেষতঃ জড়তা দূরীভূত হইয়া বুদ্ধি মেধাদি পরিষ্কার ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে। এখন বারবার আবৃত্তি করিয়া যে কথাটী কণ্ঠস্থ করিতে না পারিবে, তখন দৃষ্টি কি শ্রবণ মাত্রে তাহা মুখস্থ হইবে। এই হেতু আমাদের দেশে পূর্ব্বে অনেক শ্রুতিধর পণ্ডিত জন্মিয়াছিলেন, তাঁহারা একবার মাত্র যাহা শুনিতেন, জন্মাবচ্ছিন্নেও তাহা ভুলিতেন না।

কলিকালে প্রণব ব্যতীত স্ত্রী শূদ্রাদির জপ তপাদিতে নিষেধ নাই।

নিশ্বাস—শ্বাস প্রশ্বাস দ্বারাই জীবের জীবিত লক্ষণ প্রকাশ পায়। জীব জন্মের সঙ্গে সঙ্গে নিশ্বাস বায়ুর সংযোগ হইয়া থাকে। সহজাত বলিয়া নিশ্বাসের অন্যতম নাম সহজ। এই সহজ সম্বন্ধীয় জ্ঞানলাভ ও সহজ সাধন করিয়া সিদ্ধি প্রাপ্ত হইতে পারিলে, মহা বলবান্, কামদেব তুল্য শ্রীমান্ ও নীরোগী হইয় সর্ব্ব সিদ্ধি, দীর্ঘ জীবন—এমন কি অমরত্ব লাভ করিতে পার যায়। অতএব কৈশোরকাল হইতেই এই সহজ সাধন অভ্যাস করা আবশ্যক। এ বিষয়ের শাস্ত্রের নাম স্বরজ্ঞান বা শারীর বিজ্ঞান। এই স্বরশাস্ত্র হইতেই বেদ, আয়ুর্ব্বেদ ও সংগীতাদি সমস্ত শাস্ত্রেরই সৃষ্টি হইয়াছে। স্বরশাস্ত্র আবার অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানের আধার। শ্বাস প্রশ্বাসে "হংস" উচ্চারিত হইয়া থাকে

সকারে শক্তিরূপ এবং হংকারে শিবরূপ মৃত্যু। দিবারাত্রি মধ্যে মনুষ্যের ২১৬০০ বার শ্বাস প্রবাহিত হয়।

সমস্ত শরীরে বাহাত্তর হাজার নাড়ী ব্যাপিয়া আছে। তন্মধ্যে ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না এই তিনটী প্রধান। ইহারা প্রাণবায়ুর মার্গ অবলম্বন করিয়া, বাম নাসায় ইড়া, দক্ষিণ নাসিকায় পিঙ্গলা ও মধ্যপ্রদেশ অর্থাৎ উভয় নাসাতেই সুষুম্না প্রবাহিত হইতেছে। ইড়া নাড়ী চন্দ্র, পিঙ্গলা নাড়ী সূর্য্য এবং সুষুম্না নাড়ী অগ্নির তুল্য। এই সুষুম্নাই কালরূপিণী।

চন্দ্র শক্তিরূপে অবস্থিত হইয়া বাম নাড়ীতে এবং সূর্য্য শম্ভুরূপে পিঙ্গলা নাড়ীতে প্রবাহিত হইতেছেন। বামনাসাপুটস্থিত ইড়া নাড়ী শ্রেষ্ঠা ও সুধারূপিণী এবং জগতের তৃপ্তিদায়িনী অর্থাৎ ইহাদ্বারা যাবতীয় শুভফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। দক্ষিণ নাসাবাহিনী পিঙ্গলা নাড়ী জগতের উৎপত্তি কারিণী। ইহার ফলও শুভ। ব্রহ্মরন্ধ্রগামিনী মধ্যমা সুষুম্না নাড়ী নিষ্ঠুরা ও সর্ব্ব কর্ম্মে বিঘ্নকারিণী। ইহার দ্বারা সমস্ত অশুভ ফল ঘটনা হইয়া থাকে।

ইড়াতে শ্বাস বহন কালে শুভ কর্ম্ম, পিঙ্গলায় স্বরবহন সময়ে ক্রূর কার্য্য এবং সুষুম্নাতে শ্বাস গমনাগমন কালে সিদ্ধি ও মুক্তিপ্রদ কর্ম্ম সকল করিবে।

সমস্ত অহোরাত্রে ষষ্টিদণ্ডে শুক্লপক্ষে চন্দ্র ও কৃষ্ণপক্ষে সূর্য্য নাড়ী আড়াই দণ্ড করিয়া ক্রমে উদিত হয়। দিবসে ইড়া নাড়ীতে ও রাত্রিতে পিঙ্গলা নাড়ীতে স্বর চালনা করিবে। যিনি দিবা ভাগে বাম নাসায় ও রাত্রিকালে দক্ষিণ নাসিকায় শ্বাস বহন রাখেন, তাঁহার শরীরে কোন পীড়া হয় না, আলস্যও থাকে না, দিন দিন চেতনার বৃদ্ধি হয়। এইরূপে শ্বাস বহন

হইলে দ্বাদশ বৎসর অন্তে যদি তাঁহার দেহে সর্প কি বৃশ্চিকে দংশন করে, তবে তাঁহার শরীরে বিষ প্রবেশ করিতে পারে না। তিনি দীর্ঘজীবি হয়েন। দিবাভাগে দক্ষিণ নাসাপুট পুরাতন তুলা দিয়া বন্ধ করিয়া রাখিলে কেবল বামনাসিকায় শ্বাস বহন হইবে। আর রাত্রিকালে বাম নাসারন্ধ্র পুরাতন তুলা দ্বারা বন্ধ করিলে দক্ষিণ নাসাপুটে শ্বাস বহন হইবে। এইরূপ কিছুদিন অভ্যাস করিলেই দিবাভাগে বাম নাসায় ও রাত্রিতে দক্ষিণ নাসিকায় শ্বাস বহন অভ্যাস হইয়া যায়, তখন আর তুলার আবশ্যক থাকে না।

সকারে স্থিত শ্বাসে অর্থাৎ শ্বাস গ্রহণ সময়ে যাহা দান করা যায়, এই মর্ত্ত্যলোকে তাহার ফল কোটি কোটি গুণ হইয়া থাকে।

শ্বাস পতন সময়ে ইড়া নাড়ী প্রশস্ত, স্বর প্রবেশ কালে পিঙ্গলা নাড়ী শুভদায়িকা।

মানুষের স্বাভাবিক শ্বাস দ্বাদশাঙ্গুলি প্রবাহিত হয়। যে ব্যক্তি কুম্ভক যোগাভ্যাস দ্বারা এক অঙ্গুল কমাইতে পারেন অর্থাৎ একাদশ অঙ্গুল শ্বাস বহাইতে পারেন, তাঁহার নিষ্কাম মোক্ষ লাভ হয়। ঐরূপ দুই অঙ্গুলি কমাইলে অর্থাৎ দশ অঙ্গুলি পরিমিত শ্বাস বহিলে সর্ব্বদা আনন্দ ভোগ হয়। নব-অঙ্গুল পরিমাণে শ্বাস বহাইতে পারিলে কবিত্ব ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়। অষ্ট অঙ্গুলি প্রমাণ শ্বাস প্রবাহিত হইলে বাক্‌সিদ্ধি হয়। যাহার সপ্তাঙ্গুল পরিমিত শ্বাস বহে তাহার সুদূর দর্শন শক্তি জন্মে। ছয় অঙ্গুল প্রমাণ শ্বাস বহিলে আকাশে গমনাগমন ক্ষমতা হয়। পঞ্চ অঙ্গুলি পরিমাণ স্বর বহমান হইলে অত্যন্ত দ্রুতগতি হয়। যাঁহার শ্বাস চতুরঙ্গুলি প্রমাণ বহে, তাঁহার অণিমা লঘিমাদি অষ্টসিদ্ধি

লাভ হইয়া থাকে। তিন অঙ্গুলি পরিমিত শ্বাস প্রবাহিত হইলে নব প্রকার নিধি প্রাপ্ত হয়। দুই অঙ্গুলি মাত্র শ্বাস বহিলে মহামায়া ভগবতীর দশ নায়িকা মূর্ত্তি বা বিষ্ণুর দশাবতার মূর্ত্তি দর্শন হয়। যিনি এক অঙ্গুলি শ্বাস বহাইতে পারেন, তাঁহার দেহ ছায়া শূন্য হয়, তিনি দেবত্ব লাভ করেন। আর যাঁহার ঐ দ্বাদশ অঙ্গুল পরিমাণ শ্বাস সমস্তই একেবারে কমিয়া কেবল অন্তর মধ্যেই প্রবাহিত হইতে থাকে, তিনি পরমাত্মার সহিত জীবাত্মাকে সম্মিলিত করতঃ যোগ প্রভাবে শরীরস্থ গঙ্গা নামক তীর্থসম্ভূত অমৃত রস নিত্য পান করিয়া অমর হয়েন। *

দিবারাত্র ৬০ দণ্ড বা ২৪ ঘণ্টায় শুক্ল পক্ষে চন্দ্র ও কৃষ্ণপক্ষে সূর্য্য নাড়ী ২॥ দণ্ড করিয়া বা প্রতি ঘণ্টায় ক্রমে উদিত হয়।

শুক্লপক্ষে বাম নাড়ী ও কৃষ্ণপক্ষে দক্ষিণ নাড়ী বহে। শুক্লপক্ষের প্রতিপদ, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী ও ত্রয়োদশী, চতুর্দ্দশী ও পূর্ণিমা তিথিতে, আর কৃষ্ণপক্ষের চতুর্থী, পঞ্চমী, ষষ্ঠী, দশমী, একাদশী ও দ্বাদশী তিথিতে সূর্য্যোদয়কালে প্রথমে বাম নাসিকাপুটে বায়ু বহন আরম্ভ হইয়া এক ঘণ্টা কাল স্থিতি থাকে। ঐরূপ কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপদ, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, সপ্তমী, অষ্টমী. নবমী, ত্রয়োদশী, চতুর্দ্দশী, অমাবস্যা এবং শুক্লপক্ষের চতুর্থী, পঞ্চমী ষষ্ঠী, দশমী, একাদশী এবং দ্বাদশী তিথিতে সূর্য্য উদয়কালে প্রথমতঃ দক্ষিণ নাসাপুটে শ্বাস বহন আরম্ভ হইয়া এক এক ঘণ্টা ক্রমে প্রতি নাসিকায়

---

* ৩৫।৩৬ বৎসর অতীত হইল, ভূকৈলাসের রাজা সত্যচরণ ঘোষাল—তাঁহাদের জঙ্গল মহলস্থ তালুক হইতে ঐরূপ একজন যোগীকে আনাইয়াছিলেন। তাঁহার ক্ষুধা তৃষ্ণা ছিল না।

১২ বার হিসাবে উভয় নাসিকায় ২৪ বার সংক্রমণ হইয়া থাকে। ইহার ব্যতিক্রমে বিপরীত ফল অর্থাৎ পীড়াদি অশুভ ঘটনা হয়।

বামস্বর বহিবার সময়ে বামস্বর এবং দক্ষিণ স্বর বহিবার কালে দক্ষিণ স্বর প্রবাহিত হইলে দিবসে ও রাত্রিতে সমস্ত কার্য্যই সুসিদ্ধ হয়।

শুক্লপক্ষের দ্বিতীয়া তিথিতে রবিবারে যদি ইড়া নাড়ী বহে, তাহা হইলে পুরুষের লাভ হইবেক। সোমবারে বহিলে সুখ ভোগ হইবেক।

প্রভাত ও মধ্যাহ্নে বাম নাসায় এবং সায়াহ্নে দক্ষিণ নাসায় স্বর বহন হইলে নিত্য জয়লাভ হইবেক এবং ইহার বিপরীত হইলে অর্থাৎ প্রাতে ও দ্বিপ্রহর বেলায় দক্ষিণ নাসা এবং সন্ধ্যাতে বামনাসা বহিলে ইহার ফল দুঃখদায়ক হইবেক। প্রাতঃকালে ইড়া নাড়ী ও সায়ংকালে পিঙ্গলা উদয় না হইলে মধ্যাহ্নকালের পর হইতে ইড়া ও মধ্য রজনীর পর হইতে পিঙ্গলা নাড়ী উদিত করিবে।

সোম, বুধ, বৃহস্পতি ও শুক্রবারে ইড়া নাড়ী অর্থাৎ বাম নাসায় স্বর বহন কালে যে কোন শুভ কর্ম্ম করা যায়, তাহাতে শুভ ফল লাভ হইয়া থাকে। বিশেষতঃ শুক্লপক্ষেই ইহা অধিক তর সিদ্ধিদায়িণী হয়। যথা—

"সোম শুক্রে বুধে বাম হেলায় লঙ্কা জিনে রাম।"

রবি, মঙ্গল ও শনিবারে পিঙ্গলা নাড়ী অর্থাৎ দক্ষিণ নাসায় স্বর বহন কালে যে সকল কার্য্য করা যায়, সমস্তই সুসিদ্ধ হইয়া থাকে, বিশেষতঃ কৃষ্ণপক্ষে উহা অতিশয় সুপ্রশস্ত হয়।

বাম নাসাপুটে স্বর বহন কালে পূর্ব্ব ও উত্তরে গমন করিবে

না এবং দক্ষিণ নাসাপুটে শ্বাস প্রবাহিত সময়ে দক্ষিণ ও পশ্চিমে যাত্রা করিবে না। যাত্রা কালে দক্ষিণ নাসায় বায়ু বহন হইলে দক্ষিণ চরণ অগ্রে বাড়াইয়া অথবা বাম নাসায় শ্বাস বহন হইলে বামপদ অগ্রে বাড়াইয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইবে।

সম্পদ কার্য্যাদির নিমিত্ত যাত্রা করিতে হইলে বাম নাসা-পুটে যখন স্বর বহিতে থাকিবে তখন গমন করিবে এবং ক্রূর কর্ম্মাদির জন্য যাত্রা করিতে হইলে দক্ষিণ নাসাপুটে শ্বাস বহন কালে যাইবে, তাহাতে কার্য্য সিদ্ধি হইবে। শনি ও শুক্রবারে সাতবার, রবি, সোম, মঙ্গল ও বুধবারে একাদশ বার এবং বৃহস্পতিবারে অর্দ্ধবার মৃত্তিকাতে পদক্ষেপ করিয়া বহির্গত হইলে শুভ ফল লাভ হইয়া থাকে।

যে দিকের নাসা বায়ু বহিতে থাকিবে, সেই দিকের করতল মুখে স্পর্শ করিয়া নিদ্রোত্থিত ব্যক্তি প্রাতঃকালে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিবে, তাহা হইলে তাহার ইষ্ট সিদ্ধি হইবে।

বিপদ বা হানির কারণ উপস্থিত হইলে, শত্রুর সহিত বিবাদের জন্য যাইতে হইলে, শীঘ্র গমনের প্রয়োজন হইলে, যে নাসায় শ্বাস বহিবে, সেই অঙ্গে হস্ত স্পর্শ করিয়া যাত্রাকালে ইড়া নাড়ী বহন সময় চারিবার ও পিঙ্গলা নাড়ী বহন কালে পঞ্চবার মৃত্তিকায় পাদনিক্ষেপ করিয়া যাত্রা করিবে। তাহা হইলে সকল প্রকার বিপদ বিহীন হইয়া স্বচ্ছন্দে গৃহে প্রত্যাগত হইবে।

বাম নাসা বহন কালে সর্পাদি বিষনাশ, দক্ষিণ নাসা বহন সময়ে বালিকা বশ ও উভয় নাসা অর্থাৎ সুষুম্না প্রবাহিতাবস্থায় যোগাদি মুক্তি লাভের কার্য্য করিবে। একই বায়ু ত্রিবিধ পথে থাকিয়া তিন প্রকার ফল দান করিয়া থাকে।

ইড়া নাড়ীতে অগ্নি, বায়ু ও আকাশ তত্ত্বের উদয় কালে শুভ কর্ম্ম করিবে না।

ঈশ্বর হইতে আকাশ, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে তেজ তেজ হইতে জল ও জল হইতে পৃথিবী সমুদ্ভুতা হয়। ইহাদের নাম পঞ্চতত্ব। এই পঞ্চতত্ত্ব হইতেই ব্রহ্মাণ্ড উৎপন্ন হইয়াছে।

এই পাঁচতত্ত্ব সমস্ত দিবারাত্রে ষষ্টিদণ্ড মধ্যে প্রতি আড়াই দণ্ডে এক এক নাসিকায় উদিত হয়। পৃথীতত্ত্ব ২০ মিনিট জলতত্ত্ব ১৬ মিনিট, অগ্নিতত্ত্ব ১২ মিনিট, বায়ুতত্ত্ব ৮ মিনিট ও আকাশ তত্ব ৪ মিনিট অবস্থিতি করে।

দুই হস্তের দুই বৃদ্ধাঙ্গুলি দ্বারা দুই কর্ণদেশ, দুই মধ্যমাঙ্গুল দ্বারা দুই নাসাপুট, দুই অনামিকা ও দুই কনিষ্ঠাঙ্গুল দ্বারা মুখ এবং দুই তর্জ্জনী দ্বারা চক্ষু বদ্ধ করিয়া পীতবর্ণ দৃষ্ট হইলে পৃথিবী তত্ত্ব, শ্বেতবর্ণ দৃষ্ট হইলে জল তত্ত্ব, রক্তবর্ণ দৃষ্ট হইলে অগ্নিতত্ত্ব, শ্যামবর্ণ দৃষ্ট হইলে বায়ু তত্ত্ব এবং বিন্দু বিন্দু বিবিধবর্ণ দৃষ্ট হইলে আকাশ তত্ত্বের উদয় জানিবে।

মুখ মধ্যে এক গণ্ডুষ জল গ্রহণ করিয়া ফুৎকারের সহিত উর্দ্ধে নিক্ষেপ করিবে। সেই জল ধরণীতে পতিত সময়ে যে বর্ণটী বিশেষরূপে লক্ষিত হইবে, তদনুসারে তত্ত্ব নির্ণয় করিবে।

দর্পণের উপর শ্বাস ত্যাগ করিলে তাহাতে যে বাষ্প নিপতিত হয়, তাহা চতুষ্কোণাকার হইয়া বিলীন হইলে পৃথী, অর্দ্ধচন্দ্রবৎ হইলে জল, ত্রিকোণ হইলে অগ্নি, গোল হইলে বায়ু এবং বিন্দু বিন্দু হইলে আকাশ তত্ত্বের উদয় বুঝিতে হইবে।

শ্বাস নিক্ষেপ কালে অঙ্গুলি দ্বারা পরিমাণ করিলে যদি অষ্ট অঙ্গুলি পর্য্যন্ত দীর্ঘ হয়, তবে বায়ুতত্ত্ব, চারি অঙ্গুলি পরিমিত

হইলে অগ্নিতত্ত্ব, দ্বাদশ অঙ্গুলি পরিমিত হইলে পৃথিবীতত্ত্ব ও ষোড়শাঙ্গুল পরিমাণ শ্বাস বহমান হইলে জলতত্ত্বের উদয় হইয়া থাকে।

পৃথিবী তত্ত্বের উদয়ে মিষ্ট, জল তত্ত্বে মিষ্ট ও কষায়, অগ্নি তত্ত্বে তিক্ত, বায়ু তত্ত্বে অম্ল ও আকাশ তত্ত্বে কটু স্বাদ অনুভূত হয়।

অগ্নি তত্ত্বের উদয়ে মারণ, জল তত্ত্বের উদয়ে শান্তি, বায়ু তত্ত্বের উদয়ে উচাটন, পৃথিবী তত্ত্বের উদয়ে স্তম্ভন এবং আকাশ তত্ত্বের উদয়ে মোক্ষ কার্য্য করিবে।

পৃথিবী ও জল তত্ত্বোদয়ে কোন কার্য্য করিলে সিদ্ধি হইবে। অগ্নিতত্ত্বে মৃত্যু, বায়ুতত্ত্বে ক্ষয় ও আকাশ তত্ত্বে কার্য্য হানি হয়

আমরা আহার বিহার দান ধ্যানাদি যে কোন কার্য্যই করি, সকলই ঈশ্বরোদ্দেশে ঈশ্বরের প্রীত্যর্থে ঈশ্বরের জন্যই করিয়া থাকি, ঈশ্বর ছাড়া কোন কাজ নাই। ঈশ্বরকে ত্যাগ করিয়া কর্ম্ম করিতে গেলেই পাপে পতিত হইতে হয়। এইরূপে পাপ করিতে করিতে আমরা ঈশ্বরকে ভুলিয়া যাই। ঈশ্বর বিচ্যুত হইয়া হত ভাগ্য অনাথের ন্যায় বহুদূরে গিয়া পড়িয়া থাকি। সূর্য্য হইতে দূরে পড়িলে আমরা যেমন দারুণ হিমানিতে দুঃখ পাই, তেমনি ঈশ্বর হইতে দূরে অবস্থান করিলে পাপ তাপে তাপিত হই। অতএব আইস আমরা প্রকৃত সুখী হইবার কারণ ঈশ্বরেরই শরণাপন্ন হই। এবং তাঁহার প্রতি নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত ও নিরুদ্বিগ্ন হই। শিশুর ন্যায় সরল ও অকৃত্রিম নির্ভরের ভাব সর্ব্বদা অভ্যাস রাখা উচিত।

যিনি নশ্বর নরগণের দর্শন ক্রিয়া সম্পাদনের জন্য চর্ম্মচক্ষু সৃজন করিয়াছেন, তাঁহার জ্যোতিষ্মান্ চক্ষু কোথায় না জাজ্জ্বল্য

মান রহিয়াছে। অতল স্পর্শ জলধি গর্ভে তাঁহার চক্ষু আছে, এবং আমাদের ঘোর অন্ধকারাবৃত কুটিল হৃদয়াভ্যন্তরেও তাঁহার উজ্জ্বল নেত্র নিহিত রহিয়াছে। অতএব আমরা যাহা করি কি ভাবি তাহা ঈশ্বর দেখিতে ও জানিতে পারেন, ইহা স্মরণ করাইয়া বালক বালিকাগণকে কিছু নীতি শিক্ষা প্রদান করিতে হইবে।

মনুষ্যজীবন ক্ষণস্থায়ী; এই আছে এই নাই। পদ্মপত্রস্থিত জলবিন্দুর মত টল মল করিতেছে। মর্ত্ত্যলোকের মুহূর্ত্ত মাত্র স্থায়ী জীবনের সঙ্গে অনন্ত কালের তুলনা করিতে গেলে জীব কোন্ ছার পদার্থ, চতুর্মুখ, দশমুখ, শতমুখ ও সহস্রানন শত সহস্র ব্রহ্মারও মস্তক ঘুরিয়া পড়ে। ছোট বড় ভেদে কোটী কোটী ব্রহ্মাণ্ডে যে কোটী কোটী ব্রহ্মা অর্থাৎ সৃষ্টিকর্ত্তা আছেন পুরাণে ইহার বর্ণনা আছে। কেহ কেহ এ কথাকে কাল্পনিক বলিয়া মনে করিতে পারেন, কিন্তু ঈশ্বর যখন কল্পনাতীত তখন আর কল্পনার কথা কোথায় লাগে?

যাহা হউক, এখন গুটীকত নীতিকথা বলি। নীতি সম্বন্ধে প্রস্তাব লিখিতে গেলে, মহাভারত তুল্য একখানি বৃহৎ গ্রন্থ হইতে পারে, কিন্তু আমি দুটী কথায় তাহা সমাপ্ত করিতেছি। যথা—

"অজরামরবৎ প্রাজ্ঞ বিদ্যামর্থঞ্চচিন্তয়েৎ।
গৃহীতেব কেশেষু মৃত্যুণা ধর্ম্মমাচরেৎ॥"
"মাতৃবৎ পরদারেষু পরদ্রব্যেষু লোষ্ট্রবৎ।
আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যতি স পণ্ডিতঃ।"

এই দুটী শ্লোক শিখিলে সকল নীতিই শিখিতে পারিবে; আজীবন অধ্যয়ন ও ভূরি ভূরি গ্রন্থ পাঠ করিলে যে ফল না

হইবে, উক্ত শ্লোক শিখিলে ততোধিক ফল লাভ হইবে। কেবল শ্লোক কণ্ঠস্থ করিলে হইবে না, শিক্ষিত জ্ঞানানুসারে আচরণ করা চাই। যাহারা এরূপ আচরণ করিতে না পারে, তাহাদের জীবন ধারণ বিড়ম্বনা মাত্র।

দেশের লোকের হিতার্থে গ্রন্থকার নানাপ্রকার উপদেশ প্রদান করিয়া থাকেন। শিক্ষক মহাশয়েরা বহু সৎশিক্ষা দান করেন। সম্বাদ পত্র সম্পাদকেরা ছন্দেবন্ধে বিবিধ প্রবন্ধ প্রকটিত করেন। বাগ্মীগণ বক্তৃতা করিয়া থাকেন। কবি কবিতা লেখেন। শিক্ষিত সভ্য মহোদয়েরা সভা সমিতি করেন। অধ্যাপক ধর্ম্ম শাস্ত্র ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। কথক কথকতা করেন। গুরু মন্ত্র দান করেন। ভিখারিরা ধর্ম্ম সংগীত গান করিয়া থাকেন। আর কীর্ত্তনওয়ালা, যাত্রাওয়ালা ও থিয়েটার-ওয়ালা প্রভৃতি কীর্ত্তন, যাত্রা ও নাটক অভিনয় করেন। ছয়-কোটী বঙ্গবাসীর মধ্যে ছয়লক্ষ লোক উক্ত প্রকারে সমাজের কল্যাণ কামনায় নিযুক্ত আছেন। কিন্তু কিছুই ফল হইতেছে না। ইহারা সকলেই শিক্ষা ও উপদেশ দিতেছেন বটে, কিন্তু কেহই নিজ উপদেশ মত কর্ম্ম করেন না। সকলেই স্বার্থপর, তাঁহারা আপন আপন জীবিকা, বাহাদুরী ও যশোলাভার্থেই ঐরূপ করিয়া থাকেন। তোমরা পরকে উপদেশ দিতে সহস্র বদন ধারণ কর, পরের দোষ দর্শনে সহস্রলোচন হও, আর আপনার বেলায় উপদেশ মান না এবং নিজের দোষ সকল সংশোধন কর না কেন? তোমরা আপনারা সুপথে চল, তাহা হইলে, তোমা-দের দেখা দেখি সকলেই সৎপথ অবলম্বন করিবে সন্দেহ নাই। তাহা না করিয়া উক্তরূপে চিরকাল মাথা খুঁড়িয়া মরিলেও কিছুতেই কিছু হইবে না।

আমরা সজীবগুরু চাই। সজীব শিক্ষক, সজীব গ্রন্থকার ও সজীবসম্পাদক চাই। আর সজীব কবি ও সজীব বক্তাও চাই। সজীবগুরু বর্ত্তমান থাকিলে কি জগতে আর এত পতিত লোক থাকিত? সজীব কবি ও সজীব বক্তা দেশে থাকিলে আর এ দুর্দ্দশা ঘটিত না। তাঁহারা সমাজ সংস্কার ও পাপ দূর করিবার কারণ জগত তোলপাড় করিয়া তুলিতেন। একজন কবি লিখিয়াছেন।—

"আরব্য মিসর পারস্য তুরকী।
তাতার তিব্বত অন্য কব কি।
চীন ব্রহ্মদেশ অসভ্য জাপান।
তারাও স্বাধীন তারাও প্রধান।
দাসত্ব করিতে করে হেয় জ্ঞান।
ভারত স্বধুই ঘুমায়ে রয়!
হয়েছে শ্মশান এ ভারত ভূমি।
কারে বা উচ্চে ডাকিতেছি আমি।
গোলামের জাতি শিখেছে গোলামী।
আর কি ভারত সজীব আছে?
সজীব থাকিলে এখনি উঠিত।
বীর-পদভরে মেদিনী দুলিত।
ভারতের নিশি প্রভাত হইত।
হায়রে সে দিন ঘুচিয়ে গেছে।" ইত্যাদি।

যিনি আত্মাকে কর্ত্তা করিয়া দেহ-লেখনী দ্বারা শোণিত মসীতে মন আধারে এই প্রকারের কবিতা লিখিতে পারেন, তিনিই সজীবকবি। সেই জীবন্তকবি স্বকৃত কবিতারূপ মৃতসঞ্জীবনী মন্ত্রে অধুনাতন জীবন্মৃত নর নারী সকলের প্রকৃত

রূপে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া স্বদেশের উদ্ধার সাধন করিতে পারেন সন্দেহ নাই।

আমার প্রিয় বালক! কীটাণুকীট তুল্য এই ক্ষণভঙ্গুর অনিত্য দেহ ধারণ করতঃ তুমি মাটীর মত হইয়া থাক। সাবধান যেন কোন ক্রমে তোমার মনে অহঙ্কার প্রবেশ করিতে না পারে। পরমেশ্বর অহঙ্কারীকে বড়ই ঘৃণা করিয়া থাকেন এবং দর্পহারী ভগবান্ তৎক্ষণাৎ তাহার দর্প চূর্ণ করেন। অতি দর্পে রাবণ সবংশে ছারক্ষার হইয়াছিলেন। অহঙ্কার করিয়া বাবিলের রাজা নেবুকদনেজর সাত বৎসর পর্য্যন্ত উলঙ্গ উন্মাদ বাতুলাবস্থায় বনেবনে পশুসনে ভ্রমণ ও তৃণাদি ভক্ষণে জীবন ধারণ করিতেন। প্রভাকরের খরতর করনিকরে দগ্ধ কলেবর হইতেন, বর্ষার অবিরল জলধারা দ্বারা ভিজিতেন এবং শীতকালের নিদারুণ হিমানিতে তাঁহার নগ্ন-অঙ্গের রক্ত সকল জমাট হইলে, তিনি আড়ষ্ট ও অচৈতন্য হইয়া পড়িয়া থাকিতেন।

তোমরা পাশ্চাত্য সভ্যতা প্রথা অনুকরণ করিও না। পিতামাতার সঙ্গে বয়স্থ পুত্র কন্যার পরস্পর হস্তস্পর্শ ও মুখচুম্বন প্রথা বড়ই কুৎসিত দেখায়। শ্বশুর বা ভাশুর প্রভৃতিকে অষ্টাদশ বর্ষ বয়স্ক যুবতী পুত্রবধূ বা ভ্রাতৃবধূর মুখচুম্বন করিতে দেখিলে বিজাতীয় ঘৃণার উদ্রেক হয়। পুত্র কন্যা ভক্তিভারাবনত চিত্তে পিতা মাতার পদতলে ধূল্যবলণ্ঠিত কলেবরে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলে ও সমকক্ষ ব্যক্তির সহিত কোলাকুলি আলিঙ্গন বা করস্পর্শ করিলে সুন্দর শোভা পায়। ব্রাহ্মণ সজ্জনাদির পদরেণু শিরোভূষণ করিতে পারিলে দৈহিক ও মানসিক রোগ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া লোকে মোক্ষপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কলির ব্রাহ্মণ অনেকে দুষ্কর্ম্মান্বিত হইলেও

ব্রহ্ম অংশে ব্রাহ্মণ ঔরসে জন্ম বলিয়া তাঁহাদিগকে প্রণিপাত করা শূদ্রের কর্ত্তব্য।

ভগবান্ ভক্তিতেই বিরাজমান্। সুতরাং ভক্তিমান মানবগণই পরিত্রাণ পান। আর তাঁহারাই অবলীলাক্রমে দুস্তার ভবসাগর পার হইয়া যান। একদা দেবর্ষি নারদ সনৎমুনিকে ভক্তি ভাবে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিতে দেখিয়া কহিলেন, মুনিরাজ! তোমারে এরূপে প্রণিপাত করিতে দেখিয়া আমার বোধ হইতেছে যেন তুমি বাহু যুগল দ্বারা সন্তরণ পূর্ব্বক ভবসাগর পার হইবার উপক্রম করিতেছ।

ভগবৎ প্রসাদ ভিন্ন অন্য অন্ন পানীয় দ্রব্যাদিকে ভক্তি শাস্ত্রে বিষ্ঠা ও মূত্র বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তাহাই ভোজন পান করিয়া মানুষ সকল ক্রমশঃ শূকরাদি তুল্য পশুবৎ হইয়া আত্মার অমরত্ব ও অনন্ত উন্নতির কথা ভুলিয়া যাইতেছে। তাই ভক্তিদেবী বিমুখ হইয়া আমাদের দেশ হইতে স্থানান্তরে প্রস্থান করিতে উদ্যত হইয়াছেন। এখনকার বালকেরা গুরুজনকে ভক্তিপূর্ব্বক প্রণাম করিতে ও তাঁহাদের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে শিক্ষিত হইতেছে না। ইহা অতি অলক্ষণ!

সর্ব্বদা বিশ্বাসী ও কৃতজ্ঞ থাকা অতি উচিত। বিশ্বাসঘাতক ও অকৃতজ্ঞকে ঘোরতর নরকে বাস করিতে হয়। কাহাকে আশা বা বাগ্দান করিয়া তাহা পূর্ণ না করা মহাপাপ। তুমি সর্ব্বদা সত্যে প্রতিষ্ঠিত থাক, তাহা হইতে প্রাণান্তেও বিচলিত হইও না, কেন না ঈশ্বর সত্য স্বরূপ *। কখন কাহাকে কটু

* অশ্বমেধ সহস্রঞ্চ সত্যঞ্চ তুলয়া-ধৃতম্।
অশ্বমেধ সহস্রাত্তু সত্যমেবাতিরিচ্যতে॥

কথা কহিও না, কেন না তাহাতে তাহার অন্তঃকরণে অত্যন্ত যন্ত্রণা বোধ হয়। বুধবর্গ বলেন, বাক্যযন্ত্রণা অসির আঘাত অপেক্ষা অধিকতর কষ্টকর। অতএব, ধর্ম্ম প্রবৃত্তি ও বিবেকের বশবর্ত্তী হইয়া সকল কর্ম্ম করিবে। কোন মতে অন্যায় কার্য্যে রত হইও না। উৎকৃষ্ট বা নিকৃষ্ট সকল প্রাণীকেই আত্মতুল্য জ্ঞান করিবে ও আত্মবৎ ব্যবহার করিবে। কায়মনোবাক্যে কাহাকেও উদ্বেগ প্রদান করিও না।

জগৎগ্রন্থ আলোচনা কর, তাহাহইলে তোমার জ্ঞান দিন দিন বৃদ্ধি হইতে থাকিবে। জগতের ভাল মন্দ প্রত্যেক কার্য্যে ও মনুষ্যের সদসৎ প্রত্যেক ব্যবহারে এক একদিনে তোমার ভূরি ভূরি শিক্ষা লাভ হইতে থাকিবে। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি এতদ্দ্বারা যত জ্ঞানোপার্জ্জন করিতে পারিবেন, শত বৎসর জীবিত থাকিয়া, লক্ষ লক্ষ গ্রন্থ অধ্যয়ন করিলেও, তত জ্ঞান প্রাপ্ত হইবেন না। এ স্থলে দুই একটী দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া প্রবন্ধটী একটু পরিষ্কার করিয়া দিই।

একদা আমি নৌকাযোগে গঙ্গাপার হইতেছিলাম। একজন ভদ্রলোক সেই নৌকায় বসিয়া বঙ্গবাসী পাঠ করিতেছিলেন; তখন বঙ্গবাসী সবে নূতন বাহির হইয়াছে। আমি ঐ কাগজের নাম মাত্র শুনিয়াছিলাম; কিন্তু উহার আকার প্রকার ও লেখা কিরূপ তাহা দেখি নাই। একারণ, কেবল পাঁচ মিনিটের নিমিত্ত কাগজ খানি এক বার দেখিবার জন্য আগ্রহপূর্ব্বক ঐ ভদ্রলোকের কাছে প্রার্থনা করিলাম। তিনি বলিলেন, "আমার এখনও পড়া হয় নাই।" পাঁচ মিনিটের মধ্যে নৌকা

সাচ বরাবর তপ নেহি হ্যায় ঝুট বরাবর পাপ।
যা কে হৃদে সাচ হ্যায় তা কে হৃদৈ আপ॥

খানি পারে পৌঁছিলে, যে যার গন্তব্য পথে চলিয়া গেল। আমি উক্ত ভদ্রলোককে গুরু মানিয়া তাঁহাকে নমস্কার করিলাম। তাঁহার নিকটে আমার সুন্দর শিক্ষা লাভ হইল। তদবধি আমার নিকট হইতে কেহ কোন বস্তু দেখিতে চাহিলে আমি তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে তাহা প্রদান করিয়া থাকি। এইরূপে মানুষের কদাচারেও শিক্ষা লাভ এবং সদাচারেও জ্ঞানলাভ হইয়া থাকে। অপরে তোমার প্রতি যেরূপ সদ্ব্যবহার করিলে তুমি সন্তুষ্ট হইয়া থাক, পরের প্রতি তুমিও তদ্রূপ সদ্ব্যবহার কর।

আমি একদিন কোন উচ্চ পদস্থ বন্ধুর নিকট গমন করিয়াছিলাম। সেদিন তাঁহার কাছে আর দুইজন বড়লোক উপস্থিত ছিলেন বলিয়া বন্ধু আমাকে বিশেষ সমাদর করেন নাই। তাহাতে আমি তাঁহাকে গুরুপদে বরণ করিয়া তদবধি কোন প্রয়োজনে অতি সামান্য লোকেও মৎসকাশে সমাগত হইলে মান্যমান লোকের সাক্ষাতেও আমি তাহার সমাদর করিতে ত্রুটী করি না।

এক সময় বর্ষাকালে একব্যক্তি কোন ভদ্র লোকের (অর্থাৎ পরিষ্কৃত বস্ত্র পরিধান কারীর) হস্ত ধারণ-পূর্ব্বক পয়ঃপ্রণালী পার হইয়াছিলেন। তাহাতে ভদ্রলোকটী তাহাকে অসভ্য বলিয়া যথোচিত গালি প্রদান করেন। আমি তখনি তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করি এবং তদবধি কোন কারণে মেথরেও আমার হাত ধরিলে বা স্কন্ধে হস্তার্পণ করিলে আমি কিছুই বলি না। তোমার কেহ অপকার করিলে তুমি প্রাণান্তেও তাহার প্রত্যপকার করিও না। অপকারের প্রতিশোধে উপকার করাই সাধু ও জ্ঞানীর লক্ষণ। ক্ষমার তুল্য তপস্যা নাই।

জগতের কার্য্য দেখ ;--পিকবধূ আপন অণ্ড হইতে শাবক

উৎপন্ন করিতে জানে না। এজন্য কাকের বাসায় ডিম্ব প্রসব করিয়া কাকিনীর দ্বারা শাবক উৎপন্ন করিয়া লইয়া থাকে। আর কাচপোকা তৈলপায়িকাদি ধৃত করতঃ স্বজাতিত্বে পরিণত করে। গুটিপোকা স্বকীয় লালে বদ্ধ হইয়া মরে এবং কোন কোন গুটিপোকা বা কোষ কাটিয়া উড়িয়া পলায়। একটী বীজ বপন করিলে লক্ষগুণ ফল উৎপন্ন হয়। এই প্রকার জগতের সকল কার্য্যই আশ্চর্য্যময়। অসাধারণ বুদ্ধিমান্ ও জ্ঞানবান লোকেরা এই সকল বিষয় তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান পূর্ব্বক বিবিধ গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। তাহা পাঠ করিলে ও জগতের ভূরি ভূরি কার্য্য স্থিরচিত্তে পর্য্যালোচনা করিলে বিশেষ অভিজ্ঞতা জন্মিতে পারে। আর ঐ সকল কার্য্যে ঈশ্বরের অভিপ্রায় ও তাৎপর্য্য কি, তাহা জানিতে পারিলে আধ্যাত্মিক অনেক উপকার পাইবার সম্ভাবনা আছে।

একটী বীজ রোপণ করিলে বহুগুণ ফল পাওয়া যায়। এতদ্দ্বারা আমরা এই শিক্ষা পাই যে, আমরা ধর্ম্মবীজ বা পাপ বীজ যাহা কিছু রোপণ করি, তাহারও বহুগুণ প্রতিফল ভোগ করিতে হয়। কোন ব্যক্তি শক্তি অনুযায়ী কোন দীন দুঃখী আদির উপকার বা তাহাদিগকে যদি কিছু দান করেন, তবে তাহা ঈশ্বরকেই দেওয়া হয়; কেননা সকলেই ঈশ্বরের জীব। পরলোকে ঈশ্বর যখন তাহার শোধ দেন, তখন তাঁহার ক্ষমতা মতে অনন্তগুণ দিবেন, তাহার আর ভুল নাই। তুমি কাহারও নিকট হইতে প্রবঞ্চনা পূর্ব্বক একটী টাকা গ্রহণ করিলে তোমার শত টাকা অপব্যয় হইয়া যাইবে। এই জন্য বলি তুমি বরং ঠকিয়া আইস, কিন্তু কোন ক্রমে কাহাকেও একটী পয়সাও ঠকাইও না। যাহারা মনে করে, আমরা বড় বুদ্ধিমান্, লোকের

চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ-পূর্ব্বক কেমন ঠকাইয়া অর্থোপার্জ্জন করিতেছি. তাহারাই অজ্ঞান; তাহারা জানে না যে কি সর্ব্বনাশ রূপ প্রতিফল তাহাদের জন্য সঞ্চিত হইতেছে!

বিলাতে দুইটী ভিক্ষুক বালক, তাহারা দুই সহোদর। একদা পরামর্শ করিল "আইস, আমরা এই বিশপ সাহেবকে ঠকাইয়া কিছু টাকা গ্রহণ করি।" বড় বালকটী ছোট ভাইকে বলিল "তুই মৃতের ন্যায় নিশ্বাস বন্ধ করত নিস্পন্দ ভাবে পড়িয়া থাক্। আমার ভাই মরিয়া ঐ পড়িয়া আছে, আমাদের আর কেহই নাই বলিয়া আমি বিশপের কাছে গিয়া কাঁদিতে থাকি।" তাহাতে ছোটটী মৃতবৎ পড়িয়া রহিল। বড়টী বিশপ সাহেবের সমীপে গিয়া কৃত্রিম রোদন করিতে করিতে বলিল, "মহাশয়, আমরা দুই ভাই রাস্তায় খেলা করিতেছিলাম, হঠাৎ আমার ছোট ভাই পড়িয়া মরিয়া গেল, আমাদের আর কেহই নাই।" তাহাতে সাহেব তাহাকে দুইটী টাকা দান করিলে সে হাসিতে হাসিতে কনিষ্ঠের নিকট আসিয়া দেখে যে. সত্য সত্যই তাহার ভ্রাতার মৃত্যু হইয়াছে। তখন সে বিশেষরূপ ক্রন্দন করিতে করিতে পুনরায় বিশপ সাহেবের সমীপে উপস্থিত হইয়া নিবেদন করিল, "মহাশয়, সত্য সত্যই আমার ভাই মরিয়াছে।" তাহাতে বিশপ সবিশেষ অবগত হইয়া দুঃখিতচিত্তে কহিলেন, "সর্ব্বদর্শী পরমেশ্বর তোমাদের উচিত প্রতিফল প্রদান করিয়াছেন, আমি কি করিব বল, প্রাণদান দিতে ত আমার ক্ষমতা নাই।

গুটিপোকা নিজ লালে বদ্ধ হইয়া মরে ও কোন কোনটা বা কোষ কাটিয়া উড়িয়া পলায়। এতদ্দ্বারা আমাদের এই জ্ঞান লভ্য হয় যে, আমরা আপন পাপে বদ্ধ হইয়াই বার বার গর্ভে

বাস করি ও মরিয়া যাই। আর যদি চৈতন্যযুক্ত হইয়া বিবেক বুদ্ধি দ্বারা চালিত হওত, পুণ্য-পদ্ধবিতে পদার্পণ করি, তাহা হইলে আমরা সংসার বন্ধন ছেদন পূর্ব্বক মোক্ষপদ লাভ করিতে পারি সন্দেহ নাই।

কাচপোকা তৈলপায়িকা প্রভৃতি যে কোন পোকাকে ধৃত-পূর্ব্বক দংশন করে, সে কাচপোকা হইয়া উঠে। ইহাতে আমরা এই জানিতে পারি যে, আমরা যদি উপযুক্ত পাত্র হই, তাহা হইলে সিদ্ধ সৎগুরু আসিয়া আমাদের দীক্ষা দানাদি সংস্কার সাধন করিবেন ; আমরা গুরু ও মন্ত্র ধ্যান করিতে করিতে গুরু সদৃশ সিদ্ধ হইতে পারিব। গুরুরূপে ভগবান্ জীবের পরিত্রাণ সাধন করিয়া থাকেন। যথা, নারদরূপী ভগবানের অবতার, ধ্রুবকে যোগ্য পাত্র জানিয়া দীক্ষাদি প্রদান করিয়াছিলেন।

কাকের বাসায় পিক শাবকের উদ্ভব হইতে আমরা কি শিক্ষা পাই, তাহাও দেখা আবশ্যক। বুদ্ধি ও জ্ঞানানুসারে নানা লোকে নানা প্রকার বিবেচনা করিতে পারেন। মানুষ অসম্পূর্ণ ও ভ্রান্ত ; এ জন্য মনুষ্যকৃত সকল মত অভ্রান্ত না হইলেও আইস আমরাও একরূপ সিদ্ধান্ত করিতে প্রবৃত্ত হই। এরূপ চিন্তা দ্বারা আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ হয়, সন্দেহ নাই।

সংসারে অর্থহীন মানুষের কষ্টের সীমা পরিসীমা নাই। এতদ্দ্বারা ইহা বুঝিতে হইবে যে, পরলোকে ধর্ম্ম ভিন্ন নরক যন্ত্রণার শেষ নাই। এইরূপে নিয়ত সাংসারিক অবস্থা ও ঘটনার সহিত পরলোকের তুলনা করিতে থাকিলে জ্ঞানবান্ ও সাধু হইতে পারা যায়। জ্ঞানী ও সাধু মহাজনেরা যে পথে গমন করিয়াছেন, সেই পথ অবলম্বন করা ও তাঁহাদের উপদেশ মতে চলা সর্ব্বতোভাবে

বিধেয়। জ্ঞানী ও সাধুদিগের উপদেশ মতে যাহারা না চলে, তাহারাই দুর্ভাগ্য জীব ও পদে পদে অশিব ভোগ করিয়া থাকে।

তুমি যদি কখন একটীও মিথ্যা কথা না বল, তাহা হইলেই প্রমাণ হইবে যে, তুমি সত্য বলিতে শিখিয়াছ। হতগজ গোছ একটী সামান্য মিথ্যা কথা কহিয়া ধর্ম্মপুত্র সত্যবাদী রাজা যুধিষ্ঠিরকেও নরক দর্শন করিতে হইয়াছিল।

আমার পরিচিত এক ব্যক্তির আজি ৫।৭ বৎসর মৃত্যু হইয়াছে। তিনি যৌবনকালে অতি প্রত্যুষে এক বাগানে মলত্যাগ করিতে বসিয়াছিলেন। এমন সময় তত্রত্য এক সাধু বাবাজী সেই বাগানে একটী নারিকেল গাছের নিকটে আসিয়া তিনটী তুড়ি প্রদান করিলেন। অমনি নারিকেল বৃক্ষ মস্তক অবনত করিল। বাবাজী একটী নারিকেল ছিঁড়িয়া লইয়া প্রস্থান করিলেন। উক্ত ব্যক্তি তাহা দেখিয়াছিলেন। তিনি তদবধি ভক্তিপূতচিত্তে সেই সাধু বাবাজীর দেবালয়ে নিত্য গমনাগমন ও বাবাজীর সেবা শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। তাহাতে বাবাজী তৎপ্রতি প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে কর্দ্দম দ্বারা সন্দেশ ও রৌপ্য মুদ্রা প্রস্তুত করিতে শিক্ষা প্রদান করিলেন। আর বলিয়া দিলেন, "তুমি প্রয়োজনাতিরিক্ত সন্দেশ ও টাকা প্রস্তুত করিও না।" ঐ ব্যক্তি এই বিদ্যা প্রাপ্ত হইয়া সুখ স্বচ্ছন্দে দিনপাত করিতে লাগিলেন। বাবাজীর সেবা শুশ্রূষা ভিন্ন তাঁহার অন্য কোন কাজকর্ম্ম ছিল না। ক্রমশঃ প্রচার হইয়া পড়িল, "সাধু বাবাজীর কৃপায় মথুর কাদা দিয়া সন্দেশ ও টাকা প্রস্তুত করিতে শিখিয়াছে।" একদা মথুরের সজাতীয় অন্তরঙ্গ কোন বিদেশীয় বন্ধু মথুরের নিকট আসিয়া কাঁদিয়া

পড়িল এবং কহিল আমি কন্যা-ভারগ্রস্ত, আমাকে এ দায় হইতে উদ্ধার করিতে হইবে। যেরূপে পার এই মাসের মধ্যেই অমুক অমুক লগ্নে তোমাকে আমার কন্যার বিবাহ নির্ব্বাহ করিয়া দিতেই হইবে। তাহাতে মথুর বলিল, "ভাল, তুমি আজি আমাদের বাটীতে থাক, কল্য প্রাতেই আমি তোমাকে তিনশত টাকা দিয়া বিদায় করিব। তুমি সেই টাকা দ্বারা কন্যার জন্য অলঙ্কার, দান সামগ্রী ও বিবাহের অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সমুদায় আয়োজন করিয়া রাখিও; আমি বিবাহের নির্দ্ধারিত দিবসে দুই মণ সন্দেশ সমভিব্যাহারে করিয়া তোমার বাটীতে নিশ্চিত উপস্থিত হইব। মথুরের কথামত কার্য্য সমস্ত সম্পাদিত ও বিবাহও নির্ব্বাহিত হইয়া গেল। বিবাহের দিন ও রাত্রি ২৪ ঘণ্টা কাল মথুর উক্ত বাবাজীর নিকটে উপস্থিত হইতে পারেন নাই। বাবাজী সন্ধ্যার পর, মথুরকে দেখিতে তাঁহার বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং তাঁহার ভার্য্যাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মথুর কোথায়? তাহাতে মথুর-পত্নী উত্তর দিলেন, "তিনি বিবাহে নিমন্ত্রিত হইয়া কুটুম্ব-বাড়ীতে গমন করিয়াছেন। এ কথা শুনিয়া বাবাজী আপন আশ্রমে প্রত্যাগমন করিলেন। পর দিন প্রাতঃকালেই মথুর কুটুম্ববাড়ী হইতে বিদায় লইয়া অমনি সাধু বাবার সমীপে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সাধু তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কল্য কোথায় গিয়াছিলে?" মথুর বলিল, কল্য কিছু অসুখ হইয়াছিল, তজ্জন্য আপনার নিকট আসিতে পারি নাই, বাটীতেই ছিলাম। এই বচন শ্রবণ মাত্র বাবাজী বসনে আপন বদনাচ্ছাদন পুরঃসর বলিলেন, "তুই মিথ্যাবাদী চণ্ডাল, তোর মুখ আর অবলোকন করিব না, তুই আমার আবাস হইতে শীঘ্র

দূর হ, আর কখন এখানে আসিস না” মথুর অনেক রোদন পূর্ব্বক আত্ম অপরাধ স্বীকার করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন ; সাধু আর কিছুতেই প্রসন্ন হইলেন না। অবশেষে বলিয়া দিলেন, “আমি তোমাকে যে বিদ্যা দান করিয়াছি, তদনুসারে তুমি কর্দ্দম দিয়া সন্দেশ ও রৌপ্য মুদ্রা প্রস্তুত করিতে পারিবে বটে ; কিন্তু তাহা হস্তান্তরে পতিত হইলে পুনরায় কাদা হইয়া যাইবে।” অতএব দেখ, মিথ্যা কথা কতদূর ঘৃণিত ও পাপের কাজ। মিথ্যাকথা দ্বারা আশু রাজ্যলাভ হইলেও শেষে ভয়ঙ্কর সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয়।

বিবাহিত পত্নী ব্যতীত স্ত্রীলোক মাত্রকেই মাতা এবং আদ্যাশক্তি মহামায়ার একটী পরমাণুবৎ অংশ বিশেষ পবিত্র বস্তু বলিয়া ভক্তি করিতে বাল্যকাল হইতেই অভ্যাস করা নিতান্ত আবশ্যক। তাহা হইলে ইহকাল ও পরকালে পরম মঙ্গল লাভ হইবে সন্দেহ নাই। সকল স্ত্রীকে মাতৃবৎ জ্ঞান করিতে না পারিলে হৃদয় কামকলুষিত ও পাপময় হয়। এজন্য বাল্যকাল হইতেই সদভ্যাস করিতে আমরা ভূয়ো ভূয়ঃ বলিয়া আসিতেছি। যদি বাল্যকালে একান্তই না পার, তবে কৈশোরকাল হইতেই ধর্ম্মভাব অভ্যাস করা নিত্যন্তই আবশ্যক। এবং তাহা না করিলেই নয় ; কেননা, অভ্যাস দোষে অধর্ম্মভাবে পরিপূর্ণ থাকিলে, মরণকালে ভয়ানক যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। আর যাঁহারা আজীবন ধর্ম্মভাবে পূর্ণ থাকেন, তাঁহারা বিনা রোগ যন্ত্রণায় ইচ্ছামত জীর্ণদেহ ত্যাগ করিয়া সুখে নিত্যধামে গমন করেন।

সঙ্গ—সৎসঙ্গ স্পর্শমণি স্বরূপ। সৎ বা সাধু মহাজন যেমন নিজে স্পর্শ-রত্ন, তেমনি তিনি যাঁহাকে স্পর্শ করেন, সেও

রত্ন বিশেষ হইয়া উঠে। সর্ব্বশাস্ত্রেই সৎসঙ্গ মাহাত্ম্য বিশেষ-রূপে কীর্ত্তিত হইয়াছে। সতের হৃদয় পবিত্রজ্যোতিতে বিভাসিত হইতে থাকে; সুতরাং সতের হৃদয় স্বচ্ছময়। অতএব যে ব্যক্তি সৎসঙ্গ করে, তাহারও অন্তরে ঐ সজ্জ্যোতি প্রতিফলিত হয় এবং তাহার মলিনত্ব ঘুচিয়া পবিত্রতা জন্মে। ঈশ্বর সৎ-স্বরূপ। যাঁহারা ঈশ্বরাশ্রিত তাঁহাদিগকেই সৎ বলা যায়। তাঁহারা সৎ ভিন্ন অসদ্বিষয়ে একেবারে আসক্তি হীন হইয়া থাকেন। চর্ম্মনির্ম্মিত চক্ষু স্বচ্ছ পদার্থ। নির্ম্মলজল স্বচ্ছ। কাচ ও দর্পণ স্বচ্ছ। এরূপ মসৃণ ও সুপরিষ্কৃত কোন কোন বস্তু স্বচ্ছ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। চক্ষু প্রভৃতি স্বচ্ছ পদার্থ মাত্রেই যেমন সমস্ত বস্তুর প্রতিবিম্ব পড়ে, সতের স্বচ্ছ হৃদয়ে তদ্রূপ ব্রহ্মাণ্ডও প্রতিফলিত হইয়া থাকে। এ জন্যই যথার্থ সাধুব্যক্তি সর্ব্বদর্শী ও সর্ব্বজ্ঞ হয়েন। আমরা যেমন দর্পণে আপন আপন প্রতিচ্ছায়া দেখিতে পাই, সল্লোকে তেমনি হৃদয় দর্পণে সর্ব্বক্ষণ ভগবানের প্রতিকৃতি নিরীক্ষণ পূর্ব্বক প্রেমাশ্রুপাত করিতে থাকেন।

ভগবান্ মনুষ্য হৃদয় স্বচ্ছ করিয়া নির্ম্মাণ করিয়াছেন। দেবভাববিশিষ্ট মনুষ্যের স্বচ্ছ হৃদয়ে তিনি নিয়তই বিরাজমান রহিয়াছেন। আর মনুষ্যভাব বিশিষ্ট মনুষ্যের অন্তঃ-করণ তত নির্ম্মল না থাকাতে, তাঁহারা ঈশ্বরকে সর্ব্বক্ষণ প্রত্যক্ষ করেন না বটে, কিন্তু সময়ে সময়ে তাঁহাকে ছদ্মবেশে বা স্বপ্নাদি নানা উপায়ে দর্শন করিয়া থাকেন। নির্ম্মল অন্তঃকরণ ঈশ্বরের অতি প্রিয়বস্তু। জয়দেব গোস্বামী গীত-গোবিন্দে লেখেন,—

"মুনিজন মানসহংস, জয় জয় দেব হরে।"

অর্থাৎ ভক্তের মানস সরোবররূপ নির্ম্মল সলিলে ভগবান্ প্রীতি প্রফুল্ল চিত্তে হংসরূপে সন্তরণ করিতে থাকেন।

যাহা হউক পশুভাব বিশিষ্ট মানুষের মন মিথ্যাকথা, কপটতা, বিশ্বাসঘাতকতা, হিংসা, ব্যভিচার, কাম, ক্রোধ, লোভ ও মদাদি নানা পাপে একেবারে মলিন হওয়ায় ঈশ্বরের ত্যজ্য হইয়াছে। এজন্য পাপী মনুষ্যেরা আপন আপন দুষ্কার্য্যের জন্য যমরাজার বিচারাধীনে আসিয়া থাকে।

সাধকশ্রেষ্ঠ রামপ্রসাদ সেন তাঁহার ভজন সঙ্গীতে বলেন—

"মন তোরে কৃষিকাজ এসে না।
এমন মানব জমীন রৈল পতিত,
আবাদ ক'ল্লে ফ'লতো সোণা॥
গুরু দত্ত বীজ রোপণ ক'রে—
ভক্তিবারি সেচে দেনা॥"

ইত্যাদি।

বুদ্ধিমান্ মনুষ্য আপন কাজ ভুলে না। কৃষক কখনও বর্ষাকাল বিফলে যাইতে দেয় না। রামপ্রসাদ কৃষক স্বরূপ হইয়া আপন মানব জমী চাষ আবাদ করিয়া সোণা ফলাইয়া গিয়াছিলেন। পাঠক! আইস দেখি, আমরা একবার আপন আপন মানবদেহরূপ জমী চাষ আবাদ করিতে চেষ্টা পাই। মরণান্তে যে দেশে যাইতে হইবে, সে দেশের তত্ত্ববেত্তা সদ্গুরুর কাছে সন্ধান জানিতে যাই।

ফলতঃ ঐরূপ সদ্গুরু ও সৎ সঙ্গ না পাইলে প্রকৃত শিক্ষালাভই হয় না। জ্ঞানীরা বলেন, বাল্যকালে ও যৌবনকালে সমবয়স্ক লোকের সহিত বেড়াইতে নাই। তখন প্রাচীন, জ্ঞানী ও সাধুদের পবিত্র সঙ্গ লাভ করা ও তাঁহাদের সদুপদেশ

শ্রবণ করা এবং তদনুসারে চলা নিতান্ত আবশ্যক। যে বালক বা যুবক এই অমূল্য উপদেশ অবহেলা করে, কুসঙ্গ দোষে ভবসাগরের ভয়ঙ্কর তরঙ্গমালায় পড়িয়া তাহারে ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়িয়া কাঁদিতে হইবেই হইবে।

ভগবানের প্রসাদ ভিন্ন কাহারও উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ করা কখনই উচিত নহে। উচ্ছিষ্ট ভোজন করিলে শুভাদৃষ্ট ক্ষয় এবং দুরদৃষ্ট ভাগী হইতে হয়। বিশেষতঃ যাহার উচ্ছিষ্ট আহার করা যায়, তাহার কোন কোন রোগ আসিয়া উচ্ছিষ্ট ভোজীকে আক্রমণ করিয়া থাকে। যাহারা তামাকু সেবন করে, তাহারাও পরস্পরের উচ্ছিষ্ট ভোজন করতঃ অনেক রোগে আক্রান্ত হয়। যেমন হুঁকার নলিচায় তামাকের কাট পড়ে, তাম্রকূটের ধূম্রপায়িদের কণ্ঠ নালিতেও তদ্রূপ কাট পড়িয়া থাকে। তামাক একপ্রকার বিষ। হিন্দুকুলমহিলাদের মধ্যে অনেকে পানের সঙ্গে এই বিষ পান করিয়া থাকেন। তাঁহাদের এ অভ্যাস আশু পরিত্যাগ করা উচিত। অধ্যাপক ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরাও নস্য গ্রহণচ্ছলে এই বিষের আঘ্রাণ লইয়া শুধু অনুনাসিক শব্দের উচ্চারণে বঞ্চিত হইতেছেন, তাহা নহে। পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গাদেবীর পবিত্র নাম গগ্‌গা বলিয়া উচ্চারণ করিয়া বোধ হয় পরকালের পথটা কিছু অপরিষ্কার করিতেছেন। তামাকু, হুকা কলিকা বাহনে থাকিয়া পরস্পরকে উচ্ছিষ্ট ভোজন করাইয়া একাকার করিতে বসিয়াছে।

প্রসাদভিন্ন অন্য কোন অন্নাদি ভক্ষণ করিতে হইলে জ্ঞাতি কুটুম্ব দূরে থাক, ব্রাহ্মণের অন্নও ভোজন করিবে না। স্বহস্তে রন্ধন পূর্ব্বক আহার করাই ভাল, নতুবা মাতা বা পতিব্রতা বনিতার হস্তের অন্ন খাও। তদ্ভিন্ন অন্য কাহারও

হন্তের অন্ন খাইলে, সেই সঙ্গে সঙ্গে তাহার পাপ সকলও ভক্ষণ করিতে হয়।

একদা কোন বেশ্যার কুকর্ম্মার্জ্জিত ধনে এক ঠাঁকুরের ভোগ দেওয়া হয়; তাহাতে প্রসাদ পাইয়া অতি জীতেন্দ্রিয় সাধুদেরও কামোদ্রেক হইয়াছিল। ১২ বৎসর পর্য্যন্ত নীচসেবা করিলে নীচজাতিত্ব প্রাপ্ত হইতে হয়। রূপ সনাতন গোস্বামী তাহার প্রমাণ স্থান এবং এ বিষয়ে শাস্ত্রীয় বচনও অনেক পাওয়া যায়।

মানবজমী চাষাবাদ করিতে গেলে প্রথম জ্ঞানঅস্ত্রে পাপ জঙ্গল সকল কাটিয়া ফেলিতে হইবে। তার পর সাধনরূপ লাঙ্গল দিয়া, বিবেকহস্তে ইন্দ্রিয় ও রিপুরূপ শিকড় ও কাঁকরাদি ফেলিয়া দিয়া জমী পরিষ্কার করিতে হইবে। তদনন্তর গুরুমন্ত্র জপরূপ বীজ রোপণ করিয়া ভক্তিবারি সিঞ্চন করিলে ঈশ্বর প্রাপ্তিরূপ স্বুবর্ণ উৎপন্ন হইবেই হইবে। দুর্ল্লভ মানবজমী প্রাপ্ত হইয়া যে মূঢ় তাহাতে সোণা ফলাইতে না পারিল, বা চেষ্টা না করিল, তাহার জন্মই বৃথা। সে হতভাগ্য মৃতের সহোদর। যত দিন পর্য্যন্ত ঈশ্বর প্রাপ্তি না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত—অনন্তকাল পর্য্যন্ত তাহাকে নানা ইতরযোনিস্থিত পূঁয রক্ত মল মূত্র পরিপূরিত ঘোর নরকরূপ অন্ধকারময় যন্ত্রণাদায়ী অতি সংকীর্ণ ও দুর্গন্ধযুক্ত গর্ভকারাগারে বার বার কোটী কোটীবার বন্দী থাকিতে হয়। গর্ভ হইতে পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হইয়াও তাহার নিস্তার নাই। শৈশবাবস্থা হইতেই ঘা, ফোড়া, জ্বরজ্বালাদি নানারোগ তাহার সঙ্গে সঙ্গে লাগিয়াই থাকে। তারপর যৌবনদশা প্রাপ্ত হইলে সংসার ভার তাহার শিরে এত চাপিয়া ধরে যে, তাহাতে সে চোকে কাণে দেখিতে পায় না, একেবারে ত্রিভুবন অন্ধকারময় দেখে,

তাহাতে কেহ বা ঋণগ্রস্ত হইয়া যাবজ্জীবন অপমান ও লাঞ্ছনা ভোগ করিতে থাকে। অনেক হতভাগ্য পেটের জ্বালায় পরের গলায় ছুরি দিয়া বা চুরি করিয়া কারাদণ্ড বা প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হয়। অনেকে খাইতে না পাইয়া বা পরিবার প্রতিপালনে অক্ষম হইয়া উদ্বন্ধনে প্রাণ-ত্যাগ করে। দরিদ্র ভিখারি কাঙ্গালিদের বিশেষতঃ কুষ্ঠাদি রোগগ্রস্ত অক্ষম দীনদুঃখিদের কষ্ট বর্ণনে লেখনী আড়ষ্ট হইয়া যায়। পাপীর অনন্ত নরক যন্ত্রণা কে বর্ণনা করিতে পারে? যাহারা বলেন,—"ঈশ্বর পরম দয়ালু। তিনি মাতা পিতা ও অকৃত্রিম বন্ধুর ন্যায় প্রকৃতিপুঞ্জের মঙ্গল কামনাই করেন। তিনি কোন্ প্রাণে পুত্রতুল্য জীবের অনন্ত নরক যন্ত্রণা অবলোকন ও তাহা অনুমোদন করিবেন?" ইহা নিতান্ত সত্য হইলেও ঈশ্বরের আজ্ঞা ও নিয়ম লঙ্ঘনরূপ পাপের ফলভোগ করিতেই হয়। কেন না ঈশ্বর ভাল মন্দ দুটী পথ সৃষ্টি করিয়াছেন। যাহারা সুপথে গমন করে, তাহারা সুখী এবং কুপথে গমন কারি লোকেরা দুঃখী হইয়া থাকে। অগ্নির দাহিকা শক্তি আছে, তাহাতে অজ্ঞান বালক পতিত হইলে যেমন দগ্ধীভূত হইবে, তেমনি জ্ঞানে হউক বা অজ্ঞানেই হউক পাপ করিলেই তাহার ফলভোগ অবশ্যই করিতে হইবে। তবে একটী কথা আছে, পীড়ার যেমন ঔষধ আছে, পাপেরও তেমনি প্রায়শ্চিত্ত রহিয়াছে। ঈশ্বরের সাধন ভজনে পাপের মোচন বা লাঘব হইয়া থাকে।

দয়া ধর্ম্ম জ্ঞান ভক্তি বিশিষ্ট মনুষ্যের তুল্য শ্রেষ্ঠ জীব পৃথিবীতে আর নাই। এজন্য মনুষ্য জন্ম অতি দুর্লভ জন্ম বলিয়া কথিত হয়। আর নরদেহ ধারণ করতঃ পুণ্য ক্রিয়াদি সাধন করিয়া লোকে মোক্ষ লাভ করে বলিয়া

এই মর্ত্ত্যভূমিকে কর্ম্মভূমিও বলা যায়। কিন্তু বাস্তবিক পৃথিবী একটী দ্বীপান্তর। কোন মনুষ্য দস্যুবৃত্তি বা হত্যাকাণ্ড করিলে পার্থিবরাজপুরুষেরা যেমন তাহাকে ৫।৭ বৎসর কারা-দণ্ড বা দ্বীপান্তর প্রেরণ আজ্ঞা করেন, তেমনি স্বর্গাদি পবিত্র ধামে কেহ কোন অপরাধ করিলে, অপরাধের তারতম্যানুসারে শরীরী জীব সকল মল মূত্র পূয রক্ত শ্লেষ্মা ও ব্যাধি পরিপূরিত দেহ কারাগারে আবদ্ধ হইয়া কেহ অধিক কেহ বা অল্পদিন দ্বীপান্তর স্বরূপ এই পৃথিবীতে বাস ও খাটাখাটী করিয়া থাকে।* কিন্তু তন্মধ্যে গুরুতর অপরাধিদিগকে গর্ভবাস হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত আজীবন কঠিন পরিশ্রম সহিত ভয়ানক যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। আর পরলোকেও যে তাহাদের যন্ত্রণার বিরাম আছে, এরূপ বোধ হয় না। কেননা অনেক রোগী মৃত্যুর সময় কেহ মহাভয়ে উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া, কেহবা হঠাৎ মূর্চ্ছিত হইয়া প্রাণত্যাগ করে, কেহ বা দাঁত কপাটী লাগিবামাত্র মরিয়া যায় এবং কেহ কেহ শৌচ প্রস্রাব করিয়াই দেহ ত্যাগ করে। আর কেহ কেহ বাকরোধ হইয়া গেঙ্গাইতে গেঙ্গাইতে প্রাণত্যাগ করিয়া থাকে। যমদূতের মহা ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি দেখিয়াই ঐ সকল রোগীরা যে আতঙ্গে উক্ত অবস্থায় মরে, তাহার আর সন্দেহ নাই। মৃত্যুান্তে যমদূত তাহাদিগকে দৃঢ়রূপে বন্ধন করিয়া যমালয়ে লইয়া গিয়া যে দণ্ড বিধান করে না, তাহা কে বলিতে

---

* পুরাণে ইহার অনেক প্রমাণ আছে। অষ্টবসু পরামর্শ পূর্ব্বক বশিষ্ঠ মুনির গাভীচুরি করিলে মুনির শাপে তাহাদিগকে মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়া এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিতে হইয়া-ছিল। ভীষ্ম স্বহস্তে গাভী চুরি করে বলিয়া তাঁহারে অনেক দিন পর্য্যন্ত এই জগৎরূপ দ্বীপান্তরে থাকিতে হয়।

পারে? কর্ম্মানুসারে পরলোকে যদি পাপের প্রতিফল ভোগ করিতে না হইত, তাহা হইলে ইহকালে আমরা কখনই জীবগণের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা অবলোকন করিতাম না। একজন কাঁধে করে একজন বা কাঁধে চড়ে।

কেহ সদাব্রত দিয়া নিত্য সহস্র লোককে অন্নদান করিতেছেন, কেহ বা ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইয়া মুষ্টিমেয় অন্নের জন্যে লালায়িত হইয়া দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতেছে। মেথরেরা সকলের বিষ্ঠা ফেলে কেন? কুষ্ঠ রোগে পীড়িত হইয়া কেহ কেহ বা পচিয়া কেন মরে? কেনই বা অনেকে আবার অন্ধ খঞ্জ, মূক ও বধির হইয়া অবনিতলে আগমন করে? ভাল. গর্ভস্থ জীবের অপরাধ কি বল? যদি পূর্ব্বজন্ম ও পুনর্জ্জন্ম না থাকে, যদি স্বকর্ম্ম ফল ভোগ করিতে না হয়, তবে জগতের মধ্যে অতি নির্জ্জন, ঘোর অন্ধকারাবৃত মাতৃগর্ভাশ্রয়ী লুক্কায়িত সজীব প্রাণি সকল পাপাচারিণীদের দ্বারা নিষ্ঠুররূপে হত হয় কেন? কাক, শকুনী, শৃগাল, কুক্কুর ও শূকরে কেনই বা অতিঘৃণিত ত্যক্কার জনক খাদ্য ভোজন করিতেছে? শূকর মাংসাশীরা শাণিত তীক্ষ্ণ অস্ত্রে কত খুঁচিয়া খুঁচিয়া দারুণ যন্ত্রণা দিয়া ও পোড়াইয়া শূকর সকল হত্যা করে, তাহা কি কেহ দেখ নাই?

একটী স্ত্রীলোক দশমাস দশ দিনে পূর্ণগর্ভবতী হইয়া প্রসব বেদনা উপস্থিতে সন্তান প্রসব করিতে পারিতেছে না। ব্যথায় অতিশয় কাতরা হইয়া পড়িয়াছে। ডাক্তার আসিয়া অস্ত্র চিকিৎসা আরম্ভ করিলেন। তিনি পেটের জীবিত ছেলেকে কেটে কেটে টুকরা টুকরা করিয়া বাহির করিলেন। এবং অস্ত্র চালাইতে চালাইতে অসাবধানে গর্ভিণীর নাড়ী কাটিয়া অত্যন্ত

রক্তপাত করাতে গর্ভিণী মহাযন্ত্রণায় সেই রক্তগঙ্গায় প্রাণ পরিত্যাগ করিলেক। ইহা একটী বাস্তব ঘটনা। আর এরূপ মূর্ত্তিমান যমদূতের সংখ্যা বড় কম নয়।

একজন নাএব শিবিকারোহণে কোন জঙ্গল মহলে যাইতে ছিলেন। বেহারারা পাল্কি রাখিয়া জল পান করিতে গেলে এক ব্যাঘ্র আসিয়া তাঁহাকে ছিঁড়িয়া খাইয়া ফেলে। এইরূপে অনেক মানুষকে কুম্ভীরে জলে ডুবাইয়া নাকানি চোকানী খাওয়াইয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া ভক্ষণ করে। কেহ কেহ উচ্চ হইতে পতিত হইলে, তাহাদের মাথার খুলি ও অস্থি সমস্ত চূর্ণ হইয়া যায় এবং ঘোরতর যাতনায় তাহাদের প্রাণ বিয়োগ হয়। আর কেহ কেহ দৈবাৎ রেল গাড়ীর ও ট্রামওয়ের শকটের তলায় পড়িয়া যে কি কঠিন যন্ত্রণা প্রাপ্ত হইয়া প্রাণ ত্যাগ করে, তাহা তাহারাই জানে। ক্ষিপ্ত শৃগাল ও কুকুর দংশনে অনেকে জলাতঙ্কে অতি ভয়ানক যাতনায় শৃগাল বা কুকুর ডাক ডাকিতে ডাকিতে মরিয়া যায়। কত উন্মাদ পাগল অকথ্য যন্ত্রণায় প্রাণত্যাগ করে।

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে সিপাহী বিদ্রোহ সময়ে কাণপুরাদি অঞ্চলে সিপাহিরা মেম সাহেব দিগের একটী পা নীচে মাড়াইয়া অপর পা-টী উচ্চ করিয়া ধরিয়া জরাসন্ধ গোচ ফাড়িয়া ফেলিয়াছিল। এরূপ অনন্ত নরক যন্ত্রণার অনন্ত দৃষ্টান্ত আর কত বর্ণনা করিব? বজ্রাঘাত, সর্পাঘাত, ওলাউঠা, অগ্নিদাহ ও জলমগ্ন এবং আত্মহত্যা প্রভৃতি যে কোনরূপেই মৃত্যু হউক না কেন, তাহাতেই অনির্ব্বচনীয় যন্ত্রণা হইয়া থাকে। দস্যু প্রভৃতি কত দুষ্টলোক বিষম যন্ত্রণা দিয়া নরহত্যা করে। এই সকল কি আকস্মিক ঘটনা? জীবের এই সমস্ত মহাযন্ত্রণার কি কোন কারণ নাই?

সৎস্বরূপ, ন্যায়বান্ দয়াময় জ্ঞানাকর পরমেশ্বরের বিশাল বিশ্ব রাজ্যে অন্যায় কার্য্যের সম্ভাবনাই নাই। তবে ইহাকে নরক যন্ত্রণার আভাসস্বরূপ পাপের প্রতিফল বৈ আর কি বলা যাইতে পারে? অনেকে হয় ত বলিবেন, "পাপী লোকে সংসারে যেমন ভয়ানক দুঃখ যন্ত্রণা ভোগ করে; তেমনি ধার্ম্মিক লোকদেরও ত অনেক দুঃখ যন্ত্রণা হয়। অনেক ধার্ম্মিকের সাংসারিক অবস্থা অতিশয় শোচনীয়, দুষ্টেরা কত ধার্ম্মিককে জীবিতাবস্থায় দগ্ধ করিয়া ফেলিয়াছে ও হিংস্র জন্তু দ্বারা ভক্ষণ করাইয়াছে।" এই বিষম সমস্যা পূরণ করা অর্থাৎ ইহা বুঝিয়া উঠা ক্ষুদ্রজীবী ক্ষুদ্রমস্তিষ্কধারী মানবের সাধ্যাতীত। অনন্ত জীবী ভগবানই সব জানেন।

তৃতীয় অধ্যায়।

নব-দম্পতী।

আইবড়—অবিবাহিতাবস্থায় বঙ্গবাসি বালক বালিকাদের কি কিশোর কিশোরিদের বিবাহের কথায় বড়ই আনন্দ বোধ হয়। বিশেষতঃ বিবাহের দিন ও বিবাহ সময় বরকন্যার যে কি পর্য্যন্ত আহ্লাদ জন্মে, তাহা বর্ণনাতীত। রাজ্য লাভ কি, বোধ হয় যেন ব্রহ্মানন্দ ভোগ হইতে থাকে। তারপর যেন প্রেমানন্দে পবিত্র দাম্পত্য প্রেমতরঙ্গে পরম সুখে সন্তরণ করে। আবার প্রণয়রূপ নানাকুসুম সুবাসিত নন্দনকাননে সুখসেব্য বাসন্তিক সমীরণে যেন প্রেমমত্তচিত্তে বিচরণ করিতে হয়। এখানে যদি অতি হেয় কামকলুষিত দুর্গন্ধ না থাকে, তবে পবিত্র দাম্পত্য প্রেম যে কি অপূর্ব্ব স্বর্গীয় পদার্থ তাহা অনায়াসে জানা যাইতে পারে।

জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ এই তিনটী জীবনের প্রধান ঘটনা। তন্মধ্যে বিবাহই সর্ব্বপ্রধান। কেন না বিবাহাবলম্বনেই জীবের জন্ম ও মরণ সংঘটন হইয়া থাকে। পূর্ব্বে বলিয়াছি আমরা যে কোন কার্য্য করি, ঈশ্বরোদ্দেশে ঈশ্বরের জন্যই করিয়া থাকি। অতএব বিবাহও ঈশ্বরের কার্য্য। কিরূপ স্ত্রী ও পুরুষে পরস্পর বিবাহিত হওয়া কর্ত্তব্য নিম্নে তাহার আদর্শ দেখুন।

পাটনার নবাব আলিবর্দ্দী খাঁ একটী অতি আশ্চর্য্য দৈব ঘটনা লিখিয়া উপহার স্বরূপ দিল্লীর পাতসাহ সমীপে প্রেরণ করেন। যথা—

"জাঁহাপনা! নিজ এই পাটনা সহরে হিন্দুদিগের মধ্যে সম্প্রতি একটী অতি আশ্চর্য্য ঐশ্বরিককীর্ত্তি প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা বাদসাহী দপ্তরে লিখিয়া রাখিবার কারণ সসন্মানে হজুরে নজর দাখিল করিতেছি।

রাম সেবক ভকত নামে এখানে একজন ধনী মহাজন বাস করিতেন। মাসাবধি হইল, তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। তাহাতে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র কিষণদয়াল অতি সমারোহ পূর্ব্বক তাঁহার শ্রাদ্ধাদি কার্য্য সম্পন্ন করিবেন বলিয়া ব্যস্তসমস্ত চিত্তে নানা প্রকার সামগ্রী সম্ভার আহরণ করিতেছেন এবং দেশ বিদেশীয় কুটুম্বগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিতেছেন। কিন্তু তাঁহাদের সজাতি মধ্যে অপূর্ব্ব দলাদলি উপস্থিত থাকাতে সেই গোলযোগ মিটাইবার কারণ আজি ৪।৫ দিন ধরিয়া ঐ রামসেবকের বাটীতে একটি পঞ্চায়তি কমিটী হইতেছে।

এই পঞ্চাইতে দেশ বিদেশীয় প্রায় আড়াই হাজার কুটুম্ব উপস্থিত থাকেন। যমুনা নাম্নী পতিব্রতা সতী সাধ্বী একটী স্ত্রীলোকের চরিত্রের প্রতি সন্দেহ করিয়া এই দলাদলির সূত্রপাত হয়।

যমুনার দোষ এই—৭।৮ মাস গত হইল, তাঁহার প্রতিবাসী ভৈরব সোণার পীড়িত হইয়া প্রাণত্যাগ করিলে, তিনি অতিশয় দুঃখে মগ্ন হওতঃ যৎপরোনাস্তি রোদন করিতে ছিলেন। আর তিন মাস হইল, তাঁহার শ্বশুর বলদেব পীড়িত হইয়া দেহত্যাগ করিলে, তিনি অতিশয় হৃষ্টচিত্তে হাস্য করেন।

ভৈরব সোণার মরিলে যখন যমুনা ক্রন্দন করেন, তখনি স্ত্রীলোক পরম্পরা কাণাকাণি করিয়া যমুনার চরিত্রের প্রতি গুপ্তভাবে কিঞ্চিৎ দোষারোপ করে। পরে যমুনার শ্বশুরের

মৃত্যুতে তাঁহার হাস্যাবলোকনে অনেকেই প্রকাশ্য রূপে তাঁহার চরিত্র দোষ ঘোষণা করিতে থাকে।

এক্ষণে রামসেবকের শ্রাদ্ধ উপস্থিত। এই শ্রাদ্ধে যমুনা ও তৎস্বামী প্রভৃতির নিমন্ত্রণ রহিত করিতে অনেকে কিষণ দয়ালকে অনুরোধ করিতেছে। এবং অনেকে যমুনা অতি সচ্চরিত্র সতী সাধ্বী বলিয়া কখন তাঁহাদিগের নিমন্ত্রণ বারণ হইতে পারে না বলিয়া আস্ফালন করিতেছে।

পঞ্চাইত যমুনাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি ভৈরব সোণারের মৃত্যুতে দুঃখিত এবং তোমার শ্বশুরের মৃত্যুতে আহ্লাদিত হইয়াছিলে, ইহার কারণ কি? যমুনা পঞ্চাইতকে প্রণাম করিয়া করযোড়ে কহিতে লাগিল, "মহারাজগণ! তাহার যে বিশেষ বিবরণ আছে, তাহা প্রকাশ করিলে এ দাসীর মৃত্যু হইবে। এ কারণ আপনারা দাসীকে ক্ষমা করুন।" এ কথা শুনিয়া কেহ কেহ রোষকষায়িত লোচনে কহিল, হাঁ বুঝা গিয়াছে, নষ্ট স্ত্রীলোকদের গেঁটে গেঁটে বুদ্ধি। সে সব কথা তোমাকে এখনি বলিতে হইবে। তাহাতে যমুনা দুঃখিত ও বিনীতভাবে কহিল, তবে আপনারা গঙ্গাতীরে আসুন। আমি জলে দণ্ডায়মান হইয়া সবিশেষ বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত বর্ণন করিব। এই বলিয়া স্বামী প্রভৃতি গুরুজনগণের অনুমতি ও চরণধুলি গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করতঃ মনে মনে নারায়ণ ও স্বামীর চরণ ধ্যান করিয়া কহিতে লাগিলেন ——

একদা আমার পরম পূজনীয় পিতা ঠাকুর মহাশয় কোন পৌরাণিক পণ্ডিতকে আপন বাটীতে আনয়ন পূর্ব্বক বিধিমতে নিয়মানুসারে তাঁহার প্রমুখাৎ ভাগবতাদি পুরাণ শ্রবণে প্রবৃত্ত

হয়েন। সেই সময়ে আমার বয়স নয় দশ বর্ষ মাত্র ছিল আমিও মনোযোগপূর্ব্বক তাহা শুনিতাম। তখন আমার বিবাহ হয় নাই।

একদা পণ্ডিত মহাশয়, পুরাণ ব্যাখ্যাকালে এই কথা বলিলেন, "বিবাহিতা হইয়া অবধি যে ধর্ম্মপত্নী পতিকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর জ্ঞানে প্রাণপণে প্রকৃত ভয় ভক্তি ও প্রীতির সহিত সরল মনে বিশ্বাস সহকারে তাঁহার সেবা শুশ্রূষা করে ও স্বামীর একটীও আজ্ঞা লঙ্ঘন না করে, সে অচিরে নারায়ণের দর্শন লাভ করে।" এই কথা শ্রবণ করতঃ আমি মনে মনে এই স্থির করিলাম যে, আমার বিবাহ হইলে পর, আমি স্বামীকে সাক্ষাৎ নারায়ণ জ্ঞান করিয়া সর্ব্বান্তঃকরণে ভক্তির সহিত সপ্রেমে তাঁহার সেবা শুশ্রূষা করিব। তাঁহার একটীও আজ্ঞা লঙ্ঘন করিব না। ফলতঃ কায়মনোবাক্যে সর্ব্বপ্রকারে তাঁহারে সুখ স্বচ্ছন্দে ও সন্তোষে রাখিবার চেষ্টা করিব।

কিছুদিন পরে আমার পরিণয় ক্রিয়া সম্পাদিত হইলে, আমি শ্বশুরালয়ে নীতা হইলাম। আমার স্বামী ও শ্বশুর সাতিশয় নির্ধন মনুষ্য ছিলেন, সুতরাং তাঁহাদের একখানি বৈ আর ঘর ছিলনা। ইহাঁরা সকলেই পৃথক্ পৃথক শয্যায় সেই এক ঘরেই শয়ন করিতেন।

একদিন নিশীথ সময়ে আমার স্বামী পিপাসিত হইয়া শয়নাবস্থায় থাকিয়া কহিলেন "কে জাগিয়া আছ, উঠিয়া আমাকে এক ঘটি জল দাও, আমি পান করিব।" তখন আমি ভিন্ন অন্য কেহ জাগ্রত ছিলেন না। আমি মনে করিলাম, আমার প্রতি পতির এই প্রথম আজ্ঞা প্রচারিত হইল। অতএব এই আজ্ঞা পালন করিতেই হইবে। যাহা হউক ঘরের মধ্যস্থিত কলস

হইতে জল ঢালিয়া ঘটি করিয়া স্বামীকে দিলে, পাছে শ্বশুর শাশুড়ী প্রভৃতি কেহ টের পান, এই লজ্জায় আমি গৃহস্থিত কলসী হইতে জল ঢালিয়া না লইয়া নিঃশব্দ পদ সঞ্চারে উঠিয়া ঘটি গ্রহণ পূর্ব্বক নিকটবর্ত্তী গঙ্গা নদীতে গমন করিলাম এবং জল তুলিয়া লইয়া যেমন প্রত্যাগমন করিব, অমনি দেখিলাম, যে এক ব্রাহ্মণ ঘাটে দণ্ডায়মান আছেন। ব্রাহ্মণ দর্শন মাত্রেই আমি সঙ্কুচিতা হইলাম।

তখন বিপ্রবর আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কে?

আমি কহিলাম আমি অমুক গ্রাম নিবাসী অমুক মহাজনের দুহিতা এবং এই গ্রামবাসী অমুকের পুত্রবধূ ও অমুকের বনিতা, আমার নাম যমুনা। তাহাতে দ্বিজরাজ পুনরায় কহিলেন, তুমি এত রাত্রে একাকিনী গঙ্গার ঘাটে আসিয়াছ কেন? তখন আমি আপন মনোগত কথা সকল সরল চিত্তে ব্রাহ্মণসন্নিধানে আদ্যোপান্ত বর্ণন ও নিবেদন করিলাম। ব্রাহ্মণ শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তবে তোমার নারায়ণ দর্শন হইয়াছে? আমি কহিলাম, আমি এখনও স্বামীর একটীও আজ্ঞা সম্পূর্ণরূপে পালন করিতে পারি নাই, আমার এত ভাগ্য হইবে যে, ইহার মধ্যেই ভগবানের চরণ দর্শন পাইব!

ব্রাহ্মণ বলিলেন, এই আমিই নারায়ণ আমাকে দর্শন কর। আমি কহিলাম কৈ? আমি ত আপনাকে নারায়ণ রূপে দেখিতেছি না, আপনার ব্রাহ্মণ রূপ দর্শন করিতেছি। ভবাদৃশ মহৎ-লোকের কি আমার সহিত পরিহাস করা উচিত? ব্রাহ্মণ বলিলেন, নারি! আমি তোমার সহিত পরিহাস করি নাই, ব্রাহ্মণই ত নারায়ণ, তাহা কি তুমি জাননা? আমি কহিলাম, সত্য ব্রাহ্মণই নারায়ণ বটে, কিন্তু পূর্ণ ব্রহ্ম নারায়ণ একজন স্বতন্ত্র

আছেন। আপনি যদি ব্রাহ্মণ বেশধারী সেই পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ, তবে চতুর্ভুজ চক্রপাণি মূর্ত্তি আমাকে দর্শন দানে কৃতার্থ করুন। তাহাতে বাঞ্ছাকল্পতরু ভক্তবৎসল হরি, তখনই নবদূর্ব্বাদলশ্যাম কলেবর শঙ্খ চক্রগদাপদ্মপরিশোভিত চতুর্ভুজ মনোহর মূর্ত্তি ধারণ করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। গোবিন্দের অঙ্গকান্তিতে সেই ঘোরা গভীরা অমানিশি শারদিন্দু সুধাধবলিত পৌর্ণমাসি রজনীকে পরিহাস করিতে লাগিল। তাঁহার অতুল রাতুল পাদপদ্ম যুগলের যোগীজন মনোহারিণী সুগন্ধিতে আমোদিত হইয়া শুক সনাতন ও নারদাদি ঋষিগণ এবং প্রহ্লাদাদি ভক্তবৃন্দ মধুমক্ষিকা রূপে ঝাঁকে ঝাঁকে অবনিতে আগমন করিয়া ঐ পদারবিন্দের ঘ্রাণ মকরন্দ পান তথা পাদ-পরাগ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণ-রেণু শিরোভূষণ করত মহানন্দে মাতিয়া গুণ গুণ স্বরে গান করিতে আরম্ভ করিল এবং স্বর্গ হইতে অজস্র পুষ্প বৃষ্টি হইল।

তখন আমি তদ্গতচিত্ত ও পবিত্র ভয় মিশ্রিত পুলকাশ্রুপাত এবং সকম্প সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত পূর্ব্বক আধ আধ গদগদ স্বরে ভক্তিভাবে গানছলে সেই ভগবানের স্তব আরম্ভ করিলাম।

জ জ জ জ জ জ জ জ জয় হরি,
সুন্দর আনন্দ রূপ নয়ন ভরি,
দরশন করিব, চরণ মধু পিব,
তনমন সঁপিব হে মুরারি।

আর বাক্য স্ফূর্ত্তি না হওয়ায় আমি নারায়ণের চরণতলে পড়িয়া রোদন করিতে লাগিলাম। তখন তিনি আমাকে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন, ভদ্রে! আমি তোমার সতীপ্রবৃত্তি ও পবিত্র চরিত্র দর্শনে পরম প্রীতি লাভ করিয়াছি। এক্ষণে তুমি আমার

নিকট যে বর প্রার্থনা করিবে, আমি তোমারে তাহাই প্রদান করিব। অতএব আপন মনোমত বর মাগিয়া লহ। আমি কৃতাঞ্জলি পুটে কহিলাম, ভগবন্! যে চরণ দর্শন করিবার কারণ ত্রিলোকাধিপতি ত্রিলোচন স্বয়ং সন্ন্যাসী হইয়া শ্মশানবাসী হইয়াছেন, যে চরণ লাভ করিবার বাসনায় শৈশবকালে ধ্রুব মহাশয় কাননবাসী হইয়া মহা তপস্বী হইয়াছেন, হে পদ্মপলাশলোচন মধুসূদন! আমি কিনা বিনা যত্নে সেই পরমারাধ্য দেব দুর্লভ চরণ সন্দর্শন করিলাম! বিনা মূল্যে আমার চিন্তামণি লাভ হইল! নৃসিংহ দেব! ইহা অপেক্ষা অধিক সৌভাগ্য আর কাহার হইতে পারে? হে বাঞ্ছাকল্পতরু পরম গুরো! ভগবন্ ত্রিবিক্রম! তথাপিও যদি আপনি আমাকে কিছু বর দিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে আমি এই বর যাজ্ঞা করি, যেন ঐ পাদপদ্মেই আমার মতি স্থির থাকে এবং যমদূত বা শিবদূত কি বিষ্ণুদূত মৃত্যুকালে মনুষ্যের আত্মাকে কি প্রকারে লইয়া যায়, আমি যেন ইহা দেখিতে পাই ও দূতদের সমস্ত কথা বার্ত্তা বুঝিতে পারি। তাহাতে ভগবান তথাস্তু বলিয়া বরদান করতঃ আমারে সাবধান করিয়া বলিলেন, "তুমি এ সকল কথা কাহাকেও বলিও না, যে দিনে ইহা কাহারও নিকট প্রকাশ করিবে, সেই দিনেই তোমার আত্মা পরলোকে প্রস্থান করিবে।" এই বলিয়া তিনি অন্তর্দ্ধান হইলেন এবং আমি জল লইয়া আসিয়া স্বামীকে পান করিতে দিয়া শয়ন করিলাম।

আমি নিত্য প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করতঃ গৃহ মার্জ্জন, বাসনাদি পরিষ্কার ও মুখ প্রক্ষালন পুরঃসর স্নানানন্তর শ্বশুর, শাশুড়ী ও স্বামী প্রভৃতি গুরুজনগণকে প্রণাম পূর্ব্বক তাঁহাদিগের পদধুলি গ্রহণ করিয়া ভক্তির সহিত স্বামীর পূজা ও

তাঁহার চরণামৃত পান করিয়া থাকি। পরে রন্ধনাদি সমাপনান্তে শ্বশুর, শাশুড়ী ও স্বামীরে ভোজন করাইয়া তাঁহাদিগের, ভুক্তাবশিষ্ট প্রসাদ মাত্র ভক্ষণ করি। স্বয়ং নারায়ণ স্বামীরূপে অবতীর্ণ হইয়া আমার মনস্কামনা পরিপূর্ণ করিতেছেন, ইহাই আমার ধ্রুব বিশ্বাস। তন্নিবন্ধন আমি স্বামী ভিন্ন অন্য কিছুই জানি না। স্বামী স্থানান্তর হইতে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেই আমি তদ্দণ্ডেই তাঁহার পদপ্রক্ষালন পূর্ব্বক নিজ কেশে মুচাইয়া দিই। তৎপরে তিনি মুখ হাত ধৌত করিলে আমি তাঁহাকে আসন প্রদান করি। তিনি আসনে উপবেশন বা শয়ন করিলে পর তাঁহার পদ সম্বাহন ও তাঁহাকে বায়ু বীজন করি। তিনি যখনই ভোজন করিতে বসেন, আমি তখনই তাঁহার ঘর্ম্ম নিবারণ ও মক্ষিকাদি দূর করিবার কারণ বাতাস দিয়া থাকি।

পতি ধ্যান, পতি জ্ঞান পতি প্রাণ মন।
পতিই পরম গতি পরশ রতন।
পরাৎপর পতি মোর পরম ঈশ্বর।
দয়াময় ভবে কেবা ধবের সোসর?
পতি জপ পতি তপ পতিই স্বরগ।
পতি সেবে পাব ফল চতুর বরগ।
পতি ধর্ম্ম পতি পুণ্য পতি পরিত্রাণ।
ভকতবৎসল কেবা স্বামির সমান!
আত্মারূপে সর্ব্বভূতে যেই ভগবান—
বিরাজিত। সেই পতি ইথে নাহি আন।
মূর্ত্তিমতি প্রীতির প্রতিমা প্রাণপতি।
সাক্ষাৎ পরম দেব পরম ভকতি।
যাঁর পাদপদ্মে সদা মুক্তি বিরাজিত।

ভবে পার করে ব'লে পতি অভিহিত।
স্বামী সেবা ছেড়ে যেবা অন্য অভিলাষ—
তীর্থযাত্রা আদি করে ব্রত উপবাস।
সকলি অসার ভবে সকলি অসার।
স্বামী সেবা সার মাত্র স্বামী সেবা সার।
স্বামী সেবানন্দ তুল্য সুখ আর নাই।
লক্ষ্মী গৌরী যে আনন্দে উল্লাস সদাই।
পার্ব্বতির প্রেমে মত্ত সদানন্দ ভোলা।
হিন্দু বালা পতি প্রেমে হও রে উতলা।
জগতের পতি হরি প্রেমডোরে যাঁর—
নিত্য বদ্ধ, কে জানিবে মহিমা তাঁহার!
রাধাকৃষ্ণ'স্মরি পতি পাদপদ্ম হেরি
বৈকুণ্ঠে যাইব বিষ্ণুদূতে আছে ঘেরি—
আমার চৌদ্দিকে ল'য়ে রতন বিমান—
মর্কত ঝালর যুক্ত আলোর নিশান—
অপরূপ রথে আহা! কত বিদ্যাধরী।
শ্রীকৃষ্ণ পীরিতে সবে বল হরি হরি।
পতিব্রতা এয়োরাণী সতী ভাগ্যবতী।
বিরাজে শরীর মাঝে যাঁর ভগবতী।
কখন বৈধব্য নাহি ঘটে তাঁর প্রাণে।
ধরিত্রী পবিত্রীকৃতা যাঁর গুণগানে।
বৈধব্য চুলায় যাক্ যদি সতীপতি—
মরে তবু; প্রাণদান করেন সে সতী।
সাবিত্রী বেহুলা দেখ তাহার প্রমাণ।
মুক্তকণ্ঠে কর সবে সতী গুণগান।

আমি সর্ব্বতোভাবে আত্মসুখ ও স্বার্থাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক কেবল পতিসেবাতেই নিযুক্ত থাকি। পতির সুখ ও সন্তোষ সাধনের জন্য জীবন দানেও ক্ষুণ্ণ নহি। স্বামী যতক্ষণ পর্য্যন্ত নিদ্রা না যান আমি ততক্ষণ তাঁহার চরণসেবা করি, ও মধ্যে মধ্যে তাঁহাকে বাতাস দিয়া থাকি। তিনি নিদ্রা গেলে পর আমি তাঁহার পদতলে শয়ন করি এবং তাঁহার নিদ্রাভঙ্গের পূর্ব্বেই প্রত্যহ অতি প্রত্যুষে গাত্রোত্থান করিয়া নিত্য কৃত্য সমাধান করি।

আমি স্বামী সেবা করণার্থে পাতিব্রত্য ধর্ম্ম কথা শ্রবণ ও তদনুসারে সাধ্যানুসারে আচরণও করিয়া থাকি। যথা—

স্বামী ক্লীব বা দুর্দ্দশাপন্ন, রুগ্ন বা বৃদ্ধ, সুখী কি দুঃখী যাহাই হউন, পতিব্রতা স্ত্রী কোন মতে তাঁহাকে অবজ্ঞা বা অনাদর করেন না।

স্বামী হৃষ্ট হইলে স্ত্রী হৃষ্টা, ও স্বামী বিষন্ন হইলে রমণীও বিষণ্ণা, স্বামীর সম্পদ বিপদ সকল অবস্থাতেই সহধর্ম্মিণী সমভাবে ভক্তি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিবেন।

সতী স্ত্রীর তীর্থস্নানে ইচ্ছা হইলে তিনি পতিপাদোদক পান করেন। কেননা এক মাত্র পতিই স্ত্রীলোকের গুরু ও ঈশ্বর।

যে রমণী পতিকে লঙ্ঘন করিয়া ব্রতোপবাস নিয়মানুষ্ঠানে প্রবৃত্তা হয়, সে স্বামীর আয়ু হরণ ও মরণান্তর নরকে গমন করিয়া থাকে।

যে রমণী ক্রোধ পরায়ণা ও পতি-বাক্যে প্রত্যুত্তর করে, সে দেহান্তে কুক্কুরী ও শৃগালিনী হইয়া থাকে।

একমনে ও একধ্যানে পতিপদ বন্দনা পূর্ব্বক ভোজন করিবে, ইহাই একমাত্র পরম নিয়ম বলিয়া কথিত হইয়াছে।

সতী স্ত্রী কখন উচ্চাসনে উপবিষ্ট, পর গৃহে গমন, লজ্জা-কর বাক্য প্রয়োগ করিবেন না।

পরনিন্দা, কলহ গুরুজন সান্নিধ্যে উচ্চৈঃস্বরে বাক্য প্রয়োগ ও হাস্য এই সকল রমণীগণ একেবারেই পরিত্যাগ করিবেন।

স্বামী তাড়না করিলে যে কামিনী প্রতি তাড়নায় অভিলাষিণী হয়, সে বিড়াল যোনি প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

যে রমণী পরপুরুষের প্রতি কটাক্ষ নিক্ষেপ করে, সে পক্ষিণী হইয়া জন্মে।

যে কামিনী পরপুরুষ দর্শনে প্রবৃত্ত হয়, সে কাণা, কুরূপা বা বিকৃত মুখা হইয়া জন্ম গ্রহণ করে।

যে স্ত্রী স্বামীকে ত্যাগ করিয়া স্বয়ং মিষ্ট ভক্ষণ করে, সে দেহান্তে তৈলপায়ী অথবা বিষ্ঠা মূত্র ভোজী শূকরী হয়।

পতিকে স্থানান্তর হইতে আসিতে দেখিয়া যে স্ত্রী তৎক্ষণাৎ জল, আসন, বসন, তাম্বূল, ব্যজন, পাদ সম্বাহন পূর্ব্বক তাঁহার শ্রান্তি দূর ও তৃপ্তি বিধান করে, ত্রিভুবন তাহার প্রতি প্রীত হয়।

ভর্ত্তাই নারীদের দেবতা, ভর্ত্তাই নারীর গুরু, ভর্ত্তাই নারীর সমুদয় ধর্ম্ম, তীর্থ ও ব্রত। অতএব সর্ব্ব ধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক একমাত্র স্বামীরই সর্ব্বতোভাবে সেবা ও অর্চ্চনা করিবেক।

যাবতীয় অমঙ্গলের মধ্যে বিধবা অতিমাত্র অমঙ্গল বস্তু। বিধবা দর্শনপূর্ব্বক কুত্রাপি কখন সিদ্ধি লাভ হয় না।

জ্ঞানী পুরুষ একমাত্র জননী ভিন্ন অন্য কোন বিধবারই আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিবেন না। ঐ আশীর্ব্বাদ সাক্ষাৎ আশীবিষ সদৃশ হয়।

জীবিত বা মৃত সকল অবস্থাতেই সহধর্ম্মিণী স্বামীর সহচরী হইবে। ছায়া যেমন দেহের, জ্যোস্না যেমন চন্দ্রের, বিদ্যুৎ যেমন মেঘের অনুগমন করে, তেমনি পতিব্রতা রমণী সর্ব্বতো-ভাবে স্বামীর অনুগামিনী হইবে।

যে রমণী হৃষ্টান্তঃকরণে স্বামীর সহমৃতা হইবার অভিলাষে গৃহ হইতে শ্মশানে গমন করে, তাহার পদে পদে অশ্বমেধ ফল লাভ হইয়া থাকে।

সাপুড়ে যেমন বল পূর্ব্বক গর্ত্ত হইতে সর্প উদ্ধৃত করে, সতী স্ত্রী সেই রূপ যমদূতগণের হস্ত হইতে পতিত স্বামীকে উদ্ধার করিয়া স্বর্গে গমন করেন।

যমদূতগণ সতী স্ত্রী দর্শন মাত্র দূর হইতেই স্বদীয় দুষ্কৃত কম্মা পতিরে একেবারে পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করে, এবং তৎ-কালে তাহারা পতিব্রতাকে আসিতে দেখিলে অত্যন্ত ভীত হইয়া থাকে।

শরীরে যত লোম আছে, তত অযুত কোটী বৎসর পতি-ব্রতা রমণী স্বামীর সহিত স্বর্গসুখ ভোগ করে।

যাঁহাদের গৃহে পতিব্রতা বিরাজমানা, সেই জননীই ধন্য সেই জনকও ধন্য! সেই শ্রীমান পতিই ধন্য!

সতী স্ত্রীর পুণ্যবলে পিতৃকুল মাতৃকুল ও শ্বশুরকুল এই তিন কুলের নারীগণ স্বর্গ সুখ ভোগ করে।

দুষ্কৃতাচারিণী কামিনীরা স্বয়ং যেরূপ উভয় লোকেই সুখ সম্ভোগে বঞ্চিতা হয়, সেইরূপ অসদাচার নিবন্ধন উল্লিখিত কুলত্রিতয়ও পাতিত করিয়া থাকে।

যে যে স্থানে পতিব্রতা রমণীর পাদস্পর্শ হয়, সেই সেই স্থানের ভূমি আপনাকে পরম পবিত্র ও ভারহীন মনে করিয়া থাকে।

রূপ লাবণ্য গর্ব্বিণী রমণী প্রতি গৃহেই প্রায় দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু এক মাত্র পরমেশ্বরের প্রতি ভক্তিযোগ দ্বারাই উল্লিখিত রূপ পতিব্রতার দর্শন লাভ হইয়া থাকে।

ভার্য্যাই গৃহস্থের মূল ভার্য্যাই সুখের মূল ভার্য্যাই ধর্ম্ম ফল প্রাপ্তির মূল এবং ভার্য্যাই বংশ বৃদ্ধির মূল। ভার্য্যার দ্বারা ইহলোক পরলোক উভয় লোকেই জয়লাভ করা যায়। যাঁহার ভার্য্যা নাই, দেব পিতৃ অতিথি সেবা ও যজ্ঞাদি কার্য্যে তাঁহার অধিকার নাই।

যাহার গৃহে পতিব্রতা রমণী বিরাজমানা, সেই ব্যক্তিকেই গৃহস্থ জানিবে, অসতী স্ত্রী জরা রাক্ষসীর ন্যায় দিন দিন স্বামীকে গ্রাস করিয়া থাকে।

গঙ্গা জলে অবগাহন করিলে শরীর যেরূপ পবিত্র হয়, পতিব্রতা রমণীর শুভ দৃষ্টিপাতেও তদ্রূপ পবিত্রতা লাভ হইয়া থাকে।

সহধর্ম্মিণী কোন কারণে স্বামীর অনুগামিনী হইতে না পারিলে সর্ব্বদা স্বীয় সচ্চরিত্র রক্ষা করিবে। কেন না অসতী স্ত্রী অধোগামিনী হইয়া থাকে।

বিধবা রমণীর চরিত্রে কোন দোষ জন্মিলে তাহার স্বামী নিশ্চয়ই স্বর্গ হইতে পতিত হয়। এবং তাহার মাতা পিতা ও ভ্রাতৃবর্গেরও তদনুরূপ অধঃপাত সংঘটিত হইয়া থাকে।

পতির পরলোকান্তে যে রমণী যথাবিধি বৈধব্যব্রত পালন করে, সে পুনরায় স্বামী সমাগম লাভ করিয়া স্বর্গ পরম্পরা ভোগ করিয়া থাকে।

যমুনার কথা শুনিতে শুনিতে পঞ্চাইত ও দর্শকমণ্ডলীর মধ্যে অনেকে মোহিত, রোমাঞ্চিত ও প্রেমাশ্রুপ্লাবিত হইতে লাগিলেন। এবং যমুনার বাক্য শেষ না হইতে হইতেই কেহ কেহ

অশ্রুপূর্ণলোচনে কহিলেন, যমুনে! জগতে নারীগণ মধ্যে তুমিই ধন্যে! তুমি যেরূপে স্বামী সেবা কর, তাহা ত আমরা একপ্রকার শ্রবণ করিলাম, কিন্তু ভবাদৃশ সর্ব্বগুণবতী পতিব্রতা সতীর প্রতি তোমার পতি কিরূপ ব্যবহার করেন, তাহা শুনিতে আমাদের অন্তঃকরণ অত্যন্ত কৌতুহলাক্রান্ত হইতেছে। তাহাতে যমুনা বলিল, পতি আমাকে অতিশয় ভালবাসেন, এবং বড়ই ভক্তি ও মান্য করিয়া থাকেন। আমার অধিক আর বলিবার আবশ্যকতা নাই, এইমাত্র বলিলেই সকলে বুঝিতে পারিবেন যে, স্বামী আমারে আদ্যাশক্তি মহামায়ার অংশ সম্ভূতা বলিয়া প্রীতিপূতচিত্তে পূজা করিয়া থাকেন। আবার যখন তখন পবিত্রপ্রেমে আপ্লুত হইয়া আমাকে মস্তকে গ্রহণ ও কখন বা প্রেমালিঙ্গন আদর চুম্বন ও বক্ষে ধারণ করেন। তাঁহার চক্ষে আমি যেন একটী অপূর্ব্ব পবিত্র বস্তু বলিয়া লক্ষিত হই। তিনি আমার প্রতি অত্যন্ত অনুরাগ ও সোহাগ প্রকাশ করিয়া থাকেন, কখনই আমার কোন অপ্রিয় কার্য্য সাধন করেন নাই। সর্ব্বদাই আমার সন্তোষ সম্পাদনে সযত্ন থাকেন। তাঁহার কৃপা ও সেবা ফলে আমি দুই পুত্র এবং একটী কন্যা সন্তান লাভ করিয়া কৃতার্থা হইয়াছি। তিনি আমাকে পূজা করিতে প্রবৃত্ত হইলে আমি যখন তাঁহাকে বিনয়পূর্ব্বক তাঁহার পদতলে পতিত হইয়া নিবারণ করি, তখন তিনি ভীষ্মকাহিনী আমার নিকট বর্ণন করেন। যথা—

"একদা শৈশবাবস্থায় ভীষ্ম মহাশয় যখন মাতৃক্রোড়ে (গঙ্গা-দেবীর অঙ্কে) শয়ন করিয়া স্তনপান করিতেছিলেন, তখন সহসা গঙ্গাদেবী শিহরিয়া উঠিলেন ও তাঁহার অঙ্গে কশাঘাতের চিহ্ন প্রকাশিত হইল। তদ্দর্শনে ভীষ্ম জিজ্ঞাসা করিলেন,

মাতঃ এ কি হইল? গঙ্গা উত্তর দিলেন, "এক নরাধম তাহার সহধর্ম্মিণীকে কশাঘাত করিল। আমরা সকল নারী জগন্মাতা মহামায়ার অংশসম্ভূতা বলিয়া সেই আঘাত মদঙ্গেও প্রকাশ পাইল।" তদবধি সকল মহিলা মহামায়ার অংশ জানিয়া ভীষ্ম আর বিবাহ করেন নাই। তিনি মাতৃময় জগৎ নিরীক্ষণ করিতেন।"

পঞ্চাইত পুনর্ব্বার যমুনাকে কহিলেন, তার পর কি হইল বল। যমুনা বলিলেন, আমার শ্বশুর ঠাকুর পরম ধার্ম্মিক শৈব ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। তাঁহার দেহ ত্যাগ কালে শিবদূতগণ নভূত ন ভবিষ্যত অতি অদ্ভুত আনন্দবেশে আসিয়া শ্বশুরের আত্মাপুরুষকে স্থির বিদ্যুৎ সদৃশ পুষ্পক বিমানে আরোহণ করাইয়া বীজন ও বিপুল সম্মান পূর্ব্বক শিবলোকে লইয়া গেলেন। তদ্দর্শনে আমি পরম পুলকিত চিত্তে অতি উল্লাসে হাস্য সম্বরণ করিয়া থাকিতে পারিলাম না। তৎপূর্ব্বে ভৈরব সোণার পীড়িত হইয়া রোগের দারুণ যন্ত্রণা ভোগ করিতে ছিল, ভীষণ যমদূতগণ আসিয়া তাহার বুকে হাঁটু দিয়া তাহার জিহ্বা টানিয়া ধরিলে, সে ভয়ে মল মূত্র পরিত্যাগ করিল, এবং দূতগণ ধনুকের ন্যায় তাহাকে বক্রভাবে চাপিয়া ধরিলে সে যে কি বিষম যাতনা সহ্য করিতে লাগিল, তাহা আর কি বলিব! লোকে বলিতে লাগিল, উহার ধনুষ্টঙ্কার পীড়া হইয়াছে। যাহা হউক অবশেষে সে বিষম বেদনায় বিধুর ও বাক্‌রোধ হইয়া গোঙ্গাইতে গোঙ্গাইতে প্রাণত্যাগ করিল। দূতেরা তাহার হাতে পায়ে যেন উত্তপ্ত লৌহ শৃঙ্খলে বদ্ধ করিয়া লৌহদণ্ডে তাড়না করিতে করিতে টানিয়া লইয়া গেল। ইহা দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখে আমি ক্রন্দন করিতেছিলাম। যমুনার মুখ হইতে এই

বাক্যটী মাত্র বহির্গত হইতে না হইতেই তাহার ব্রহ্মরন্ধ্র বিদীর্ণ হইয়া তাহার আত্মা সতীলোকে গমন করিল। দেহ গঙ্গাজলে পতিত হইয়া ভাসিতে থাকিল। ইহা দেখিয়া শুনিয়া 'হায় কি হইল, হায় কি হইল' বলিয়া যমুনার স্বামী ও পুত্র কন্যা এবং দর্শকমাত্রেই রোদন করিতে লাগিল।

তৎপরে যমুনার মৃত দেহ জল হইতে তুলিয়া তাহার স্বামী গঙ্গাতীরে শায়িত করাইয়া দিলে, অগণিত হিন্দুস্থানী কামিনী কাঁদিতে কাঁদিতে আসিয়া যমুনার পদতলে পড়িল, এবং মা এয়োরাণি! সতি! ভাগ্যবতি! জগৎ আঁধার করিয়া আজ তুমি কোথায় চলিলে! দেবি! আমাদিগকে পায়ে রাখিলে না! তোমার মাধোদাস ও শিউ দাস যে মাতৃহীন হইল! তোমার শাম্নীকে কে আর কোমলকোল* প্রদান করিবে! তোমার স্বামী আজ যথার্থই শ্রীহীন হইয়া পড়িল! ইত্যাদি হৃদয় ভেদী ক্রন্দন দ্বারা গগন আচ্ছন্ন করিয়া তুলিল। প্রকৃতি দেবী শোকবসন পরিধান করিয়া নীরবে রোদন করিলেন। খোদাবন্দ! হিন্দু শাস্ত্রানুসারে যমুনার পবিত্র মৃত শরীরের যথারীতি সৎকার করা হইয়াছে।"

বাদশা এই আশ্চর্য্য ঘটনার সংবাদ শুনিয়া বেগমদিগকে পাতিব্রত্য ধর্ম্ম শিক্ষা দিবার কারণ হিন্দু পণ্ডিত নিযুক্ত করিয়া সস্ত্রীক ভাগবত ও পতিব্রতা উপাখ্যানাদি শ্রবণ করিতে লাগিলেন।

---

* * ইহা বাস্তবিক ঘটনা। প্রত্ন তত্ত্বানুরাগী কোন ধনী হিন্দুমহোদয় যমুনার সমাধি স্থান অন্বেষণ পূর্ব্বক তথায় একটী "সতীকীর্ত্তিনিলয়" প্রতিষ্ঠিত করিলে আর্য্যভূমের বিশেষ উপকার করা হয়।

এখনকার সময়ে নিত্য শত শত পতিত্যাগ ও পত্নীত্যাগের দেশে স্ত্রীলোকদের ভাগবত ও পতিব্রতা উপাখ্যান শ্রবণপূর্ব্বক পাতিব্রত্য ধর্ম্ম শিক্ষা করা কর্ত্তব্য। ঐ সকল দেশবাসীরা আবার আপনাদিগকে উচ্চশিক্ষা সম্পন্ন জ্ঞানবান ও সভ্য বলিয়া অভিমান করেন ইহাই বড় আশ্চর্য্য!
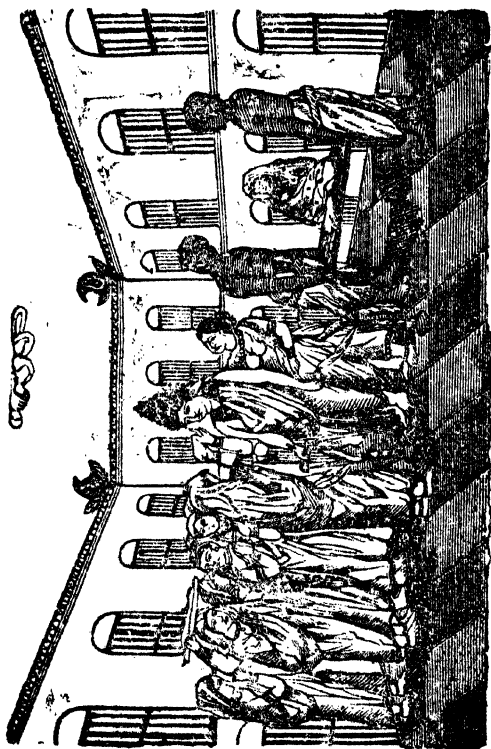
বাল্যবিবাহই ভাল। বালিকারা বাল্যকালে যেমন পিতা মাতা, ভ্রাতা ভগিনী প্রভৃতির সহিত অবস্থিত থাকিয়া ক্রীড়া

কৌতুকে কালযাপন করতঃ পরস্পর ভক্তি, বাৎসল্য ও সৌহৃদ্য ভাব লাভ করে, তেমনি তাহারা বিবাহের পর কিছুকাল শ্বশুরালয়ে যাতায়াত ও অবস্থান করিয়া কিরূপে শ্বশুর শাশুড়ী, স্বামী, ভাসুর প্রভৃতির সেবাভক্তি করিতে হয়, দেবর, যা ও ননদিনী প্রভৃতির সহিত কিপ্রকার ব্যবহার করা উচিত, তাহা শিক্ষা করে। এইরূপে পরস্পর স্নেহ ভক্তি, প্রণয়, মমতাদি সৌহৃদ্য ভাব সকলের স্থায়ীরূপে সঞ্চার হইতে থাকে। বিশেষতঃ বর-কন্যার পিতা মাতা বা অভিভাবকগণ পরস্পর কুলশীল, বংশ-মর্য্যাদা ও গুণাগুণ সকল বিশেষরূপে দেখিয়া ও জানিয়া শুনিয়া বিবাহ দিলে অশেষ মঙ্গল লাভ হয়। এই কারণে পূর্ব্বে দূষিত কি কোন কলঙ্ক কলুষিত-কুলে কেহ পুত্র কন্যার বিবাহ দিতেন না।

পুরুষ অর্দ্ধ শরীর এবং স্ত্রী অর্দ্ধাঙ্গী, বিবাহ দ্বারা এই দুই অর্থাৎ স্ত্রী পুরুষ একত্র সংযোজিত হইলে পর মনুষ্য পূর্ণাঙ্গ বিশিষ্ট সম্পূর্ণতা লাভ করিতে পারে। যতক্ষণ স্ত্রীপুরুষে বিবাহ না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত উহাদিগকে মনুষ্যই বলা যায় না। তখন উহারা যেন কোথাকার কে, এবং পশুবৎ *। উহারা যোগধর্ম্ম বা যোগফল কিছুই অবগত নয়। স্ত্রীপুরুষে পরিণয় সূত্রে সংযুক্ত হইবার পূর্ব্বে যেন কতকগুলি বিগতজীবিত অর্দ্ধ অঙ্গ,

* যে সকল সাধুপুরুষ চিরজীবন অবিবাহিত থাকেন, তাঁহারা আপন আপন আত্মা পরমপুরুষ পরমেশ্বরে সংযুক্ত করতঃ যোগসাধন দ্বারা অমৃতফল উপার্জ্জন করিয়া থাকেন। অবিবাহিত বৈষ্ণবসাধকগণ আপনাদিগকে প্রকৃতি ভাবিয়া মনে মনে কৃষ্ণপতিকে বিবাহ করতঃ তাঁহার সহিত মিলিয়া যোগ সাধনে প্রেমফল লাভ করেন।

কর্ম্মরূপ অকূল সাগরে পড়িয়া ভাসিয়া যাইতেছে। আর যাহা তাহারা বিবাহবন্ধনে (স্ত্রীপুরুষে পবিত্র দাম্পত্য প্রেমে) সংযুক্ত হইয়া যোগ সাধন আরম্ভ করিল, অমনি তাহারা ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ চতুর্ব্বর্গ ফললাভের অধিকারী হইল। উহাদিগের পবিত্র যোগফলে পুত্র বা কন্যা রত্ন উৎপন্ন হইতে লাগিল। পুত্র ও কন্যা জন্মগ্রহণ করিয়া পুন্নাম নরক হইতে পিতা মাতাকে উদ্ধার করিয়া থাকে। জ্ঞানবান কৃতজ্ঞ পুত্র পিতামাতাকে গ্রাসাচ্ছাদন ও সুখসেব্য বাসস্থানত প্রদান করিবেনই, পিতা মাতার প্রীত্যর্থে প্রাণ দান করিলেও তাঁহাদের ঋণ মুক্ত হইতে পারেন না। আমরা কোন কোন পুত্রকে পীড়িত অথচ বৃদ্ধ পিতা মাতার বিমূত্র চন্দনের ন্যায় দুই হস্তে পরিষ্কার করিতে দেখিয়াছি। স্ত্রীলোকের যেমন পতিই ঈশ্বর, পুত্রের পক্ষে তেমনি পিতা মাতাই সাক্ষাৎ পরমেশ্বর। পিতা মাতার সেবা ভিন্ন পুত্রের অন্য ধর্ম্ম নাই।

"পিতাস্বর্গ পিতাধর্ম্ম পিতাহি পরমন্তপ
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রিয়ন্তে সর্ব্বদেবতা।"

পুত্র কন্যা বৃদ্ধ ও অক্ষম পিতা মাতার অসময়ের পরমোপকারী। অক্ষম ও দরিদ্র যে সকল বৃদ্ধ স্ত্রীপুরুষের পুত্র কন্যা নাই, তাহাদের দুঃখের সীমা নাই। তাহারা জীবদ্দশায় খাইতে পায় না, পীড়িত হইলে ঔষধ ও পথ্য পায় না এবং মরিলেও তাহাদের গতি হয় না। এরূপ নির্ব্বংশ বা অপুত্রক বৃদ্ধ বৃদ্ধার মৃত্যু অন্তে গঙ্গাপুত্রগণই তাহাদের গতি ও সৎকার করিয়া থাকে। অতএব যাহাতে সর্ব্বাঙ্গ সম্পন্ন গুণবান ধার্ম্মিক ও দীর্ঘজীবী সন্তান সন্ততীর উৎপত্তি হইতে পারে, এমত স্ত্রী পুরুষ বাছিয়া লইয়া বিবাহ করা উচিত। স্ত্রী জননেন্দ্রিয় ক্ষেত্র

এবং পুরুষের শুক্র বীজ স্বরূপ। যেমন উর্ব্বরা ক্ষেত্রে পরিপক্ক বীজ রোপণ করিলে উত্তমফল উৎপন্ন হয়, তেমনি বলিষ্ঠ, নীরোগী, জ্ঞানবান ও ধার্ম্মিক শ্রীমান পুরুষের সহিত উত্তমা ও সর্ব্বাঙ্গ সম্পন্ন অরোগিণী, গুণ ও জ্ঞানবতী স্ত্রীর সঙ্গমে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর বলিষ্ঠ শিষ্ট শান্ত আয়ুষ্মান জ্ঞানবান ভাগ্যবান ধার্ম্মিক সন্তান উৎপাদিত হয় তাহার আর সন্দেহ নাই।

ভার্য্যার বয়ঃক্রম চতুর্দ্দশবৎসর এবং পতির বয়স বাইস বৎসর না হইলে আর উভয়ের একত্র শয়ন বা সহবাস করা কর্ত্তব্য নয়। কেননা, ইহার পূর্ব্বে স্ত্রী পুরুষের শারীরিক মানসিক ও আধ্যাত্মিক গঠন প্রণালী, জ্ঞান বুদ্ধি আদি উন্নত ভাব সকল সম্পূর্ণ ও পরিপক্ক হয় না। সেই সম্পূর্ণ ও পরিপক্কতানুসারে ক্ষেত্র ও বীজ প্রস্তুত হয়। কিন্তু ইহাও বলা আবশ্যক যে, উক্তরূপে প্রথম স্ত্রী সঙ্গমের পূর্ব্বে পুরুষের বীর্য্য যেন কোন ক্রমে আত্মবিকৃতি, পুং মৈথুন, পরদার বা বেশ্যাগমনাদি দ্বারা নষ্ট বা দূষিত হইয়া না যায়। যদি কখন ২১।২২ বৎসর বয়সের পূর্ব্বে আত্ম বিকৃতি পুং মৈথুন, পরদার বা বেশ্যাগমন না করা যায়, কামভাব বড় একটা মনে না আনা যায়, তাহা হইলে স্বপ্নদোষ, কি মেহ পীড়া হইবার সম্ভাবনা নাই। মনে রাখিবে যে, পুত্র উৎপাদনের জন্যই স্ত্রী সহবাস করা আবশ্যক, কামবৃত্তি—পশুপ্রবৃত্তি চরিতার্থ জন্য নহে। তাহা হইলে স্ত্রী পুরুষ উভয়েই যখন শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক কোন প্রকার রোগ বা দুর্ভাবনাদিতে আক্রান্ত না থাকিয়া সুস্থ ও প্রফুল্ল অন্তঃকরণে থাকিবে, তখন নিষিদ্ধ দিন ক্ষণ এবং অতি শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা ঝটিকা ও মেঘাচ্ছন্ন দুর্দ্দিন ব্যতীত শুভ দিন ক্ষণে ঈশ্বরের নাম উচ্চারণ ও তাঁহার নিকট সুসন্তান লাভের প্রার্থনা পুরঃসর

স্ত্রী বিহার করিবে। শারদীয় ও বাসন্তিকসিতপক্ষ-রজনী রমণী রমণের অতি মনোরম উপযুক্ত সময়। কামভাবে পশুবৎ নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিলে, তাহাতে যে সন্তান উৎপন্ন হইবে, সে কুলাঙ্গার ও সমাজ কণ্টক হইয়া উঠিবে। এই সকল সন্তানই পিতামাতার প্রতি বিহিত কৃতজ্ঞতা ও ভক্তি প্রদর্শনের পরিবর্ত্তে মাকে গুদাম ভাড়া দিতে ও পিতাকে মূর্খ old fool বলিতে কুণ্ঠিত নহে। পুত্র চাকুরে, ভদ্র-ভদ্র লোকের সঙ্গে বসিয়া আছে, এমন সময় তাহার পিতা হীনবেশে তথায় উপস্থিত হইলে, পুত্রটী পিতাকে বাগানের মালী বলিয়া উল্লেখ করে। মাতা পিতার পাশব-প্রবৃত্তি চরিতার্থের ফল হাতে হাতেই ফলিল। অতএব কাম ও প্রেমের প্রভেদ জানা আবশ্যক। ইহা গুপ্তগৃহে প্রেম কথা শুনিয়া জ্ঞাত হও।

জ্যোতিষ মতে শুভক্ষণে বর কন্যার রাশি আদি মিলাইয়া বিবাহ করা কর্ত্তব্য। এ রীতি আমাদের দেশে পূর্ব্বাবধি প্রচলিত আছে। এখন পাশ্চাত্য সভ্যতা এ প্রথাকে কুসংস্কার বলিয়া উপহাস ও পরিত্যাগ করায় দেশেরও অমঙ্গল হইতেছে। কুদিন কুক্ষণে নিষিদ্ধগণে বিবাহিত হইয়া, পুত্রপৌত্রাদি ক্রমে সস্ত্রীক যাবজ্জীবন দারিদ্র দুঃখভার, তথা পুত্র কন্যাদির অকাল মরণ জনিত অসহ্য শোকভার বহন ও অনুক্ষণ অনুতাপে দগ্ধ তনু হওন অপেক্ষা অবিবাহিতাবস্থায় কালযাপন করাই লক্ষগুণে উত্তম।

জ্যোতিষগণনা দ্বারা যদি জানা যায় যে, অমুক লগ্নে বা অমুকের সঙ্গে কন্যার বিবাহ দিলে, কন্যাটী বিধবা বা বেশ্যা কি কলঙ্কিনী কি চির দুঃখিনী বা আত্মঘাতিনী কি পতিঘাতিনী অথবা বন্ধ্যা কি মৃতবৎসা হইবে, তাহা হইলে কে আর সেই

লগ্নে বা সেই পাত্রের সহিত কন্যার বিবাহ দিবে? বরং যে লগ্নে এবং যে বরের সঙ্গে বিবাহ দিলে কন্যাটী পতিব্রতা, লক্ষ্মীমতী ও বহু পুত্রবতী হইতে পারে এবং চিরায়তী ধরিতে পারে, পিতা মাতা সেই লগ্নেই ও সেই বরের সঙ্গেই দুহিতার বিবাহ দিবে। বিবাহ সম্বন্ধে বর কন্যার রাশি ও গণাদি ও বিহিত তিথি নক্ষত্রাদির বিষয় পঞ্জিকায় লিখিত থাকে।

যে কুলে কোন কলঙ্ক বা বিশেষ দোষ কি রোগ আছে, সেই কুলে ও সগোত্রে কখনই পুত্র কন্যা আদান প্রদান করিবে না। আর যে পুত্র কি কন্যার পিতা মাতা অল্পবয়সে প্রাণত্যাগ করিয়াছে, এমন পিতা মাতার পুত্র কন্যার সহিত কন্যা পুত্রের বিবাহ দেওয়াও কর্ত্তব্য নহে। কেননা পিতা মাতার অপেক্ষা পুত্র কন্যা কখনই দীর্ঘজীবী হয় না। বিশেষতঃ চল্লিশ বৎসরের উর্দ্ধ বয়স্ক বরের সহিত কন্যার বিবাহ দিবে না। কেননা তাহা হইলে কন্যাটীর শীঘ্র বিধবা হইবার সম্ভাবনা। বিশেষতঃ বৃদ্ধের ঔরসজাত সন্তানের দীর্ঘজীবনের আশাও অতি অল্প। এই সকল বিবেচনা না করিয়া স্ব স্ব পুত্র কন্যার পরিণয় ক্রিয়া সম্পাদন করাতেই বিধবা স্ত্রীলোকের সংখ্যা ও ব্যভিচারাদি কুক্রিয়ার বৃদ্ধি হইতেছে।

বিবাহের পর বরকন্যার যে ফুলশয্যার নিয়ম আছে, সে কেবল পুত্রোৎপাদন সময়ের শয্যার নমুনা মাত্র। পুত্রোৎপাদন কালীন দম্পতীকে অতি উৎকৃষ্ট স্থানে উৎকৃষ্ট পুষ্পশয্যায় শয়ন করা কর্ত্তব্য। সেই শয়নঘরখানি নয়ন মন প্রফুল্লকর অতি মনোহর উত্তমোত্তম দ্রব্য ও সুন্দর চিত্রাদিতে সুসজ্জিত করিয়া ধূপ, ধুনা, আতর, গোলাপ ও মৃগনাভি আদি সুগন্ধি দ্রব্য দ্বারা আমোদিত তথা আলোকমালায় পরিশোভিত করা উচিত।

সে সময় পবিত্র গীত বাদ্যাদি দ্বারা মনকে পুলকিত করা অতি আবশ্যক। এবং অতি উন্নত বীরভাবে ও জ্ঞান এবং দয়া ধর্ম্মে হৃদয়াধার পরিপূর্ণ রাখা নিতান্ত কর্ত্তব্য। তৎকালে দম্পতীর যে প্রকার মনের ভাব, সন্তানও সেই ভাব বিশিষ্ট হইয়া জন্ম লাভ করে, তাহার আর কোন সন্দেহই নাই। সে সময় কোন নীচ ভাব, পাপ কি কাম কামনা, ভীরুতাদি কোন কুভাব মনে রাখিলেই অনর্থপাত!! দেখুন, পুত্রোৎপাদন সময়ে ধৃতরাষ্ট্র-জননী, পুত্রোৎপাদয়িতা ব্যাস-ভয়ে ভীতা হইয়া, চক্ষু মুদিত করায়, অন্ধ সন্তান জন্মগ্রহণ করেন। এরূপ দৃষ্টান্ত কোটী কোটী আছে।

দ্বিরাগমন—যদি অদিনে অক্ষণে দ্বিরাগমন হয়, তাহা হইলেই সর্ব্বনাশ! হয় ত শ্বশুরালয়ে পদার্পণ মাত্রেই গৃহ দাহ হয়! কিম্বা সম্বৎসরের মধ্যে শ্বশুর বা শাশুড়ী বিনাশ পায়! না হয় পতি বিনাশ প্রাপ্ত হয়! অথবা নারী বন্ধ্যা বা বারাঙ্গণা কি মৃতবৎসা কি চিররোগিনী কি দুঃখিনী হয়! কিম্বা পতিকে চির প্রবাসী বা বন্দী হইয়া থাকিতে হয়! পক্ষান্তরে শুভদিন ক্ষণে দ্বিরাগমনে অশেষ মঙ্গল লাভ হইয়া থাকে। গৃহ ধনধান্যে পরিপূর্ণ হয়! পতিব্রতা সতী, পুত্র পৌত্রবতী এবং পতি সহ চির সুখী হয়। এই পূর্ব্ব রীতির পরিবর্ত্তে এক্ষণে সর্ব্বদেশে "ধূলো পায়ে লগ্ন" প্রবর্ত্তিত হইয়াছে!

স্ত্রীলোকদিগকে প্রতিবারেই রজোদর্শনানন্তর চতুর্থ দিনে শুভক্ষণে স্নান করিতে হয়। স্নানানন্তর ভগবান্ সূর্য্যদেবকে দর্শন ও প্রণামপুরঃসর পতির ধ্যান করিতে হইবে। তাহা হইলে সেই স্ত্রী নিঃসংশয় দীর্ঘায়ু বিশিষ্ট সুশিষ্ট পুত্রবতী এবং সুখ সৌভাগ্যবতী হয়। ঋতুমতী স্ত্রী তিন দিন পর্য্যন্ত অতি

অশুচি থাকে। সে তিন দিন তাহাকে স্পর্শ করিতে কি তাহার হস্তের অন্নজল খাইতে নাই, এমন কি তাহার মুখ দর্শন পর্য্যন্তও করিতে নাই। সেই তিন দিন মধ্যে উক্ত স্ত্রীগমনে নানা-প্রকার রোগ জন্মিয়া থাকে। স্ত্রীলোকের আদ্য ঋতু দর্শনে মাস তিথি বার নক্ষত্রাদি দোষ সংঘটন হইলে সে দোষের শান্তি করা আবশ্যক ; এ সকল বিষয় পঞ্জিকায় দ্রষ্টব্য।

ঋতু রক্ষা * পূর্ব্বক পুত্রোৎপাদন করা অতি গুরুতর বিষয়। সৃষ্টিকর্ত্তা পরমেশ্বর প্রতিষ্ঠিত নিয়মাবলীর মধ্যে এইটীই সর্ব্বা-পেক্ষা আশ্চর্য্যজনক সুকৌশল সম্পন্ন প্রধান ও প্রাথমিক নিয়ম। এতদ্দ্বারাই জড়জগত চৈতন্যরূপে প্রতিষ্ঠিত আছে। এতদ্দ্বারাই নিত্য নিত্য নূতন নূতন জীবের সৃষ্টি হইয়া জীব প্রবাহ সুরক্ষিত হইতেছে। অদিন কুক্ষণে ঋতুরক্ষা করার বাড়া পাপ কর্ম্ম আর নাই। তাহা করিলে নিজের, ভার্য্যার এবং ভাবী সন্তানাদির দুর্গতির এক শেষ হয়!! সন্তান, নপুংসক জন্মিতে পারে, কিম্বা জন্মান্ধ, ন্যূব্জ, কুব্জ, খঞ্জ, বামন, মূক কি বধির হইয়াও জন্মিতে পারে, জন্মিয়াই মরিতে পারে, বা গর্ভেও মরে, অতি অল্পায়ুও হইতে পারে, অথবা আত্মঘাতী কি পিতৃমাতৃ হত্যাকারী. কিম্বা মদ্যপায়ী, চোর, লম্পট, মিথ্যা-বাদী, প্রবঞ্চক, অলস কি ভীরু বা বিশ্বাসঘাতকী মহাপাতকী হয়। দাস কিম্বা ক্রীতদাস, চিরদুঃখী কি ভিক্ষুক কি চিররোগী

---

* ঋতু দিন হইতে ষোল দিনের মধ্যে দশম দিনে, দ্বাদশ দিনে, চতুর্দ্দশ দিনে কি ষোড়শ দিনে গর্ভাধানে পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করে। নবম, একাদশ, ত্রয়োদশ ও পঞ্চদশ দিবসে ঋতু রক্ষায় কন্যা হয়। রজোদর্শনের ৮ দিন বাদ দিয়া নবম দিন হইতে গর্ভাধানে নিযুক্ত হইতে ঋষিগণ বলিয়া গিয়াছেন।

বা চিরবন্দী হইয়া থাকে। কুদিন কুক্ষণে গর্ভাধানে কন্যা জন্মিলে সেই কন্যাদিগকে হয় ত বিধবা হইয়া থাকিতে হয়, নয় ত দাসীবৃত্তি কি বেশ্যাবৃত্তি কি ভিক্ষা করিয়া খাইতে হয়। অথবা আত্মঘাতিনী কিম্বা পতিঘাতিনীও হয়। কেহ কেহ বা বন্ধ্যা বা মৃতবৎসা হয়। এবং কেহ কেহ বা গর্ভবতী হইয়া পুত্র প্রসব করিতে না পারিয়া প্রসববেদনাতেই সগর্ভ প্রাণত্যাগ করে!

গর্ভাবস্থায় অন্ততঃ প্রথম প্রথম দুই তিন বার গর্ভিণীকে তাহার জনক জননীর বাটীতে পাঠাইয়া তথায় প্রসব হইতে দেওয়াই সুপ্রশস্ত। গুর্ব্বিণী পিত্রালয়ে মাতা ভগিনীর নিকটে পরিমিত পরিশ্রম পূর্ব্বক অনেকটা অশঙ্কুচিতভাবে মনের স্ফূর্ত্তিতে থাকিয়া সুসন্তান প্রসব করিতে পারে সন্দেহ নাই। আজ কাল অনেক যুবা ইহার অন্যথা করিয়া বিষম বিভ্রাট ঘটাইতেছে। এক্ষণে প্রায়ই শুনা যায় অমুক স্ত্রী লোকটা পুত্র প্রসব করিতে পারিল না, মরিয়া গেল! কুদিন কুক্ষণে পুত্রোৎপাদনের বিষময় ফল প্রতিক্ষণই পৃথিবীতে উৎপন্ন হইতেছে।

একবার এক স্ত্রীলোকের গর্ভে আশ্চর্য্যজনক যমক সন্তান উৎপন্ন হয়! তাহারা একেবারে পীঠেপীঠে যোড়া! উভয়েরই ঘাড় পীঠ ও নিতম্ব এক সঙ্গে সংলগ্ন ছিল। তাহাদের সন্মুখ

* চতুর্দ্দশী, অষ্টমী, অমাবস্যা, পূর্ণিমা, সংক্রান্তি, প্রতিপদ, সপ্তমী, পঞ্চমী, দশমী, একাদশী, জন্মতিথি, পিতৃ মাতৃশ্রাদ্ধ দিন ও তিথি, রবিবার, বুধবার, মঘা, কৃত্তিকা, উত্তরফল্গুনী, উত্তরাষাঢ়া ও উত্তরভাদ্রপদ নক্ষত্রে স্ত্রীগমন নিষেধ। আর দগ্ধা ভদ্রাদি বাছিয়াও ঋতু রক্ষা করা কর্ত্তব্য।

ও পশ্চাদ্ভাগে কোন প্রভেদ ছিল না। সম্মুখদিগে যেমন মুখ, গলা, উদর ও হস্ত পদাদি দৃষ্ট হয়, পশ্চাদ্দিগেও অবিকল তেমনি আর এক মুখ, গলা, বুক, উদর ও হস্ত পদাদি দেখা যাইত। উভয়ের পৃথক্ পৃথক্ মলদ্বার ছিল না, একটী মাত্র মলদ্বার দ্বারাই উভয়ের মল নির্গত হইত। একজন হাসিলে দুজনাই একেবারে এক সঙ্গে হাসিত। একজন কাঁদিলে দুইজনই একে-বারে এক সঙ্গে কাঁদিত। এক জনের ক্ষুধা হইলে, দুজনারই একেবারে ক্ষুধা হইত। একজন কথা কহিলে দুইজনই এক সঙ্গে একই কথা বলিত। দুইজনেই এক সঙ্গে একই সময়ে নিদ্রিত ও একই সময়ে জাগরিত হইত। কিন্তু এ উভয়ের পৃথক্ পৃথক্ আত্মা ছিল। যাহোক্, এইরূপে কিছুদিন যায়। পরে একজনের আত্মাপুরুষ পরলোকে প্রস্থান করে। তদবধি সেই মৃত ব্যক্তির হাসি, কান্না, ক্ষুৎপিপাসা, বা বাক্‌কথনাদি কোন ব্যাপারই ছিল না। জীবিত ব্যক্তি ছয় মাস পর্য্যন্ত সেই মৃতকে আপন পৃষ্ঠে বহন করতঃ ভ্রমণ করিত। পরে মৃতব্যক্তির পচা অঙ্গের দারুণ দুর্গন্ধে জীবিতব্যক্তি পীড়িত হওত প্রাণত্যাগ করিল!!

বর্ম্মাদেশে একটি স্ত্রীলোক অষ্টমমাসের গর্ভবতী হইলে সেই গর্ভস্থ সন্তানটী গর্ভমধ্যেই ক্রন্দন করিত। বাহিরের লোক তাহা শুনিতে পাইত। পরে সে ভূমিষ্ঠ হইয়া কাল কবলিত হইল!

কাহারও কাহারও গর্ভ হইতে লম্বা লম্বা গোঁপ দাড়ী ওয়ালা ছেলেও ভূমিষ্ঠ হইয়াছে।

লোকে ভাষায় বলে, "বাপরে! অমুকের সঙ্গে ঘর করা আট পাটী দাঁতের কর্ম্ম! আট পাটী দাঁত কার? ব্রহ্মার

চারি মুখে আট পাটী দাঁত আছে, এই ত জানি! মানুষের কি কখনও আবার আটপাটী দাঁত হয়? আমি কিন্তু স্বচক্ষে একটী মেয়ে মানুষের মুখে চারি পাটী দাঁত দেখিয়াছি। উপরে দুপাটী, নীচে দুপাটী। তাহার স্বামীর সঙ্গে ঘর করা চারি পাটী দাঁতের আবশ্যক থাকায় বিধাতাপুরুষ তাহার মুখে চারি পাটী দাঁত দিয়াছেন! কামিনীর কোমল প্রাণে ব্যথা দেওয়া অকর্ত্তব্য বিধায় তাহার নাম ধাম ব্যক্ত করিতে পারিলাম না। সে মেয়েটী ভদ্র ঘরের না হইলে কতগুলি সমারোহ মেলায় গিয়া "মেয়ে মানুষের মুখে চারি পাটী দাঁত, মেয়ে মানুষের মুখে চারি পাটী দাঁত, দর্শনী এক এক পয়সা" বলিয়া ঘণ্টা বাজাইলেই বিপুল অর্থ সঞ্চয় হয়।

আমার শ্বশুরকুলের একটী স্ত্রীলোক সর্প প্রসব করিয়াছিলেন। অদ্যাপি মৎ শ্যালকেরা সর্প হিংসা করেন না, বরং কোন সর্পকে মরিতে দেখিলে ত্রিরাত্রি অশৌচ গ্রহণ করিয়া থাকেন।

নবদ্বীপের গুরুদাস কাঁসারীর একটী পুত্রসন্তান ছিল, সেটী লোমাবৃত অবিকল বানর, কেবল লাঙ্গুল বিহীন ছিল। মানুষের মত অল্প অল্প কথা কহিতে পারিত। আর মনুষ্যের ন্যায় সোজা হইয়া চলিত।

রুগ্নাবস্থায় বা শোক দুঃখের কি ক্রোধের সময় অথবা মদ্যাদি পানে মত্ত অবস্থায় সন্তান উৎপাদন করা কর্ত্তব্য নয়। তাহা হইলে সন্তানও রুগ্ন ও শোক দুঃখে মগ্ন বা ক্রোধী হইবে সন্দেহ নাই। চিররোগী কি চিরদুঃখী ব্যক্তির বিবাহ করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য। তাহা করিলে আপনি এবং দারা সুতাদি সকলেই চিরজীবন যার পর নাই রোগ শোকে মগ্ন ও দুঃখ

দারিদ্রে অবসন্ন হইবে সন্দেহ নাই। পিতা মাতার আকৃতি, প্রকৃতি, জ্ঞান, বুদ্ধি, ধর্ম্ম প্রবৃত্তি, শোক, দুঃখ, দারিদ্র ও কাম, ক্রোধ, লোভ, মদ প্রভৃতি স্বভাবাদি অধিকার পূর্ব্বক সন্তান জন্ম লাভ করিয়া থাকে, ইহা প্রাকৃতিক সাধারণ নিয়ম। *

গর্ভবতী স্ত্রীদিগের অতি সাবধানে থাকিতে হয়। গর্ভের দশ মাস কাল অন্তর্বত্নীর কর্ত্তব্য কর্ম্ম অতি গুরুতর। তাঁহার সেই সাময়িক কর্ম্মের প্রতি গর্ভস্থ জীবের যত কিছু ভাবী শুভাশুভ সকলই নির্ভর করে। অতএব এ বিষয়ে স্ত্রীলোকদের সুশিক্ষিত ও সতর্ক হওয়া অতি উচিত। গর্ভাবস্থায় স্ত্রীলোকদের মনে কোন রূপে আতঙ্ক বা ভয়ের উদ্রেক না হয়, কোনরূপ গ্লানি বা মনোগ্লানী না জন্মে, সর্ব্বতোভাবে এরূপ সাবধান থাকা আবশ্যক। সাঁজ সকালে ও রাত্রিকালের কথা কি, যে কোন সময়েই হউক, গর্ভবতী স্ত্রীকে কোন স্থানেই একাকিনী যাইতে নাই। নীচ ও অজ্ঞান লোকের সঙ্গে কখনই থাকিবে না। সে সময় সাধু সঙ্গই সুসঙ্গত। তখন সর্ব্বক্ষণ ধর্ম্মপ্রসঙ্গে ও পবিত্র আমোদ প্রমোদে কাল যাপন করাই কর্ত্তব্য। তখন যত উন্নত ভাবে, সুখ সচ্ছন্দে থাকা যাইতে পারে, তাহাও করা আবশ্যক। কোনমতে নীচ ও ক্ষুদ্র এবং দুঃখভাবকে মনের নিকটে আদৌ আসিতে দেওয়া উচিত নহে। সে সময় ঈশ্বর মহিমা বিষয়ক জ্ঞানগর্ভ পুস্তক সকল আলোচনায় ও পবিত্র কথাবার্ত্তায় এবং ধর্ম্মবীর, সত্যবীর, দানবীর ও যুদ্ধবীর প্রভৃতি মহা মহা বীর পুরুষগণের ও সতী সাধ্বী পতিব্রতাদের জীবন পুস্তক এবং পবিত্র কাব্য উপন্যাসাদি আলোচনায় কালক্ষেপণ করা অবশ্য

মাতা পিতৃসত্বান্তর্ব্বত্ন্যাঃ শ্রুতয়শ্চাভীক্ষ্ণং
স্বোচিতঞ্চ কর্ম্ম সত্ব বিশেষাভ্যাসশ্চেতি।

কর্ত্তব্য। তখন চিত্তবিনোদন চিত্র কার্য্য, সীবনাদি শিল্প কর্ম্ম দ্বারা পরিশ্রম করা উচিত, কিন্তু কোন মতে বিরক্তকর পরিশ্রমাদি কোন কর্ম্মেই ব্যাপৃত হওয়া উচিত নহে। গর্ভাবস্থায় পরিমিত মত যত পরিশ্রম করা যায়, ততই ভাল, তাহাহইলে আর প্রসব কালীন বড় কষ্ট পাইতে হয় না। কিন্তু হৃষ্টান্তঃকরণে পরিশ্রম করা চাই। মধ্যে মধ্যে ইচ্ছামতে পবিত্র গীত বাদ্যাদি দ্বারা চিত্ত প্রফুল্লিত রাখা উচিত।

গর্ভাবস্থায় অধিক পথ চলা বা নৃত্যাদি করা অনুচিত এবং আঁচল পেতে ঘরের মেজেয় বা দাবায় শয়ন করা অবিহিত। সে সময় সতত পুষ্পোদ্যান পরিবেষ্টিত, সুদৃশ্য জ্ঞান ধর্ম্ম উত্তেজক ছবি প্রভৃতি দ্রব্যাদি পরিশোভিত, নির্ম্মল সুগন্ধ মন্দ মন্দ গন্ধবহ প্রবাহিত সুরম্য হর্ম্ম্য নিকেতনে বাস করা আবশ্যক। আর সর্ব্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা কর্ত্তব্য। কখনই মলিন বসন পরিধান ও মলিন কি নিকৃষ্ট শয্যায় শয়ন করিবে না। শাক, অম্ল, ভাজা পোড়াদি, পোড়া মাটী, পাতখোলা, অত্যন্ত তিক্ত কি লঙ্কার ঝাল বা গুড়াদি অতিশয় মিষ্ট দ্রব্যাদি কুভক্ষ্য ভক্ষণ করা অনুচিত এবং কচু ঘেচু আদি অসার তরকারি সকল ও তৈলপক্ক ব্যঞ্জন এবং চিঙ্গাড় আদি মৎস্য ভোজন নিষিদ্ধ। উত্তম চাল্য, সুজি, ময়দা, ঘৃত, গোল আলু, ডুমুর, বেগুন, মোচা, থোড়, কাঁচকলা, পটল ও মানকচু আদি ভাল ভাল তরকারি ও রুই, কাতুই এবং মাগুরাদি উত্তমোত্তম সদ্য মৎস্যাদি ভক্ষণ আবশ্যক। তবে "আতুরে নিয়মো নাস্তি" দুঃখীপ্রাণী যথাসাধ্য ভাল থাকিতে চেষ্টা করিলেই যথেষ্ট হইবে।

গর্ভাবস্থায় স্ত্রীলোকের গুরুপাক দ্রব্য সকল ভক্ষণ অথবা অধিক আহার কিম্বা অল্প ভোজন ও উপবাস করা নিতান্ত

নিষিদ্ধ। অধিক অথবা গুরুপাক বস্তু ভোজন করিলে কিম্বা অল্প আহার করিলে গর্ভবতী সহ গর্ভস্থ সন্তানেরও পীড়া জন্মে। কেহ কেহ বলেন গর্ভিণী উদরপূরিয়া পুষ্টিকর অথচ লঘুপাক দ্রব্য পরিমিতমত ভোজন করিলেই ভাল হয়। তাহাহইলে গর্ভিণী সহ গর্ভস্থ জীবের সুন্দর স্বাস্থ্য থাকে। গর্ভের প্রথমাবস্থা হইতে পূর্ণ গর্ভ পর্য্যন্ত গর্ভবতী স্ত্রী, পুত্রের মুখচন্দ্র নিরীক্ষণ করিবার আশায় অতিশয় পুলকিত থাকেন। এই গর্ভে অতি সুন্দর দীর্ঘজীবি গুণবান ধার্ম্মিক সন্তান উৎপন্ন হউক বলিয়া আশা ও বিশ্বাস করা এবং তৎসম্বন্ধে সর্ব্বদা ঈশ্বর সন্নিধানে প্রেম ভক্তির সহিত প্রার্থনা করা গুর্ব্বিণীর উচিত। গর্ভাবস্থায় মাতার যে প্রকার মনের ভাব থাকে, সন্তানে সেই সকল ভাব আবির্ভাব হইয়া থাকে। মঙ্গলময় মহেশ্বরের যখন এই মঙ্গল নিয়ম, তখন আর ভয় কি? গর্ভ ও সন্তান প্রসব, ঈশ্বরের মঙ্গলকর নিয়মাধীন, ইহাতে কোন ভয় ও চিন্তা নাই। ভয় ও চিন্তা করিয়াই অনেকে প্রসব-বেদনায় কষ্ট ভোগ করে। শ্রমজীবী কত পূর্ণগর্ভবতী ইতর রমনী কর্ম্ম করিতে করিতে অক্লেশে পুত্র প্রসব করিয়াছে। গর্ভকালে আদর আহ্লাদে পবিত্র ও ধর্ম্মভাবে কাল যাপন করিতে হইবে বলিয়া উন্নতমনা আর্য্য ঋষিগণ গর্ভবতী স্ত্রীলোকদের পঞ্চামৃত, ভাজা ও সাধ ভক্ষণের সুন্দর নিয়ম সকল সংস্থাপন করিয়া গিয়াছেন। শুভদিনে এই সমস্ত কার্য্য আর্য্যগণ নির্ব্বাহ করিতেন। এই সময় অনেক সংগৃহস্থের বাটীতে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ চণ্ডীপাঠ করিয়া থাকেন।

সূতিকা গৃহটী প্রশস্ত অতি শুষ্ক খট্‌খটে পরিষ্কার হওয়া উচিত। তাহার চারিদিকে বিশুদ্ধ বায়ু সঞ্চালনের পথ অর্থাৎ গবাক্ষ রাখিতে হইবে। ঈশ্বর অর্চনা পূর্ব্বক মাহেন্দ্রক্ষণে এই

গৃহে আসিয়া গর্ভিণী পুত্র প্রসব করিবেন। সদ্য প্রসূত পুত্রের নাড়ী চেঁচাড়ী দ্বারা না কাটিয়া কাঁচিদ্বারা কাটিতে হইবে। চেঁচাড়িতে নাড়ী কর্ত্তন করণ হেতু অনেক সন্তান ধনুষ্টঙ্কার পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে। পুত্র প্রসবান্তে প্রসূতিকে অতি সাবধানে থাকিয়া আত্ম রক্ষা ও পুত্র রক্ষা করিতে হইবে। এ সময় অসাবধানে থাকিয়া অনেক মাতা সূতিকা পীড়ায় পীড়িত হইয়া দেহত্যাগ করেন। আর এই কারণেই অনেক শিশু সূতিকাগৃহে এবং পাঁচ বৎসর বয়সের মধ্যেই লীলা সম্বরণ করিয়া থাকে। শিশুর খাদ্য দুগ্ধ—মাতৃদুগ্ধই প্রশস্ত। কিন্তু মাতা পীড়িত হইলে অথবা কোন কারণে তাঁহার দুগ্ধ বিকৃত কি বিষবৎ হইয়া উঠিলে উচ্চ কুলোদ্ভব উচ্চমনা সুস্থ শরীর বিশিষ্ট ধার্ম্মিক স্ত্রীলোকের স্তনপান কিম্বা গো-দুগ্ধ পান করিতে দিতে হইবে। কিন্তু এখন গোদুগ্ধও বড় বিশুদ্ধ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। ফুঁকা দেওয়া দুগ্ধাদি অতি অস্বাস্থ্যকর। কি ইয়োরোপীয় কি দেশীয় ধনী স্ত্রীলোক মাত্রেই আপন আপন শিশু সন্তানগণকে নিজ নিজ স্তনপান করান না। তাঁহারা দাই রাখিয়া তাহাদের মাই সন্তান সন্ততীকে খাইতে দেন। ইহা অত্যন্ত অনিষ্ট জনক। আমরা কি পূর্ব্বে বলি নাই যে, খাদ্য হইতেই রক্ত উৎপন্ন হয় এবং রক্ত হইতে শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক ভাব সকল সংগঠিত হইয়া থাকে? দাই সকল সচরাচর অশিক্ষিত, দুঃখী, অজ্ঞান ও হীনবীর্য্যজাত ইতর জাতীয় লোক। তাহাদের বুদ্ধি ও মানসিক ভাব সকল অতি নিকৃষ্টতম। বিশেষতঃ ইহাদের মধ্যে অনেকে আবার ব্যভিচারিণী, কেহ কেহ বা অন্তঃশিলা রোগগ্রস্তা। ইহাদের স্তন্যদুগ্ধ পান করিলে ইহাদের মত বুদ্ধি ও স্বভাব চরিত্র হয় সন্দেহ নাই।

রোমীয় সম্রাট কালীগুলা বাল্যকালে ধাত্রির স্তন্যদুগ্ধ পান করিতেন। তিনি সর্ব্বদা দুগ্ধ পান করিতেন না বলিয়া ধাত্রী নিজ স্তনে রক্ত লেপন করিয়া তাঁহার সম্মুখে ধরিত। লাস্রস্তন দেখিলেই তিনি তাহা তৎক্ষণাৎ পান করিতেন। শেষকালে সেই কালীগুলার বুদ্ধি শুদ্ধি ঐ ধাত্রীর মতই হইল এবং রক্তপান নিবন্ধন যৌবনকালে তিনি এতদূর নির্দ্দয় নিষ্ঠুর হিংস্রক ও উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করিলেন যে, তিনি একদা বলিয়াছিলেন যে, "পৃথিবীর সমস্ত লোকের যদি একটী মাথা হইত, তবে আমি তাহা এক কোপে কাটিয়া তৃপ্তিলাভ করিতাম।

বাল্যবিবাহের দোষ গুণ * আমরা বর্ণনা করিলাম, কিন্তু কেহ কেহ বাল্যবিবাহের সকলই দোষ বলিয়া ঘোষণা করিয়া থাকেন, সেটী তাঁহাদের একদেশদর্শীতা বৈ আর কি বলা যায়? বাল্যকালে কন্যার বিবাহ দিলে পিতামাতার কন্যাদানের ফল হয়, সে মহাফল তাঁহারা পরিত্যাগই বা করিবেন কেন? কন্যা আত্মজা, এজন্য কন্যাদানে আত্মদানের ফল হয়। "বর" শব্দে শ্রেষ্ঠকে বুঝায়, সুতরাং শ্রেষ্ঠ বংশের শ্রেষ্ঠ পাত্রে কন্যা-দান কর্ত্তব্য। কন্যাকে বিদ্যাবতী ও গুণবতী করিয়া যথাসাধ্য রত্নালঙ্কারে বিভূষিতা করতঃ বরণীয় দ্রব্য ও দক্ষিণাসহ প্রাত্রস্থ করিবে। বিবাহ ছলে কন্যাপুত্র বিক্রয় করিলে নিরয়গামী হইতে হয়। বরকর্ত্তা কুলমর্য্যাদা বলিয়া কন্যা কর্ত্তার কাছে কিছু গ্রহণ করিতে পারেন বটে, কিন্তু মহর্ষি বশিষ্ঠ বলেন তাহাও ক্ষমা করিলে পুণ্য আছে। আজকাল অনেক বরকর্ত্তা কসাই-বৎ ব্যবহার পূর্ব্বক কন্যাকর্ত্তার সর্ব্বনাশ করিয়া কুল মর্য্যাদা রক্ষা করিতেছেন।

* যৌবনরত্ন বা যুবকযুবতী দেখুন।

পিতা মাতার হাতেই পুত্র কন্যার বিবাহের ভার থাকা ভাল। যুবক যুবতী নিজে পাত্র পাত্রী মনোনীত করিয়া বিবাহ করিলে, তাহারা হয় ত কেবল রূপ দেখিয়াই বিমোহিত ও অন্ধ হইবে, দোষ গুণ দেখিবার চক্ষু আর থাকিবে না। তারপর যখন উভয়ের দোষাদোষ প্রকাশ পাইবে, তখনি বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িবে। হিন্দু ভর্ত্তা ভার্য্যা এক অঙ্গ। অনন্ত কাল পর্য্যন্ত ইহাঁদের আধ্যাত্মিক সম্বন্ধ। ইহা আর কথনই ছিন্ন হইবার যো নাই। স্বামী মরিলে সতী স্ত্রী পতিকে বাঁচাইয়া লন, কিম্বা সহমৃতা যান, না হয় ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া থাকেন। সাবিত্রী বেহুলা প্রভৃতি সতীত্ববলে মৃতপতির প্রাণদান করিয়াছিলেন। আর সত্যযুগ হইতে সে দিন পর্য্যন্ত লক্ষ লক্ষ সতী স্ত্রী সহমৃতা হইয়াছেন। রামমোহন রায় গবর্ণমেণ্টের সাহায্যে এই সহমরণ নিবারণ করিয়া সতীভাবের তিরোভাব করিয়া গিয়াছেন। কোন কোন অসতী নারী সতীযশ লাভার্থিনী হইয়া মৃত পতির চিতানলে দগ্ধীভূতা হইয়াছে সত্য, কাহাকে কাহাকে বা টানিয়া আনিয়া নির্দ্দয়রূপেও পোড়ান হইয়াছে, তাহা বলিয়া সুরদুর্লভ সতীধর্ম্ম লোপ করায় রায়জীর লঘুচিত্তের পরিচয় হইতেছে। সহমরণ বারণ অবধি সতীতেজ লুপ্ত হইয়াছে। হিন্দুদের সতীত্ব রূপ পরমধর্ম্মে ভয়ানক আঘাত দেওয়া হইয়াছে।

যাহা হউক, এখনও এ ঘোর কলিকালে পাশ্চাত্য সভ্যতারূপ মেঘাবরণেও সতীতেজ একেবারে আচ্ছাদিত হয় নাই। জনাই নিবাসী রামনারায়ণ মুখোপাধ্যায়ের বাটীর একটী বিধবা ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া পরম যোগসাধন করিয়াছেন। মহারাণী শরৎসুন্দরী দেবী বিধবা হইয়া অতুল ভোগসুখ পরিত্যাগ করিয়া

ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়াছিলেন। কলিকাতাস্থ প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারীর বিধবা পত্নী এবং চণ্ডীচরণ নিয়োগীর বিধবা স্ত্রী কঠোর ব্রহ্মচর্য্য ব্রত ধারণ করিয়াছেন।

কোন কোন সাম্যবাদী ভায়ারা বলিবেন, স্ত্রী মরিলে, স্বামী যখন পুনরায় দার পরিগ্রহ করেন, তখন পতি প্রাণ পরিত্যাগ করিলে বিধবাপত্নী পুনঃ পতি গ্রহণ করিতে পারিবে না কেন? যাহারা কুলকামিনিদের সতীত্বসৌরভ বুঝিতে নির্ব্বোধ, তাহাদের সঙ্গে বৃথা বাকৃবিতণ্ডা ও অনর্থক তর্ক করিয়া কোন ফল নাই।

সঙ্গদোষেই সর্ব্বনাশ হয়। এই জন্য আমরা কুসঙ্গকে বিষবৎ জ্ঞান করি। অধুনা হিন্দু-সমাজে বিশেষতঃ কলিকাতায় হিন্দুদের অন্তঃপুরে বেশ্যা সংসর্গ দোষটা বড় বেশী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। হিন্দুদের বিবাহবাসরে রাত্রিকালে বাসর ঘরের মধ্যে গিয়া বেশ্যারা নূতন বরের সহিত আমোদ প্রমোদ ও নৃত্য, গীত, বাদ্যাদি করিয়া থাকে, কিছু কিছু মদ্যও চলে। এই বার সদ্য সদ্যই সমাজের হৃদ্দ শ্রীবৃদ্ধি হইবে!!

পূর্ব্বে হিন্দুসমাজের বিশেষ শাসন ছিল, তখন কোন কুলকামিনী ব্যভিচারিণী হইলে সমাজ তাহাকে একেবারে পরিত্যাগ করিতেন। ব্যভিচারিণীর ছায়া পর্য্যন্ত স্পর্শ করিলে স্নান করিতেন। সেই সমাজেই আজকাল ব্যভিচারিণীর পূজা হইতেছে। ফলতঃ এখন সামাজিক শাসন শিথিল ভাব ধারণ করায় অনেক কুলটা স্ত্রী সমাজ মধ্যে আছে। অনেক বিধবা ব্যভিচারিণী ভ্রূণ হত্যা করিতেছে। তজ্জন্য অনেকে বিধবার বিবাহ দিতে ব্যাগ্র হইয়াছেন। ব্যভিচার ও ভ্রূণ হত্যা বারণ করা আবশ্যক বটে, বিধবার বিবাহ দিলে কি তাহা

রহিত হইবে? তা যদি হইত, তবে বিধবাবিবাহ প্রচলিত বিলাত দেশে বহুল পরিমাণে ভ্রূণ হত্যা হইত না। তথায় ব্যভিচারিণীদের গর্ভমোচনের বা জারজসন্তান নিক্ষেপের স্বতন্ত্র স্থান নির্দ্দিষ্ট থাকিত না। হিন্দুদের সকলি গিয়াছে, আছে একটু "সতীত্বধন"। বিধবাবিবাহ প্রচলিত হইলে এই পরমরত্নটুকুও একেবারে চলিয়া যাইবে। বেশ্যা শাসন কর, ব্যভিচার ভ্রূণহত্যা আপনা হইতেই নিবারিত হইবে। মদের দোকান বন্ধ করিয়া দাও, একটীও মাতাল দেখিতে পাইবে না।

নূতন আমদানী বেশ্যারা যে পুরুষদের দোষেই ভ্রষ্টা হইয়া নষ্ট দুষ্টা হইয়াছে, তাহা গুপ্তগৃহের স্থানে স্থানে প্রকাশিত আছে। নিম্ব স্বভাবতিক্ত, এজন্য উহা খাইতে ইচ্ছা জন্মে, এবং নিম্ব সেবনে উপকারও আছে। কিন্তু স্বভাব মিষ্ট—সন্দেশ তিক্ত হইলে তাহা ভক্ষণ করা দূরে থাক, তাহার দুর্গন্ধে বমি হইতে থাকে। তদ্রূপ স্বভাবতঃ মধুর প্রকৃতি স্ত্রীজাতি বিকৃত ভাব প্রাপ্ত হইলে কি ভয়ানকই হইয়া উঠে!! কত কুলটাই যে উপপতির তুষ্টি সম্পাদনার্থে নিষ্ঠুর রূপে পিতৃ মাতৃ, শ্বশুর শাশুড়ী, পুত্র কন্যা ও পতি প্রভৃতি হত্যা করিয়াছে, তাহার আর ইয়ত্তা নাই। কত দুষ্ট যুবা প্রলোভনাদি দ্বারা গৃহস্থ যুবতীদিগকে কুলের বাহির করিয়া আনিয়া সাক্ষাৎ নরক স্বরূপ বেশ্যাগারে পূরিয়া কতই না দুর্গতি করিতেছে! যৌবনরত্ন বা যুবকযুবতী নামক পুস্তকে তদ্বিস্তারিত লিখিত হইয়াছে।

চতুর্থ অধ্যায় ।

হিন্দু মহিলা তথা জাতীয় অবনতি ।

কলির নামে অধর্ম্মের জয় জয়কার বলিয়া হরিবোল দিয়া আমরা এই প্রস্তাবের সূত্রপাত করি। পাতাল পুরিতে বলি রাজার দ্বার দেশে কলি মেষবেশে বদ্ধ ছিলেন। দ্বাপর যুগাবসানে রাজা যুধিষ্ঠির তাঁহাকে মুক্ত করিয়া দেন। মেষরূপী কলি চতুষ্পদ্। তাঁহার একটী পদ ধর্ম্ম, এবং আর তিনটী পদ অধর্ম্ম। সেই অধর্ম্ম পদ তিনটী এই—মিথ্যা কথা, আধুনিক সভ্যতা * ও ধনীর আদর। এই জন্য আর্য্য জ্যোতির্ব্বিদ্ পণ্ডিতগণ ও ঋষিবর্গ কলিতে এক পাদ ধর্ম্ম ও ত্রিপাদ অধর্ম্ম বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। মিথ্যাকথাকে সভ্যতার সহিত একত্রিত করিতে না পারিলে, অধুনা এ সংসারে কোন কাজই পাওয়া যায় না, এমন কি উদরান্ন আহরণ করিতে পারা যায় না। যদি তুমি ভাল মানুষ হও এবং সত্যপথে চল, তবে এখনকার জুয়াচুরির

* ঈশ্বর প্রীতি, বিশ্বাস, ভক্তি, গুরুমর্য্যাদা, সত্য, সরলতা দয়া, ন্যায়পরতা, পরোপকারিতা এবং বিনয় নম্রতাদিগুণকে প্রকৃত সভ্যতা বলা যায়। কিন্তু আধুনিক সভ্যতা ইহার বিপরীত। কলির সকলই উল্টা ব্যাপার!! এখন ধনী, ইংরাজীজ্ঞানী ও পরিষ্কার পরিচ্ছদধারী হইলেই সভ্য হওয়া যায়।

বাজারে কোন ব্যবসায়াদি দ্বারা অর্থোপার্জ্জন পূর্ব্বক পরিবার পালন-করা দূরে থাকু, তুমি আপন উদর পোষণেও সক্ষম হইবে না। ঋণগ্রস্ত দায়গ্রস্ত হইয়া ব্যতীব্যস্ত হইয়া পড়িবে। আর দরিদ্র হইলে ত কথাই নাই, তখন তোমার সহিত অন্য পরে কা কথা, তোমার জ্ঞাতি কুটুম্ব ও আত্মীয় বন্ধু বান্ধব কেহই বাক্যালাপও করিবে না। সকলে মিলিয়া তোমাকে দুঃখী অসভ্য বলিয়া মনুষ্যত্ব হইতে ও সংসার হইতে একেবারে বাহির করিয়া দিবে, তোমার মুখ আর দেখিবে না। তখন তুমি আপন আত্মীয়ের নিকট কিছু ধার চাহিলেও পাইবে না, তুমি খাইতে না পাইলে ও রোগে ভুগিতে থাকিলেও তোমার আপনার লোক কেহই তোমার মুখ পানেও চাহিবে না। আর তুমি নানা লোকের নিকট ঋণগ্রস্ত থাকিলেও যদি আপন আত্মীয় লোকের কিছু ধার, তাহা হইলে সর্ব্বাগ্রেই যেরূপে পারুক সে তোমার নিকট হইতে তাহা আদায় করিয়া লইবেই লইবে। ফলতঃ ভিক্ষা করিতে গেলে তোমাকে কেহই গ্রাহ্য করিবে না, হয় ত অনেক তিরস্কার করিয়া এক মুষ্টি চাল্য অথবা কেহ কেহ কখন কখন দুই একটী পয়সা প্রদান করিবে মাত্র। আর দুঃখী অসভ্য হইয়া ক্ষুধায় আকুল হওতঃ চুরি আদি করিলে তৎক্ষণাৎ কারাগারে নীত হইবে। কিন্তু যদি আমি কারবার করিব বলিয়া সভ্যতা মিশ্রিত করিয়া ধার চাও, তাহা হইলে যে সে তোমাকে বিপুল অর্থ দান করিবে। তার পর তুমি লক্ষ মুদ্রা সংগ্রহ পূর্ব্বক আত্মসাৎ করতঃ মহাজনগণকে নৈরাশ করিবার বাসনায় কেবল গভর্ণমেণ্টকে কিঞ্চিৎ সেলামী দিয়া যোত্রহীন আদালতের আশ্রয়

গ্রহণ করিতে পারিলেই আর তোমার কোন দায় নাই স্বচ্ছন্দে সুখ ভোগ করিতে পারিবে।

সভ্যতার সহিত ভিক্ষা প্রার্থনা কর, অমনি সসম্মানে প্রচুর ধন প্রাপ্ত হইবে। আর সভ্যতার সহিত চুরি ডাকাতি করিতে পারিলে, তোমাকে কারাগারে দেয় কে? তুমি তখন রাজ সম্মান লাভ করিবে। কেহ কেহ দেশহিতৈষিতার ভাণ করিয়া সভ্যতাবরণে ভিক্ষাদ্বারা যথেষ্ট অর্থ সংগ্রহ করতঃ সুখে আছেন। এবং অনেক ধনী লোক, হয় তাঁহারা নিজে, না হয় তাঁহাদের পিতা পিতামহ প্রভৃতি কমিসরিএট আফিস, পবলিক ওয়ার্কস্ ডিপার্টমেণ্ট, নেমকমহল বা কোন সওদাগরী কি জমিদারী সরকারে অথবা অন্যান্য আফিষে চাকরী আদি করিয়া বিশ্বাসঘাতকতা পূর্ব্বক উৎকোচ গ্রহণ অথবা চুরী করতঃ বিপুল অর্থ সঞ্চয় করিয়াছেন। একবার চুরি করিয়া বা বিশ্বাসঘাতকতা দ্বারা কিম্বা ইন্সলভেণ্ট লইয়া কিছু থোক মারিতে পারিলে কোনই ভাবনা থাকে না। মজা করিয়া সাত পুরুষ পর্য্যন্ত ঠ্যাঙের উপর ঠেং দিয়া গাড়ী ঘোড়া চড়িয়া সুখে কাল কাটান যায়। আজ কাল যত বড়মানুষ দেখিতে পাও, তাহার অধিকাংশই এইরূপ। কলিকাতায় ভদ্রবেশধারী কতকগুলি জুয়াচোর আছে, ইহারা পকেট মারিয়া খায়, রেলগাড়িতে চড়িয়া নানা স্থানে যায়। ইহারা সোণা রূপা হীরাদি যাহা কিছু চুরি করিয়া আনে, তৎসমস্ত কলিকাতাস্থ অনেক সোণা রূপার দোকানে ও স্বর্ণকারের দোকানে বিক্রী করিয়া থাকে। চোরামাল কিনিয়া অনেক স্বর্ণকার ও সোণা রূপার দোকানদার ধনী হইয়াছে। কলির সকলি উল্টা বিচার ও উলটা ধারা! গবর্ণমেণ্টের ছোট

খাট কৰ্ম্মচারিরা যাহারা ৮।১০।১২।১৬ কি, ২০ টাকা বেতন পায়, সেই স্বল্প বেতনে তাহাদের সংসার চলাই ভার! বৃদ্ধ বয়সে কৰ্ম্মে অক্ষম হইলে, তাহারা আর খাইতে পায় না। এরূপ কৰ্ম্মচারি অনেকে বৃদ্ধদশায় ভিক্ষা করিয়া খায়। সভ্য গবর্ণমেণ্ট ইহাদিগকে পেন্সন দেন না। কিন্তু যাঁহারা একশত, দুইশত, পাঁচশত, হাজার, দুই হাজার, পাঁচ হাজার টাকা বেতন পান, যাঁহারা ঐ মোটা বেতনে ২০।২৫ বৎসর কৰ্ম্ম করিয়া তালুক মুলুক কোম্পানীর কাগজাদি বিলক্ষণ বিষয় করেন, যাঁহাদের চৌদ্দপুরুষ পর্য্যন্ত ঐ বিষয়ের উপস্বত্বে গাড়ী ঘোড়া চড়িয়া সুখ-স্বচ্ছন্দে কালযাপন করিতে পারেন, গবর্ণমেণ্টের এরূপ কৰ্ম্ম-চারিরা বৃদ্ধকালে কি খাইয়া জীবন ধারণ করিবেন, দয়াল গবর্ণ-মেণ্ট সেই ভাবনায় তাঁহাদিগকে মোটা মোটা পেন্সন দিয়া থাকেন।

'ধনির মাথায় ধর ছাতি, নির্ধনের মাথায় মার লাথি।'

গীত।

সতের আদর ঘুচে গেল- ধনীর মান্য বড় রে।
গোগ্‌না কেন হাড়ি শুঁড়ি মুচি মেথর ডোম রে।
গুণী বুনেদী ঢাকা গেল, সভ্যচোরের সুনাম ভেল,
ঋণে মাথা বেচা বোঁচা গাড়ী ঘোড়া চড়ে রে।
ভিতরেতে অষ্টরম্ভা, বাহিরেতে কোঁচা লম্বা,
দাড়ী লম্বা, চেনা দায় হিন্দু মুসলমান রে।
মাতা, সতী লাথি খায়, পাপে ভূত ভেগে যায়,
কুলটা বাহবা পায়, সভ্য ভূমণ্ডলে রে।
দেশের লোক পায়না খেতে, খিচুড়ী যায় বিলাতে,
কত দেখ্‌ব কলিতে, আর কিছুদিন বাঁচলে রে।

সভ্যতার সহিত চুরী চামারী * করিতে না পারিলে ও মিথ্যা কথা বলিয়া লোক জনকে না ঠকাইলে যদি এ সংসারে ভাল মানুষের অন্ন না হয়, তবে এমন অধর্ম্মের সংসার শীঘ্র দগ্ধ হইয়া গেলেই ভাল হয়। একজন ধর্ম্মভীরু দরিদ্র সৎলোক, তাঁহার পরিচিত কোন ব্যক্তির দোকানে গিয়া বলিলেন, "মহাশয়! আমি এখন নিষ্কর্ম্মে থাকিয়া বড় দৈন্যদশায় পতিত হইয়াছি। আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে একমণ চাল্য ধার দিন, আমার কর্ম্ম হইলে পর আমি আপনার ঋণ পরিষ্কার করিব।" দোকানী কোন কথা কহিল না, চাল্যও ধারে দিল না। কিন্তু আর এক জন মিথ্যাবাদী প্রবঞ্চক সেই দোকানে আসিয়া বলিল, "দেড় মণ চাল্য দাও কল্য টাকা দিব।" দোকানদার তৎক্ষণাৎ তাহাকে তাহার প্রার্থিত তণ্ডুল ধারে বিক্রী করিল, কিন্তু তিন বৎসর মধ্যেও টাকা পাইল না। এইরূপে সত্যবাদীর পরাজয় ও মিথ্যাবাদীর জয়জয়কার হয়। কি পুস্তক বিক্রেতা, কি বস্ত্র বিক্রেতা, কি ঔষধ বিক্রেতা, কি ঘৃতাদি বিক্রেতা সকল প্রকার ব্যবসাদার মহলে মিথ্যা কথা ও কৃত্রিমতার এত বহুল প্রচার হইয়া পড়িয়াছে যে, এক্ষণে সহসা আর কাহারও কথায় বিশ্বাস স্থাপন করা যায় না, এবং অকৃত্রিম দ্রব্য প্রায়ই পাওয়া যায় না। মৃত গো, শূকর, কুকুর, বিড়াল গর্দ্দভ প্রভৃতির দুর্গন্ধময় গলিত মাংস দ্বারা প্রস্তুতীকৃত ঘৃণার জনক ধর্ম্মনাশক চর্ব্বি মিশ্রিত করিয়া এমন দেবদুর্লভ অতি উপাদেয় পবিত্র খাদ্য দ্রব্য ঘৃতকে বিষ্ঠার অধম করিয়া দ্বিপদ নরপশুগণ যে কত মহাপাতকের কার্য্য করিয়াছে ও করিতেছে, তাহা শতমুখেও বলিয়া শেষ করা যায় না।

* চাম শব্দে চামড়াকে বুঝায়। গণিকারা চামের ব্যবসায় করে বলিয়া বেশ্যাবৃত্তিকে চামারী বলা যায়।

কবিরাজ ও ডাক্তারগণের মধ্যে কয়েক জন ব্যতীত আর সকলেই নিষ্ঠুর ও যম কিঙ্কর। বিশেষতঃ ডাক্তারদের অনেকেরই দয়া মায়া নাই। একজন ডাক্তার কোন গৃহস্থের বাটীতে রোগী দেখিতে আসিয়া দর্শনী দুইমুদ্রা চান। গৃহিণী কহিল, কল্য দিব, তাহাতে ডাক্তারবাবু রাগভরে বলিলেন, কাল তুই কাঁদ্‌বি, না আমায় টাকা দিবি!! কি পাপ সব হইয়াছে,—কিছুই বলা যায় না। পূর্ব্বে কোন গরীব গৃহস্থের বাটীতে কাহারও পীড়া হইলে, কবিরাজ নিত্য দুইবেলা আসিয়া দেখিয়া শুনিয়া ঔষধ প্রদান করিতেন এবং ১৫।১৬ দিনের মধ্যে রোগীকে উত্তমরূপে আরোগ্য করতঃ স্নান আহার করাইয়া অর্দ্ধ মুদ্রা লইয়া বিদায় হইতেন। এখন মধ্যবিত্ত কোন গৃহস্থ বাড়ীতে রোগী দেখিতে ডাক্তার ২।৪ বার যাতায়াত করিলে সে গৃহস্থের যথাসর্ব্বস্বই যায়।

উকিল মোক্তার বারিষ্টারেরা দেশের কণ্টক। যদি দয়াশীল ধর্ম্মভীরু, সুশিক্ষিত বৈদ্য ও ডাক্তার থাকেন, তবে তাঁহারা অলঙ্কার এবং বাপের ঠাকুর বলিয়া তাঁহাদের পাদপদ্মে কোটী কোটী নমস্কার। তদ্ভিন্ন ডাক্তার, কবিরাজ, উকীল, মোক্তার ও বারিষ্টারদের অন্ন না হইলেই আমরা যথেষ্ট সন্তুষ্ট হই।—যখন দেখিব, বেশ্যারা আপনাদের কুবৃত্তি দ্বারা অন্ন সংস্থান করিতে না পারিয়া বেশ্যাবৃত্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্য কোন দুঃখ মেহনত দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহে প্রবৃত্ত হইয়াছে, যে দিন দেখিব ডাক্তার ও কবিরাজেরা হা অন্ন হা অন্ন করিয়া ভ্রমণ করিতেছে, যেদিন দেখিব উকীল মোক্তার ও বারিষ্টারগণ অন্নবিনা হাহাকার করিতেছে, সেই দিন—সেই শুভদিনে জানিব যে, আমাদের দেশের অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হইয়াছে। তখনই জানিব যে,

এতদিনের পর দেশে শান্তি বিরাজিত হইল। তখনই জানিব যে, এত দিনের পর দেশ হইতে পাপ, তাপ, রোগ, শোক ও বিবাদ বিসম্বাদ এককালে দূরীকৃত হইল।

মেথর মোর্দ্দারফরাষ নীচজাতি হইলেও তাহারা আবার ধোবাকে হেয় জ্ঞান করে। কিন্তু বেশ্যারা যে সর্ব্বাপেক্ষা হীন জাতি ইহা সর্ব্ববাদী সম্মত। কেননা মেথর, মোর্দ্দারফরাষ ও ধোবারা জাতি গোপন করিয়া সুপরিচ্ছদধারী হইয়া আসিলেই বেশ্যারা তাহাদিগকে স্থান দিয়া থাকে।

ব্যবহারাজীব অর্থাৎ ওকালতি ব্যবসায়ও অতি ঘৃণিত বলিয়া ভদ্রলোকের তাহা ত্যাগ করিয়া কৃষি বাণিজ্যাদি কার্য্যে নিযুক্ত হওয়া উচিত। যে কৃষকের প্রসাদে আমাদের জীবন রক্ষা হয়, তাহা অতি সম্মানীয় ও পূজ্যপদ তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ওকালতি কাজটা যে সম্মানবোধক নহে, "উকিল আমার পতি কিল খাইতে দড়।" ভারতচন্দ্রের এই বচনেই জানা যাইতেছে।

আমাদের দেশের লোকগুলা কুড়ের বাদশা। ইহারা শ্রম-সাধ্য আয়াসকর কোন কর্ম্মেই অগ্রসর হয় না; কেবল অনুকরণ করিয়া খায়। দাসত্ব, কোম্পানীর কাগজের সুদ, দোকানদারী, জুয়াচুরী ও ভিক্ষাবৃত্তিই ইহাদের জীবন সম্বল। আমাদের দেশে আসিয়া ইংরাজ প্রভৃতি অনেকে বিস্তীর্ণ নানা দ্রব্যাদির বাণিজ্য করিয়া বিলক্ষণ ধনোপার্জ্জন করিতেছেন; আর দেশীয় লোকেরা ক্রমশই দরিদ্র হইতেছে। যাঁহারা বলেন ইংরাজ রাজত্বে আমাদের দেশের উন্নতি হইতেছে, তাঁহারা বিষম ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। ইংরাজ আগমনের পূর্ব্বে এ দেশে ভিখারিদেরও নিজের ঘর ছিল, কিন্তু এখন অনেক ধনীরই ঘর নাই, সকলেই ঋণী, তাঁহাদের বাহির চাকচিক্যই সার।

কেহ কেহ ৩০৲ টাকা মাসে বেতন পান, তাঁহাদের অনেকে ৮৷১০ টাকা দিয়া বাটী ভাড়া করিয়া থাকেন, একটী ঝিও রাখেন, কিন্তু পূর্ব্বকার লোকেরা লক্ষ টাকা সঞ্চয় না করিয়া গাড়ী ঘোড়া রাখিতেন না। তখন ইছাপুর হইতে বাগবাজা-রের ঘাটে নৌকাযোগে আগমন করিলে দুটী পয়সা মাত্র লাগিত, কিন্তু আমি একজনকে জানি, তিনি যখন কলিকাতায় আসিতেন, পয়সা দুটী বাঁচাইয়া ৮ ক্রোশ পথ হাঁটিয়া আসিতেন এবং পদব্রজেই বাটীতে প্রত্যাগমন করিতেন। এখনকার বাবুভায়ারা অর্দ্ধ পোয়া পথ চলিতে পারেন না, প্রত্যহ দুই আনা ব্যয় করিয়া ট্রামওয়ের শকটারোহণে গমনাগমন করিয়া থাকেন। বিপরীতকাণ্ডটা বড়ই বাড়াবাড়ি হইয়া উঠিল। সাক্ষাৎ নারায়ণ স্বরূপ ব্রাহ্মণগণ ম্লেচ্ছান্ন ভক্ষণ, মদ্যপান, যবনী-গমন করত আপনাদের দেবত্ব ও যজ্ঞসূত্র পরিত্যাগ করিতেছেন, আর অনেক কালের পতিত ও তামাদির তামাদি জুগি কি যোগী ভগবান জানেন, তাহারা পৈতা পরিতেছে! চণ্ডাল বা নমঃশূদ্র জাতীয় লোকেরাও আজকাল বিধান বাহির করিয়া পৈতার দাবি করিতেছে! এ সকল নীচলোক সামান্য বিদ্যা ও ধন-মদে মত্ত হইয়া অভিমান ভরে আপনাদিগকে উন্নত করিয়া তুলিতেছে। "যে আপনাকে উন্নত করে, তাহাকে নত করা যাইবে, এবং যে আপনাকে নত করে তাহাকে উন্নত করা যাইবে" এই মহা বাক্যটী বুঝি তাঁহাদের জানা না থাকিতে পারে।

"অর্দ্ধশতাব্দীরও অধিক হইল, পুনার পেশবা বংশধর মহারাজ অমৃত রাও কাশীধামে শিব, অন্নপূর্ণা এবং গণদেব এই তিনটী দেবমূর্ত্তির স্থাপনা ও মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন, এবং অতিথি ও ব্রাহ্মণের সেবার জন্য মন্দিরের সঙ্গে একটী মঠ বা সত্রও স্থাপিত

করিয়া দেন। তখন কোম্পানীর কাগজের ৬৲ টাকা সুদ ছিল। এই সুদে ২ লক্ষ টাকার কাগজে বৎসর ১২ হাজার টাকা আসিত। তাহাতেই দেব দেবী মঠ ও মন্দিরের কার্য্য চলিত। মহারাজ অমৃতরাও দেব সেবাদি কার্য্যের জন্য দুই লক্ষ টাকার কাগজ কিনিয়া ভারত গবর্ণমেণ্টের হাতে তাহার ভারার্পণ করিয়াছিলেন।

মহারাজ অমৃতরাও পরলোকগত হইবার পর, কাগজের সুদ ৪৲ টাকা করিয়া দিয়া ভারতগবর্ণমেণ্ট দেবসম্পত্তির আয় কমাইয়া দিলেন। বার হাজারের জায়গায় আট হাজার টাকা আয় দাঁড়াইল। তাহাতে দেবকার্য্য সম্পন্ন হয় না দেখিয়া, মৃত অমৃত রাওর পুত্র বিনায়ক রাও দুই লক্ষের উপর তিন লক্ষ দিয়া কাগজ কিনিয়া দিলেন। শতকরা ৫৲ টাকা সুদ, তিন লক্ষের সুদ ১৫ হাজার টাকা। দেবকার্য্য সুচারুরূপে চলিতে লাগিল।

মহারাজ বিনায়ক রাও বিগতজীবন হইলেন। দত্তকপুত্র মহারাজকুমার মধুরাও বালক। বালকের সম্পত্তি ভারত গবর্ণমেণ্টের আদেশে বঙ্গের এডমিনিষ্ট্রেটর জেনেরল বা সরকারী অছি মহাশয়ের হাতে পড়িল। দেবসম্পত্তিও তাঁহার হাতে গেল। ১৮৫৫ অব্দ পর্য্যন্ত কোন গোলযোগ ঘটিল না, কিন্তু ঐ সালে এডমিনিষ্ট্রেটর জেনেরল বাহাদুর দেবসম্পত্তি সেই কোম্পানীর কাগজের সুদ দেওয়া বন্ধ করিলেন। দেবার্থ কোন্ অর্থে নিয়োজিত হইল, তাহা দেবতারাই জানেন। অথচ বিনায়ক রাও নিজের উইলে স্পষ্ট করিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার প্রদত্ত তিন লক্ষ টাকা অন্য কোন কার্য্যেই কোনমতে নিয়োগ হইতে পারিবে না।

ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের হাতে গচ্ছিত দেবসম্পত্তির অপব্যবহার হইল, দেবদ্বিজের সেবা বন্ধ হইল দেখিয়া মহারাজ মধুরাও নিজের তহবিল হইতে তিন লক্ষ টাকার মত স্থদ পোষাইয়া দিতে লাগিলেন, দেবকার্য্যও একপ্রকার চলিতে লাগিল। ইংরাজের এতাদৃশ দুর্ব্যবহারে কিন্তু অস্থিরবুদ্ধি বালক মধুরাওর বুদ্ধি বিচলিত হইয়াছিল, তাহার উপর কুচক্রীদিগের কুপরামর্শ চলিতে লাগিল। ১৮৫৭ অব্দের বিদ্রোহানলে মধুরাওকে ঝাঁপ দিতে হইল। সেই অপরাধে তাঁহার যথাসর্ব্বস্ব ইংরাজের অধিকৃত হইল, সঙ্গে সঙ্গে দেবসম্পত্তিও ইংরাজসাৎ হইল। মধুরাওর পূর্ব্বপুরুষ দেবসেবার জন্য যে সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছিলেন, যাহা মহারাজ বিনায়ক রাওর উইল অনুসারে কাশীর দেবকার্য্য ছাড়া অন্য কোন কার্য্যে নিয়োজিত হইতে পারে না, যাহাতে মধুরাওর কোনরূপ স্বত্ব বা অধিকার ছিল না, যাহা অন্নপূর্ণা, শিবওগণদেবের সম্পত্তি, তাহা কোন্ বিচারে সিপাহিবিদ্রোহের পূর্ব্বে বাজেআপ্ত হইয়াছিল, কোন্ বিচারেই বা বিপ্লবের পর তাহা ইংরাজ আত্মসাৎ করিলেন?

ইহাতে সমস্ত ভারত বিচলিত হইবে; হিন্দুরা মর্ম্মে আঘাত পাইবে; শিখ, জৈন, খৃষ্টান, মুসলমান সকলেই উদ্বিগ্ন হইবে; দেশীয় রাজ্যের রাজারা পর্য্যন্ত ভীত হইবেন; মহারাজ অমৃত রাও এবং বিনায়ক রাওর প্রতিষ্ঠিত দেবতার যে দশা ঘটিয়াছে সকলের প্রতিষ্ঠিত দেবতারই ত সেই দশা ঘটিতে পারে; হিন্দুর ধর্ম্মসম্পত্তি যেরূপ আঘাত পাইল, সকলের ধর্ম্মসম্পত্তিই ত সেইরূপ আঘাত পাইতে পারে। একটা গচ্ছিত সম্পত্তি ইংরাজরাজ যেরূপে আত্মসাৎ করিলেন, সকল গচ্ছিত সম্পত্তিই ত সেইরূপে আত্মসাৎ করিতে পারেন। ইচ্ছা হইলে অছিলার

অভাব হইতে পারে না, মথুরাও বিদ্রোহী হইয়াছিলেন, তাঁহার মুণ্ডপাত করিতে পার; তাঁহার পূর্ব্বপুরুষের প্রতিষ্ঠিত দেবতারা ত আর বিদ্রোহী হন নাই, তাঁহাদিগের উপর এরূপ অত্যাচার কেন?

প্রজাহৃদয়ের বিশ্বাস বিচলিত হইলে রাজার বড়ই অমঙ্গল, শুদ্ধ বিশ্বাসের উপরই রাজ্য চলিতেছে, প্রজারা ইংরাজরাজকে বিশ্বাস করিয়াই কোটি কোটি টাকা ধার দিয়াছে। একবার বিশ্বাস বিচলিত হউক দেখি, অমনই ইংরাজরাজকে শশব্যস্ত হইতে হইবে।"

১২৯৪।১৪ই পৌষ বুধবাসরীয় সহচর হইতে আমরা উপরোক্ত বিষয়টী উদ্ধৃত করতঃ পাঠকমহোদয়গণের চক্ষের সম্মুখে ধারণ করিলাম। অভিপ্রায় এই পাঠক মহাশয়েরা বুঝুন আমাদিগের কতদূর জাতীয় অবনতি হইয়াছে। তাঁহারা আরো বুঝুন ইংরাজ রাজ কেমন নীতি, ধর্ম্ম ও রাজনীতি পরায়ণ! রাজার যদি এইরূপ ব্যবহার হয়, তবে আমাদিগকে কি করিতে হইবে? আমাদিগের একতা না থাকায় গবর্ণমেণ্ট হিন্দুদিগকে মানুস জ্ঞানই করেন না! তাঁহারা মুসলমানদিগকে অপেক্ষাকৃত তেজস্বী ও ঐক্যমতাবলম্বী দেখিয়া মুসলমানদের কিঞ্চিৎ আদর করেন। আমরা যদি একটু তেজস্বী ও পরস্পর একতা-সূত্রে বদ্ধ হই, তাহা হইলে সাধ্য কি যে রাজপুরুষেরা হিন্দুর ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ করেন, বিশ্বাস ভঙ্গ করেন এবং সাধারণের অর্থের অপব্যয় করেন। প্রজার দুরবস্থার শেষ নাই, তথাপি বর্ষে বর্ষে রাজপ্রতিনিধি সাধারণের বিপুল অর্থ দ্বারা সিমলাশৈলে স্বীয় বিলাস বাসনা চরিতার্থ করিতে-ছেন! গোটাকত লোকের চীৎকারে গবর্ণমেণ্ট দৃকপাতও

করেন না! আমরা শান্তিপ্রিয় রাজভক্ত নীরিহ প্রজা, রাজাকে ঈশ্বর সদৃশ ভক্তি ও পূজা করিয়া থাকি। কিন্তু রাজা আমাদের অভিলাষ পূর্ণ করেন না! এজন্য আইস ভারতবাসি সকলে আমরা একত্র মিলিয়া আহার, বিহার, নিদ্রা ও বিষয় কর্ম্ম সকলই পরিত্যাগ করিয়া অন্ততঃ ত্রিরাত্রি ধন্না দিই। ধন্নার ফল অবশ্যই প্রাপ্ত হইব সন্দেহ নাই। যদি একান্তই সকলে ঐক্য হইয়া ধন্না দিতে না পার, তবে সকলে কোম্পানীর কাগজ বিক্রয় করিয়া সুবৃহৎ এক মূলধন লইয়া সুবিস্তীর্ণ বাণিজ্যাদি দ্বারা স্বদেশের উন্নতি সাধন কর। সেই বাণিজ্যাদি কার্য্যে দেশের অনেক দীনলোক প্রতিপালিত হইতে পারিবে। হয় ত ঈশ্বরের ইচ্ছা হইলে ইংরাজেরা যেমন বাণিজ্য করিতে এ দেশে আসিয়া রাজা হইয়া বসিয়াছেন, তেমনি তোমরাও রাজা হইতে পার, তাহারই বা অসম্ভাবনা কি আছে?

ইংরাজেরা নানা বিষয়ে আমাদের ক্ষমতা হ্রাস ও অর্থবল বিনাশ করিতেছেন, এমন কি ভারতবর্ষীয় স্বাধীন রাজা দিগকেও ক্রমে ক্রমে হীনবল করিয়া তুলিলেন। আবার ঐ সকল স্বাধীন রাজ্যে গোদের উপর বিষফোড়া গোচ ইংরাজ এজেণ্ট রাখিয়া বিষম অসুখের কারণ হইতেছেন! বসিতে পাইয়া ত শোবার জায়গা করিয়া লইলে, আবার শুয়ে প'ড়ে যে মাথায় পা দিতে হয়, তা ত জানি না।

আমরা বরাবর বলিয়া আসিতেছি যে, এই পৃথিবীতে ভালর ভাগ অতি অল্প, মন্দই অধিক, কিন্তু নারীর পবিত্র চরিত্র পৃথিবীতে যত অধিক দেখা যায়, মন্দ চরিত্র রমণী তত নাই। ইহাঁরা দয়া ধর্ম্ম শ্রদ্ধা ভক্তি স্নেহ মমতা বিনয় নম্রতা লজ্জা সরলতা সতী সাধ্বী পতিব্রতা ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা সকল গুণেরই আধার।

অভিমান ইহাদের নিকট আদৌ স্থান পায় না। ইহারা দাসী-দের সহিত একাসনে বসিয়া সখী ও ভগ্নীবং ব্যবহার করিয়া থাকেন। একজন ভদ্রলোক কিছুকাল সপরিবারে কলিকাতায় বাস করেন, তাঁহার সহিত প্রতিবাসী এক ব্যক্তিরও আলাপ পরিচয় হয় নাই। কিন্তু তাঁহার স্ত্রীর সঙ্গে তচ্চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী ভদ্র ভদ্র বড় বড় ধনী লোকের স্ত্রী কন্যার সহিত বিলক্ষণ প্রণয় পর্য্যন্তও হয়। অনেক বিধবা হিন্দু কুলবালা দাসীবৃত্তি কি ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক পিতৃহীন ৫।৭টী শিশু বালক বালি-কাকে প্রতিপালন করিয়া থাকেন, কিন্তু একটী মাতৃহীন শিশুকে প্রতিপালন করিতে পিতার মাথায় যেন বজ্রাঘাত পড়ে।

"সুকুমার শিশুর ন্যায় স্বচ্ছ এবং সরল মতি না হইলে কেহই স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ পথ পায় না।" ইহা বহুকাল ব্যাপিয়া প্রসিদ্ধ আছে। কিন্তু তোমার আত্মা যদি অধ্যাত্ম সম্পদের উচ্চতর রাজ্য অধিকার করিতে চাহে, তবে হৃদয়ে সর্ব্বদা নারী সদৃশ হও। নারীহৃদয়ে ঈশ্বরের প্রতি প্রীতি স্বভাবতই যেমন অতীব গাঢ়, মনুষ্যের প্রতি প্রীতিও স্বভাবতই তেমনি গভীর। নারীর হৃদয় প্রীতির প্রিয়নিবাস। প্রীতিতেই নারীজীবন, এবং নারী আশৈশব লোকান্তর চিরদিনই প্রীতির পুত্তলী। কিশোর বয়-সের প্রভাত কান্তি এবং প্রাচীন সময়ের সায়ন্তন শ্রী উভয়ই নারী হৃদয়ে সমান শোভা ধারণ করে। মনুষ্যাশ্রমের সর্ব্বত্রই আমাদিগের চক্ষু কর্ণ অঙ্গনাহৃদয়ের কোমলতার প্রচুর পরিচয় প্রাপ্ত হয়। মাতার অনির্ব্বচনীয় স্নেহ মমতার প্রতি একবার দৃষ্টিপাত কর। পুত্র কোথায় এমন কে আছে, যাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে অন্তরের সহিত এই রূপ উত্তর না দিবে যে, "মাতৃ

স্নেহের ঋণ জন্ম জন্মান্তরেও পরিশোধ করিতে পারিব না।”
মাতা যে রূপ অলৌকিক স্নেহ সহকারে সন্তানের লালন পালন করেন, তাহা স্মরণ করিলে কাহার না অন্তঃকরণ আর্দ্র হইয়া থাকে? কি সুখ এমন আছে, যাহা সন্তানের জন্য মাতা বিসর্জ্জন করিতে প্রস্তুত নহেন; কি কষ্ট এমন সম্ভবে, সন্তানের শুভার্থে মাতা যাহা স্বীকার করিতে চান না?

বঙ্গদেশের শেষ রাজা লক্ষ্মণ সেনের মাতা পুত্রবাৎসল্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। লক্ষ্মণ সেন যখন গর্ভে, তখন তাঁহার মাতার প্রসব বেদনা উপস্থিত হইলে, তিনি অত্যন্ত কাতর হন। রাজ দৈবজ্ঞ প্রভৃতি অনেক জ্যোতির্ব্বিদ্ পণ্ডিত শুভাশুভ সময় ও লগ্ন গণনায় প্রবৃত্ত হইলেন। পণ্ডিত-গণ গণিয়া স্থির করিলেন, “বর্ত্তমান সময় অতিশয় কুক্ষণ। এই কুক্ষণে সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে সন্তানকে যাবজ্জীবন অশেষ দুর্গতি ও যৎপরোনাস্তি ক্লেশ ভোগ করিতে হইবে। কিন্তু এক প্রহর পরে বিলক্ষণ শুভক্ষণ আছে, তখন পুত্রের জন্ম হইলে সুসন্তান হইবে এবং বিদ্বান, ধার্ম্মিক ও জ্ঞানবান হইয়া সুস্থশরীরে শত বৎসর জীবিত থাকিয়া নিষ্কণ্টকে বিপুল সুখ সৌভাগ্য ও সাম্রাজ্য সম্ভোগ করিতে পারিবেন। কিন্তু মাতৃহীন হইয়া ভূমিষ্ঠ হইবেন।” লক্ষ্মণের মাতা একথা শ্রবণ করিয়া যাহাতে উক্ত কু সময়ের মধ্যে অর্থাৎ তিন ঘণ্টার ভিতরে পুত্র প্রসব হইতে না পারে, তদর্থে তিনি দুঃসহ প্রসব ব্যথা সহ্য করিয়া থাকিতে অঙ্গীকার করিলেন। আর সহচরীগণকে তাঁহার চরণ দুখানি ধরিয়া ঊর্দ্ধদিকে উত্তোলন করিয়া রাখিতে কহিলেন। তাহাতে সহচরিরা তিনঘণ্টা পর্য্যন্ত রাণীর পদদ্বয় ঊর্দ্ধদিকে ধারণ করিয়া রহিল। রাজ্ঞী হেটমুণ্ডে ঝুলিতে থাকিলেন। এক প্রহর গত

হইলে পর সহচরীগণ রাণীর চরণ দুখানি ছাড়িয়া দিলে তৎক্ষণাৎ পুত্র ভূমিষ্ঠ হইল, কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় এই যে, এহেন মাতা আর জীবিত রহিলেন না! প্রাণাপেক্ষা প্রিয়পুত্রের মুখচন্দ্র নিরীক্ষণ করিয়া প্রাণ জুড়াইতে পারিলেন না। প্রসব বেদনার দারুণ যন্ত্রণা সহ্য করিতে করিতে পুত্র প্রসব করিয়াই প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন। মহারাজ লক্ষ্মণ সেন দীর্ঘজীবী ও অতুল সুখ সৌভাগ্যের অধিকারী হইলেও, তিনি যে সাক্ষাৎ ঈশ্বরী তুল্য এমন স্নেহময়ী জননীর শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করিতে পান নাই, কৃতজ্ঞ ও ভক্তি পরিপূরিত চিত্তে তাঁহার পদ সেবা করিয়া জন্মসার্থক করিতে পারেন নাই, ইহাপেক্ষা তাঁহার পক্ষে দুর্ভাগ্যের বিষয় আর কিছুই নাই।

পুত্রের মঙ্গলে মূর্ত্তিমতী প্রীতিময়ী মাতাই প্রাণত্যাগ করিতে পারেন, মাতার তুলনা আর কোথাও নাই। এ হেন মাতৃগণ আবার ধর্ম্মার্থে প্রাণাপেক্ষা প্রিয় সন্তান সকল পূর্ব্বে সাগর নীরে বিসর্জ্জন করিতেন। ধর্ম্মপ্রবৃত্তি হিন্দুমহিলাদের পুত্রস্নেহ হইতেও উচ্চতম।

স্নেহের এমনই আশ্চর্য্য লীলা! মাতার চক্ষে প্রাপ্তবয়স্ক বলিষ্ঠকায় বীরপুরুষও দুগ্ধের বালক। সন্তান সক্ষমই হউক, আর অক্ষমই হউক, মাতার নিকট সকল সময়েই সমান। মাতৃস্নেহের ক্ষয় নাই, পরিবর্ত্তন নাই, এবং ক্লান্তি নাই। রোগ, শোক দারিদ্র দুঃখের কথা ত সামান্য বিষয়। মনুষ্য স্বকীয় পাপাচরণ দ্বারা যখন মানব সমাজে কলঙ্কিত হয়, সহচর প্রতিবেশী আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব সকলেই যখন তাহাকে পরিত্যাগ করে, সহোদর সকলও যখন ঘৃণার চক্ষে অবলোকন করে; অধিক কি পিতাও যখন স্বকীয় আশ্রয়ে বঞ্চিত করেন এবং

পাপ বলিয়া তাহাকে স্পর্শ করিতে চান না। তখন মাতার স্নেহ পরাজিত হয় না। প্রতিপ বায়ুর সংঘাতে স্রোতস্বতীর তরঙ্গমালা যেমন স্ফীত হইয়া উঠে, সংসারের প্রতিকূলতায় মাতৃস্নেহও সেই রূপ উচ্ছ্বাসিত হয়। সন্তানের দোষরাশি মাতা দেখিয়াও দেখেন না, সন্তানের বর্ত্তমান নিন্দা এবং কলঙ্ক মাতার কর্ণে প্রবেশ পথই পায় না। তাহার শৈশব সময়ের সহাস্য সরল নয়ন এবং অকলঙ্কিত মুখচ্ছবিই তখন স্মৃতিপথে উদিত হইয়া মাতার হৃদয়কে পরিপুষ্ট করে। এবং সংসার সন্তানের যত কিছু নিন্দাবাদ প্রচার করে, তাঁহার নিকট সমুদয়ই অমূলক এবং অলীক বলিয়া উপেক্ষিত হয়। মাতা যখন স্বচক্ষে সন্তানের অপরাধ দর্শন করেন, সন্তানের প্রাকৃত অকৃতজ্ঞতা যখন বিষাক্ত কণ্টকের ন্যায় হৃদয়ে বিদ্ধ হইতে থাকে, তখনও দুর্ব্বাক্য এবং তিরস্কারে নয়, নিঃশব্দ অশ্রুধারা দ্বারা মাতার দুঃখ এবং ক্রোধ দ্রবীভূত হইয়া যায়। মনুষ্যত্বের সমুদয় লক্ষণ যাবৎ বিলুপ্ত না হইবে, মাতার এই অকৃত্রিম, অপরিমেয় এবং নিঃস্বার্থ স্নেহ গুণ স্মরণে মনুষ্য হৃদয় তাবৎ আপনিই বিগলিত হইয়া পড়িবে। অদ্যাপি ভারতবর্ষে মাতৃস্নেহের স্তুতি গীতি স্বরূপ মাতৃ ষোড়শী নামক মধুর কবিতাবলী গয়া নগরে উচ্চারিত হইয়া লৌহ চক্ষু হইতেও অশ্রুধারা আকর্ষণ এবং পৌত্তলিকতার ঘোরতর বিদ্বেষীকেও পরাভব করে।

নারী হৃদয়ের প্রীতি সকল সম্বন্ধেই অতুল। পুত্রের মুখে যেমন মাতৃস্নেহের দীর্ঘকাহিনী শ্রবণ করিবে। ভ্রাতার মুখে সেইরূপ ভগিনীর এবং পিতার মুখে দুহিতার সুস্নিগ্ধ মমতার ভূরি পরিচয় প্রাপ্ত হইবে। কন্যা যেরূপ হৃদগত যত্নের সহিত মাতা পিতার শুশ্রূষা করে, পুত্রে তাহার শতাংশের

একাংশও দৃষ্ট হয় না। লজ্জাবনত হৃদয়ে স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছি, মৃত্যু শয্যায় শয়ান পিতার সম্পদ্‌সম্মানের ভাবী উত্তরাধিকারী পুত্র নিশ্চিন্ত মনে নিদ্রার ক্রোড়ে বিশ্রাম সুখ সেবন করিয়াছেন, কিন্তু চিরদিনের উপেক্ষিতা দুহিতা তৃণ মুষ্টিরও প্রত্যাশা না রাখিয়া পিতার নির্ব্বাণোন্মুখচ্ছবির প্রতি স্বকীয় অশ্রুপূর্ণ নয়ন স্থির রাখিয়াই সমুদয় নিশি অতিবাহিত করিয়াছে। পুত্র পিণ্ড প্রদান পূর্ব্বক পিতা মাতা ও পিতৃমাতৃকুলকে পুন্নাম নরক হইতে উদ্ধার করে বলিয়া কেবল পুত্রগণই পিতামাতার ও অপুত্রক মাতামহ মাতামহীর বিষয়াধিকারী হইয়া থাকেন। যথা—"পিণ্ডং দত্ত্বা ধনং হরেৎ।" রাজা দশরথ প্রেতত্ব প্রাপ্ত হইয়া পুত্র পিণ্ড অপেক্ষা না করিয়া পুত্রবধূ সীতার নিকট হইতে বালির পিণ্ড চাহিয়া লইয়া উদ্ধার হইয়াছিলেন। এইরূপে অনেক ভূত উদ্ধার কামনায় গয়ায় পিণ্ড পাইতে প্রার্থনা করিয়া থাকে।

একব্যক্তি বরযাত্রী হইয়া বিবাহ দিতে দূরতর প্রদেশে গমন করে। বিবাহের পর রাত্রিকালে চিঁড়ে মুড়কী দধি আদি ভোজন করিয়া শেষ রাত্রে তাহার ওলাউঠার পীড়া হয় এবং পরদিন রাত্রি শেষে সে প্রাণত্যাগ করে। সেব্যক্তি ভূতযোনি প্রাপ্ত হইয়া উক্ত রাত্রেই আপন বাটীতে আসিয়া অলক্ষিত ভাবে থাকিয়া নিজ স্ত্রীকে এই কথা বলে যে "আমার মৃত্যু হইয়াছে আমি ভূতযোনি প্রাপ্ত হইয়াছি। ধানের জালার মধ্যে নেকড়ার পুটলী করিয়া ১৫টী টাকা রাখিয়াছি, তুমি তাহা লইয়া আমার শ্রাদ্ধাদি করিবে, আমি আর থাকিতে পারি না, চলিলাম। এই কথা শুনিয়া তাহার স্ত্রী রোদন করিতে আরম্ভ করিল। তাহাতে প্রতিবাসী স্ত্রীলোকেরা এবং দুই চারিজন

আত্মীয় কুটুম্ব আসিয়া তাহাকে প্রবোধ দানে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। সকলে বলিল তোমার স্বামী বিবাহ দিতে গিয়াছেন, তোমার কোন চিন্তা নাই, তিনি ২।১ দিনের মধ্যে প্রত্যাগমন করিবেন। নিরর্থক ক্রন্দন করিও না, তুমি স্বপ্ন দেখিয়া থাকিবে। তদনন্তর প্রতিবেশী সকলে সবিশেষ শ্রবণানন্তর জালার ধান ঢালিয়া দেখিলে ১৫ টী টাকা প্রাপ্ত হইলেন। পরে বরযাত্রিরা প্রত্যাগত হইলে, তাহাদের প্রমুখাৎ উক্ত মৃত্যুর কথা সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইল।

যাহা হউক, ভূতের এক অষ্টাদশ বর্ষ বয়স্ক বিবাহিত পুত্র আছে। তাহার বিবাহ দিতে ভূতটী জীবদ্দশায় পিতা পুত্রে খত লিখিয়া দিয়া এক ব্রাহ্মণের নিকট হইতে পঞ্চাশ মুদ্রা ঋণ করিয়াছিল। এক্ষণে সে ভূতযোনি প্রাপ্ত হইয়া সেই ব্রাহ্মণের বাটীতে বিষ্ঠা ও গোহাড় প্রভৃতি নিক্ষেপ দ্বারা দৌরাত্ম্য আরম্ভ করিল। এক মাস ধরিয়া ব্রাহ্মণের প্রতি এইরূপ অত্যাচার করা হয়। ব্রাহ্মণ জানে না যে কোথা হইতে কে কি জন্য তাঁহার উপর এরূপ উপদ্রব করিতেছে। তিনি উপদ্রবের দিবস হইতেই একমাস পর্য্যন্ত নিত্য নিত্য কর-যোড়ে মিনতি পূর্ব্বক বলিতেন "বাবা! তুমি কে? আমি তোমার কি অপকার ও কি অপরাধ করিয়াছি। তোমার কি প্রিয়কার্য্য সাধন করিতে হইবে, আমাকে অনুমতি কর এবং প্রসন্ন হইয়া আমার অপরাধ সকল মার্জ্জনা কর।" এক মাস পরে ভূত কহিল, "আমি অমুক। আমরা পিতাপুত্রে তোমার কাছে যে ৫০ টাকা ধার করিয়া খত লিখিয়া দিয়াছি, সেই খত খানি তুমি ছিঁড়িয়া ফেল, এবং আমার নামে গয়ায় পিণ্ড দান করিতে লোক প্রেরণ কর।" এই কথা শুনিয়া

ব্রাহ্মণ একেবারে নিস্তব্ধ হইলেন। ক্ষণপরে কহিলেন, ইহা ভূতের কর্ম্মই বটে। আমি তোমার পুত্রের বিবাহ জন্ম টাকা কর্জ্জ দিয়া কুকার্য্যই করিয়াছি! আমার প্রতি বিষ্ঠা প্রহার ও গবাস্থি নিক্ষেপ পূর্ব্বক তুমি যে আমার সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত বিধান করিলে, তাহাতে আমি তোমার নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি।" এই বলিয়া তিনি দশজন লোকের সাক্ষাতে সেই খত খানি ছিড়িয়া ফেলিলেন। এবং গয়ায় পিণ্ড দিতে দশটী টাকা প্রদান পূর্ব্বক একজন লোককে প্রেরণ করিলেন।

অধুনাতন পুত্রসন্তানগণ অনেকে জীবিত পিতামাতাকেই অন্ন দেয়না, তাহারা আবার মৃত পিতামাতাকে পিণ্ড দিবে? শ্রাদ্ধ শান্তি আদি পিতৃকার্য্য প্রায়ই লোপ হইল। তবে পিতা মাতার ও অপুত্রক মাতামহ মাতামহীর বিষয়াদি কেবল পুত্র সন্তানগণ অধিকার করেন কেন? কন্যাসন্তানগণকে তাহার বিভাগ দেওয়া উচিত। এক ব্যক্তি অপুত্রক, কিন্তু তাহার একটী বিধবা কন্যা ছিল। পিতা পীড়িত হইলে কন্যাটী প্রাণ পণে পিতার সেবা শুশ্রূষা করিল, কিন্তু তাহার জনকের মৃত্যুর পরে সাতপুরুষ ছাড়াছাড়ি এমন একজন জ্ঞাতিপুরুষ আসিয়া মৃত ব্যক্তির সমস্ত বিষয় অধিকার করিল। নিরাশ্রয় দুঃখিনী কন্যা দুঃখনীরে ভাসিতে থাকিল। রাজরাজেশ্বরী ভিক্টোরিয়া মাতা কন্যাসন্তান হইয়া তাঁহার নিঃসন্তান জ্যেষ্ঠ তাতের অতুল সাম্রাজ্যের অধিকারিণী হওত অনুপম ঐশ্বর্য্য ও বিপুল সুখ সৌভাগ্য সম্ভোগ করিতেছেন, কিন্তু ভারতের কন্যাসন্তানগণ নিঃস্বার্থভাবে প্রীতি প্রফুল্লচিত্তে পিতামাতার মাতামহ মাতামহীর বিষ্ঠামূত্র চন্দনের ন্যায় দুই হস্তে পরিষ্কার করিয়াও একখানি গাত্রমার্জ্জনীরও প্রত্যাশিনী নহেন।

আমাদের দেশের অনাথা বিধবাদের প্রতি তাহাদের দেবর ভাসুর ও জ্ঞাতিবর্গ ভয়ানক অত্যাচার করিয়া থাকে। মাতৃ-পিতৃহীন অনাথ বালক বালিকারাও তাহাদের খুড়া ও পিতৃস্বসাদির হাতে পড়িয়া ধন প্রাণ হারাইতেছে। এই সকল অরাজকবৎ অত্যাচারের প্রতিকার কে করিবে?

যাহা হউক সন্তান প্রসবকালে ও পালন সম্বন্ধে মাতাকে যে যন্ত্রণা সহ্য করিতে হয়, তাহা অনির্ব্বচনীয়। দেহ স্থষ্টির মূল পদার্থ শোণিত ও শুক্র দুই দ্রব্যই আমিষ গন্ধময়। সামান্য আমিষ ঘ্রাণে যখন মনে বিকার জন্মিয়া ঘ্রাণেন্দ্রিয় বস্ত্রে আচ্ছাদন করিতে হয়, তখন দুইটা আঁষ্টিয়া গন্ধ বিশিষ্ট দ্রব্য, দেহ মধ্যে প্রবিষ্ট ও স্থায়ী হওয়াতে অতিশয় কষ্টকর হইয়া থাকে। যৎ-কালে সেই দুর্গন্ধ যুক্ত বাষ্প উঠে, তৎকালে গর্ভধারিণী অন-বরত বমন করিতে থাকেন। ঐভাবে মাসেক গত হইলে ঐ বস্তু ক্রমে স্ফীত হইয়া আয়তন বৃদ্ধি পায়, তাহাতে আর একটী অসহ্য গন্ধ জন্মিয়া মাতার আহারের অরুচি জন্মায়, সর্ব্বদাই বমনাক্রান্তা ওয়াক ও সর্দ্দি উঠিয়া সংসারের কোন খাদ্য দ্রব্যে স্পৃহা থাকে না। উত্তম শয্যা পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভূপৃষ্ঠকে সুখশয্যা জ্ঞান করিয়া ভূমিতেই শয়ন করেন।

চারি মাসে গর্ভে জীব সঞ্চার হইলে ঐ জীব গর্ভ যন্ত্রণায় উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উষ্ণ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে থাকে, তাহার উত্তাপে গর্ভধারিণী রমণীরও বিষম কষ্ট বোধ হয়। ক্রমশঃ পুত্রের দেহ বৃদ্ধিতে গুরুভার বহনের কষ্ট ও যন্ত্রণারও বৃদ্ধি হইতে থাকে। যখন সন্তান বলাধান হইয়া অমৃত নাড়ী চোষণ করে, তখন ফুস্‌ফুসের মুল পর্য্যন্ত টান ধরে। গর্ভস্থ সন্তান যখন উৰ্দ্ধে উঠিতে ও নিম্নে নামিতে চেষ্টা পায়, সে সময় মাতার শ্বাসাব-

রোধ প্রায় হয়। গর্ভস্থ জীবের রাত দিন বোধ নাই, সতত চঞ্চল ভাব প্রকাশ করিয়া মাতার দুঃখ দায়ক হয়, ও আহার নিদ্রার ব্যাঘাত জন্মায়।

প্রসব বেদনার কষ্ট বর্ণনাতীত। পুত্রবতী মাতাই তাহা বলিতে পারেন। তারপর সন্তান প্রসব করিয়া একমাস সূতিকা ঘরে মাতাকে যেন প্রকৃত নরক কারাগারেই থাকিতে হয়। শিশুর পাঁচ বৎসর বয়স না হওয়া পর্য্যন্ত সন্তান লালন পালনার্থে জননীর যে কতই কষ্ট হয়, তাহা আর বলিবার নয়। শিশু শীতকালে রাত্রিযোগে শয্যায় প্রস্রাব করিয়াছে, মাতা সেই আর্দ্রস্থানে আপনি শয়ন করিয়া সন্তানকে বক্ষে বা শুষ্ক স্থানে রক্ষা করতঃ কাঁপিতে কাঁপিতে শীতযামিনি যাপন করিয়াছেন। সন্তান পীড়িত হইলে জননীকে উপবাস করিয়া থাকিতে হয়। মাতার আহার কালে তাঁহার খাদ্যদ্রব্যে সন্তান মলমূত্র পরিত্যাগ করিয়া দিয়াছে, তথাপি জননীর মনে ঘৃণার উদ্রেক হয় নাই। এমন মাতাকে কি করিয়া ভক্তি করিব, কেমন করিয়া তাঁহার ঋণ শুধিব? যে নরাধম মাতার মনে ঘৃণাক্ষরেও দুঃখ প্রদান করে, সে নরকের কীট, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

"মাতৃপদাম্বুজ রেণু সর্ব্বাঙ্গে লেপয়েৎ যদি।
চরমে জাহ্নবী তোয় তুল্য মুক্তি লভেন্নর॥
বন্দেহং তং মহাত্মানং সএব পুরুষভোবি।
যস্যাস্তি অচলা ভক্তি জননী পদপঙ্কজে॥
মাতৃভক্তি প্রপন্নস্ত কিন্নসিদ্ধতি ভূতলে।
ত্রিদিবাধিপতে রাজ্যং ভুক্তা গচ্ছেৎ পরং পদং॥"

পঞ্চম অধ্যায়।

দেব, নর, বীর, ও পশুভাব-বিশিষ্ট মানব।

"দয়া ধরম কি মূল হ্যায়, নরক মূল অভিমান।" কিন্তু আধুনিক দান প্রায়ই দয়াধর্ম্ম মূলক নহে, অভিমান মূলক। বড় লোকের অনুরোধে, রিপোর্টে বা সংবাদপত্রে প্রকাশ করিবার জন্য দেখাদেখি আজকাল লোকে দান করিয়া থাকেন। কিন্তু পূর্ব্বে এরূপ ছিল না। তখন বিপদে পড়িয়া শরণাপন্ন হইলে বা কিছু যাচ্ঞা করিলে, সামান্য ধন ত তুচ্ছ কথা, প্রাণ দিয়াও লোকে পরের উপকার করিতেন। এরূপ দৃষ্টান্ত বড় বিরল নহে, শাস্ত্রজ্ঞ মাত্রেই তাহা অবগত আছেন। অধিক দিনের কথা নয়, চারিশত বৎসরের কথা কহিতেছি——

রাঢ়দেশে একচাকা নামে এক গ্রাম আছে। তথায় হাড়াই পণ্ডিত নামক পরমধার্ম্মিক এক সুব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তাঁহার ঔরসে পদ্মাবতী দেবীর পবিত্র গর্ভে প্রভু নিত্যানন্দ জন্ম গ্রহণ করেন। নিত্যানন্দ যৌবন সীমায় পদার্পণ করিলে পর, একদা এক অজ্ঞাত কুলশীল সন্ন্যাসী আসিয়া হাড়াই পণ্ডিতের বাটীতে আতিথ্য গ্রহণ করেন এবং বিদায় কালে পণ্ডিত মহাশয়ের নিকট এই বলিয়া যাচ্ঞা করেন, "মহাশয়! আমি তীর্থ পর্য্যটনে বহির্গত হইয়াছি, সঙ্গে কোন সুব্রাহ্মণ নাই। অতএব আপনি আপনকার প্রাণপ্রতিম প্রিয়তম পুত্র এই নিত্যানন্দকে আমার হস্তে সমর্পণ করুন। আমি ইহাঁকে প্রাণের সমান করিয়া

রাখিব এবং যথাবিধানে সমস্ত তীর্থ প্রদর্শন করাইব।" এই কথা শুনিয়া নিত্যানন্দের পিতা একেবারে অবাক্ হইলেন, এবং ব্রাহ্মণীকে এই বিপদবার্ত্তা অবগত করাইয়া তাঁহার সম্মতি-ক্রমে ধর্ম্মের অনুরোধে নিত্যানন্দকে সেই সন্ন্যাসীর হস্তে সমর্পণ করিলেন।

এই বিবরণ পাঠ বা শ্রবণ করিলে একেবারে গম্ভীর ভাবে স্তম্ভিত হইতে হয়! তখনকার লোকদের কাজকর্ম্ম কথাবার্ত্তা ও জীবন যৌবন দেহ গেহ সকলই ধর্ম্মময় ও সত্যাশ্রিত ছিল। এখনকার অধিকাংশ মনুষ্য বিশেষতঃ ব্যবসায়িদের মধ্যে অনেকে ভয়ানক জানোয়ার! তাহারা নিজে ধর্ম্ম মানেনা অথচ পরকে ধর্ম্মোপদেশ দেয়! তাহাদের জন্ম কর্ম্ম কথাবার্ত্তা সবই মিথ্যাময়। যাহাদের কথার ঠিক নাই, যাহাদের উপর বিশ্বাস করা যায় না, তাহারাই হিংস্রক জন্তু তাহার আর সন্দেহ নাই।

আমাদের দেশে পুরাকালে অনেক বীর পুরুষের আবির্ভাব হইত, এখন আর তাহা নাই। রামচন্দ্র. ভীষ্ম ও যুধিষ্ঠির সত্য-বীর ছিলেন। কর্ণ দানবীর ছিলেন। ধনঞ্জয় যুদ্ধবীর ছিলেন। আর এই ঘোর কলিকালে সে দিনে এই নির্বীর্য্য বঙ্গদেশে মেটিরি গ্রামে বিখ্যাত রামদাস বাবু বলবীর ছিলেন। তাঁহার সহধর্ম্মিণীও বীররমণী ছিলেন। রামদাস বাবু মত্ত হস্তির লেজ ধরিয়া তাহাকে টানিয়া রাখিতে পারিতেন। পাইল ভরে দ্রুত-বেগে গমনশীল বড় বড় নৌকা সকলকে বুক পাতিয়া ধরিয়া রাখিতেন। সাত মণ ওজনের রামসীতা ঠাকুর ঠাকুরাণীকে তিনি নিত্য এক হস্তে উঠাইয়া স্নানাদি করাইয়া দিয়া পূজা অর্চ্চনা করিতেন।

এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ চাকরির অন্বেষণে দেশ দেশান্তর ভ্রমণ ও অনেক রাজা, মন্ত্রী প্রভৃতি বহুলোকের উপাসনা করিয়া হতাশ হইয়া প্রায়োপবেশন পূর্ব্বক প্রাণত্যাগ করিতে সঙ্কল্প করিয়া কোন শিবমন্দিরে ধন্না দিয়া পড়িয়াছিলেন। তিনদিন পরে মহাদেব স্বপ্ন দিলেন, "ব্রহ্মণ! পৃথিবীতে দেবভাব, বীরভাব, মনুষ্যভাব ও পশুভাব বিশিষ্ট লোকসকল মনুষ্যবেশে বিচরণ করিতেছে, তুমি কখন কোন প্রকৃত মনুষ্যের সাক্ষাৎ পাও নাই, এবং তাঁহার নিকট নিজ প্রার্থনা জ্ঞাপন কর নাই, এ কারণ সফল মনোরথ হইতে পার নাই। আমি তোমার শিয়রে একটী বীরপালক রাখিয়া দিয়াছি, উহা কর্ণে দিলে তুমি কে প্রকৃত মনুষ্য ও কে কোন্ পশু, তাহা স্পষ্ট দেখিতে পাইবে। অতঃপর তুমি মানুষের কাছে মনোবাসনা ব্যক্ত করিলে সিদ্ধকাম হইবে।" ব্রাহ্মণ প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান ও যথাবিধি প্রাতঃকৃত্য সমাধান পূর্ব্বক বীরপালক কর্ণে দিয়া সহরে গমন করিলেন, মানুষ সকলকে গো, গর্দ্দভ, ছাগ, মেষ, বানর, ভল্লুক, শূকর, কুকুর, শৃগাল ও সিংহ, ব্যাঘ্র রূপে দলে দলে যাইতে দেখিলেন, কিন্তু অদূরে বৃক্ষতলে এক মুচিকে মনুষ্যরূপে বসিয়া জুতা সেলাই করিতে দেখিতে পাইলেন। তখন ব্রাহ্মণ সেই মুচির কাছে গমন করতঃ আত্ম নিবেদন বিজ্ঞাপন করিলেন। মুচি বিপ্রবরকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত পূর্ব্বক বসিতে আসন প্রদান করিল এবং একযোড়া অতি উৎকৃষ্ট জুতা তত্রত্য রাজাকে উপহার দিয়া ব্রাহ্মণকে রাজসরকারে একটী উচ্চপদে নিযুক্ত করিয়া দিল।

হিন্দুগণ রাজাকে ঈশ্বরবৎ ভক্তি ও মান্য করিয়া থাকেন। ঈশ্বর সৎ, সুতরাং রাজাও সৎ, বলিতে কি রাজা সাক্ষাৎ

দেবতা। রাজাতে দেবভাব বর্ত্তমান থাকে। কিন্তু কলিতে অনেক স্থলে বিপরীত ভাব দাঁড়াইয়া গিয়াছে। এক দিন একরাজা অমাত্যাদি পরিবেষ্টিত হইয়া রাজপথে পদব্রজে বহি- র্গত হইয়াছিলেন, কোন কৃষক রাজদর্শনে তাঁহারে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলে, রাজাও তাহারে ঠিক তদ্রূপ প্রতিপ্রণাম করেন। তাহাতে মন্ত্রী বলিলেন, মহারাজ! সামান্য কৃষককে এরূপে প্রতিপ্রণাম করিলে আপনার দুর্নাম হইবে। হয় ত লোকে বাতুল বলিয়া মহারাজকে অবজ্ঞাও করিতে পারে। নৃপতি উত্তর করিলেন, ভদ্র! আপনি কি তবে আমাকে কৃষক অপেক্ষাও অভদ্র ও অসৎ হইতে উপদেশ দেন? রাজার এ কথায় মন্ত্রিবর নীরব হইলেন। সে যাহা হউক এই রাজার প্রজাসেবা ও ধর্ম্মাচার দেখিয়া সকলে তাঁহাকে ঈশ্বরাবতার বলিয়া পূজা ও ভক্তি করিয়া থাকেন। পাঠক, ইহাঁকে জান কি? ইনিই জানকী জনক রাজর্ষি জনক।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

গুপ্তগৃহে প্রেম কথা।

প্রেমালিঙ্গন আদরচুম্বন।

প্রবাসী পতির প্রতি পত্নীর প্রেমলিপি প্রেরণ। যথা—

রাঙ্গা শ্রীচরণ কমল তলে কৃতাঞ্জলি পুটে সাষ্টাঙ্গ প্রণতি বিশেষ স্তুতি মিনতি সাদর সম্ভাষণ নিবেদন মিদং।

প্রিয়তম! বাল্যকালে তুমি আমাকে বিবাহ করিয়া অবধি লেখা পড়া, গৃহস্থালী ও নানা ধর্ম্মকথা শিক্ষা দিয়াছ। এক্ষণে তুমি ধনআশে প্রবাসে গিয়া বাস করিতেছ। আষাঢ় মাসে আস্‌বে ব'লে দাসীরে আশা দিয়ে গেলে, কিন্তু আষাঢ় চিন্তা করিতে করিতে আমি অসাড় হইয়া পড়িয়াছি। যদি তোমার কিছু সার থাকে, সাড় থাকে, তবে শীঘ্র আসিয়া অমৃতবাণী দ্বারা দাসীর প্রাণ রক্ষা করিবে।

আমি কেমন পদ্য রচনা করিতে শিখিয়াছি, তাহা তোমাকে জ্ঞাত করিতে একটু আদর্শ পাঠাইতেছি—

যামিনী জাগী কামিনী আমি বিরহিণী
নিতি নিতি একাকিনী হে।
একি হে তোমার রীতি সে পীরিতি বিস্মৃতি নীরে
ভাসালে শত্রু হাসালে মজালে দুঃখিনীরে।
তব আসা আশা করি, কি দিবা কি বিভাবরী
চেয়ে আছে প্রাণ পাখী চাতকিনী প্রায়।

পাতকিনী প্রেমবিন্দু বিনে মারা যায়।
হিয়া বিছাইয়া দিয়া আছি আশা পথে।
প্রাণপতি শীঘ্রগতি এস মনোরথে।
আঁখিজলে ধুয়াইয়া চরণ দুখানি।
কেশে মুছাইয়া হেসে হেরিব মুখানি।
যৌবনের ডালি দিয়া ভেটিব তোমারে।
কোকিলের গালি প্রভো সহেনা আমারে!

পতির প্রত্যুত্তর দান।

বিদীর্ণ হইল প্রাণ প্রাণপ্রিয়ে আজ!
তব প্রেম লিপি পাঠে, পাই বড় লাজ।
আমার বিরহে বটে দহে তব প্রাণ।
সহেনা বিরহ তব, রহেনা পরাণ—
আমার। হে প্রিয়তমে! যে কষ্টে রয়েছি।
তব অদর্শন দুঃখ কতই সয়েছি!
লিপিমধ্যে বর্ণ অঙ্গে তব চিত্র খানি
ছিল প্রেমময়ি আমি কিছুই না জানি।
খুলে ঢুলে পড়ি হেরে অপরূপ রূপ
মনোচক্ষে, করি বক্ষে রাখিনু স্বরূপ।
সোহাগে গলিয়া গিয়া আত্ম হারা হই।
রসময়ি! রোসো যাব মাস দুই বই।
আষাঢ়ে গিয়েছে রথ আশ্বিনেতে যাব।
আশা আছে মনোমত প্রেম ফল পাব।
পূজিব উভয়ে মিলি জগৎ জননী
মহামায়া অম্বিকার পদাম্বুজখানি।

নবদম্পতির পুনর্ম্মিলন—

প্রবাস হইতে পতি, গৃহে এলো শীঘ্রগতি
শুনে সতী হারায় সম্বিৎ।
হেরিয়া নাথের মুখ, উপজিল মহাসুখ
পদতলে হইল পতিত।

পুলকাশ্রু প্রেমনীরে পতির চরণ
ধুয়ে সতী কেশে তাহা করিল মোচন।
হেসে নাথ প্রিয়া হাত ধরি—
উঠায়ে আদর ভরে, পুলকে চুম্বন করে,
প্রেম আলিঙ্গন আহা মরি!
তার'পর কত কথা হাস্যরস যত।
করুণরসের ছটা উঠিল তাবত।
উভয়ের মনে মনে যত কথা ছিল।
বলিয়া উভয়ে বড় সন্তুষ্ট হইল।
তখন হেটমাথে ধীরে ধীরে কহে সতী নাথে
বলহে পরাণ বঁধু প্রেম হয় যাতে।
কাম প্রেমে'কি প্রভেদ শুনিবারে মন
হয়েছে আমার প্রভো করহ বর্ণন।
পতি কন শুন সতী কাম প্রেম কথা।
চৈতন্য চরিতামৃতে লিখিয়াছে যথা—
"আত্মেন্দ্রিয় তৃপ্তি ইচ্ছা তারে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি বাঞ্ছা ধরে প্রেমনাম।
কাম আর প্রেমে হয় প্রভেদ বিস্তর।
কাম অন্ধতম প্রেম নির্ম্মল ভাস্কর॥"

আবার—

প্রেমেতে বিভোল ভোলা কত রঙ্গ করে।
বৃন্দাবনে নন্দসুত রাধা পায় ধরে॥
প্রেমযোগ সিদ্ধ শিব দেখরে কেমন,
হরগৌরী উভয়ের যুগল মিলন।
আধা হর আধা গৌরী এক দেহধারী।
প্রেমার মহিমা সীমা বর্ণিবারে নারি॥

কাম স্বার্থপর, পাপ কর্ম্ম, অতি হেয়, অতি তুচ্ছ, ঘৃণিত, ক্ষণিক সুখ মাত্র। প্রেম নিঃস্বার্থ পবিত্র ও নিত্যসুখবিশিষ্ট। প্রেম সূর্য্য সদৃশ, কাম ছায়া মাত্র। ইহা জ্ঞাত হইলে কে এমন মূঢ় আছে যে, কামনরকে ডুবিয়া থাকিবে?

সপ্তম অধ্যায়।

স্থিরযৌবন ও চিরজীবন।

সুন্দর সুন্দর সকলেই বলে, কিন্তু কোন্‌টী যে প্রকৃত সুন্দর, তাহা অদ্যাপি কেহই স্থির করিয়া বলিতে পারেন না। যাঁহার চক্ষে যেটী ভাল লাগে, কিম্বা যিনি যাহাকে প্রিয় জ্ঞান করেন, তিনি তাহাকেই সুন্দর বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। দুই দ্বিগুণে কত? ইহার উত্তরে সকলেই বলিবেন, চারি। কিন্তু সুন্দর কি? এ কথার প্রশ্ন করিলে কেহই একটী বস্তুর নাম করিবেন না। কেহ বলিবেন, চন্দ্র সুন্দর, কেহ বলিবেন সোণা, মণি সুন্দর, কেহ বা বলিবেন পদ্ম ফুল সুন্দর এবং কেহ কেহ বলিবেন গোলাপফুল সুন্দর। মাতাকে জিজ্ঞাসা কর, তিনি বলিবেন পুত্রই অতি সুন্দর। চন্দ্রে হ্রাস বৃদ্ধি আছে, পুষ্প ম্লান হয়, হীরা ও স্বর্ণ জড়পিণ্ড মাত্র; এ সকলে সৌন্দর্য্য থাকিলেও স্বর্গে ঈশ্বর এবং মর্ত্ত্যে তাঁহারই ক্ষণিকপ্রভা যৌবনের তুল্য প্রকৃত সুন্দর বস্তু আর কিছুই নাই। এ হেন মনোরম যৌবন ধনকে চিরস্থায়ী করিয়া রাখিতে পারিলে কেমন সুখের বিষয় হয়। কিন্তু তা না করিয়া এই সুরদুর্লভ যৌবনকে কিশোর কিশোরী বা যুবক যুবতীরা যেন মেরে ধ'রে গলাধাক্কা দিয়া তাড়াইয়া দিতেছেন! ইহা অতিশয় দুঃখের এবং দুর্ভাগ্যের বিষয়!!

যৌবনকালে অর্থোপার্জ্জন করিয়া সুখস্বচ্ছন্দে থাকিবার

কারণ যেমন বাল্যকালে বিদ্যোপার্জ্জন করিতে হয়, বার্দ্ধক্যে সুখে কালযাপনার্থে যেমন যৌবনে ধনসঞ্চয় করিতে হয়, পরলোকে সুখে থাকিতে ইচ্ছা থাকিলে যেমন আজীবন ধর্ম্মার্জ্জন করিতে হয়, দেববাঞ্ছিত যৌবনধন চিরস্থায়ী রাখিবার কারণ তেমনি কৈশোরকাল হইতেই যত্নবান হইতে হয়। সুধু কৈশোরকাল হইতেই বা কেন বলি, এ বিষয়ে বাল্যকালাবধি সতর্ক হইয়া থাকিতে হইবে।

রজোযোগ হইলেই স্ত্রীলোককে যুবতী বলা যায় না, তখন তাহাদিগকে কিশোরী বলা হয়। আর শুক্ররসে কীট জন্মিতে আরম্ভ করিলেই মনুষ্যের কৈশোর কাল উপস্থিত হয়। এই কৈশোরকাল যৌবনের পূর্ব্ব লক্ষণ। ক্রমে শুক্র কীটের যত অঙ্গসৌষ্ঠব, সংখ্যাবৃদ্ধি ও উন্নতি হইতে থাকিবে, ততই মানুষের যৌবন, শ্রী, সৌন্দর্য্য ও পরাক্রম বৃদ্ধি হইবে। এই শুক্রকীটই সন্তানোৎপাদনের কারণ এবং আমাদিগের জীবন যৌবনের প্রধান উপকরণ। কেন না সচরাচর কাহার কাহার চল্লিশ এবং কাহার কাহার বা পঞ্চাশবৎসর বয়ক্রমের পর ক্রমশঃ শুক্রকীটের লয় হইতে থাকে। এই নিমিত্তেই তৎসঙ্গে সঙ্গে ৪০ বা ৫০ বৎসর বয়সের পর হইতেই আমাদিগের শরীর ক্রমশঃ ক্ষয় হইয়া যায়। দৃষ্টিক্ষীণ হয়, পলিতকেশ, গলিত দন্ত ও ললিতমাংস হয় এবং কর্ণ বধির হইয়া যায়। কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত বলেন—

"কে যেন মুগুর মেরে হাড় করে গুঁড়ো,
মরণের কাছাকাছি হইলাম বুড়ো।
ঠেঙায় করিয়া ভর যেতে হয় চলে,
ভেঙায় দেশের ছেলে বুড়ো ঢোস্কা বলে।"

শারীরিক নিয়ম অব্যাহত রাখিতে পারিলে অদ্যাপিও বিনা পীড়ায় সুস্থশরীরে ১০০ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত শুক্রে কীট সঞ্চিত রাখিয়া যৌবনরক্ষা করিতে পারা যায়। ২০।২৫ বৎসর গত হইল, পূর্ব্বস্থলির একজন কৃষক ৯৫ বৎসর বয়সে বালিকা কন্যা বিবাহ করিয়া ১০০ বৎসর বয়ক্রম সময়ে সন্তানোৎপাদন করিয়াছিল, তাহার এক গাছিও চুল পাকে নাই, একটীও দাঁত পড়ে নাই, তাহাকে কখন চশমা ধরিতেও হয় নাই। তাহার শ্রবণশক্তিও বিলক্ষণ তেজস্বিনী ছিল। শত বৎসর বয়সে সে দেহত্যাগের অব্যবহিত পূর্ব্বেই পদব্রজে ৮।১০ ক্রোশ পথ হাটিয়া যাইতে পারিত। অক্ষয় বাবুর বাহ্য বস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার নামক পুস্তকে এরূপ উদাহরণ অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। মহামহোপাধ্যায় মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্নের জ্যেষ্ঠতাত ঠাকুরদাস চূড়ামণি সুস্থ ও সবলশরীরে শতবৎসর জীবিত ছিলেন। তিনি চশমা ধরেন নাই, কিন্তু তাঁহার পুত্র মধুসূদন ৪০ বৎসর বয়সেই চশমা ধরেন। এখন স্পষ্ট প্রতীয়-মান হইতেছে যে আমরা যদি শুক্রে সতেজ কীটাণু সকল বহুকাল পর্য্যন্ত সঞ্চিত ও জীবিত রাখিতে পারি, তাহা হইলে অনায়াসে দীর্ঘজীবন ও স্থিরযৌবন লাভ করিতে পারি সন্দেহ নাই।

শরীর ও মনকে চিরজীবন পবিত্রভাবে সঞ্চালন করিতে হইবে। অশ্বারোহণে ভ্রমণ, মধ্যে মধ্যে সলিলে সন্তরণ করা উচিত। এই গ্রন্থের লিখিত মত আসনাদি দ্বারা অঙ্গ চালনা, নিশাজলপান, প্রাণায়াম ও কুম্ভকাদি করিয়া শরীরের এবং পবিত্র জ্ঞান ও ভাগবত কথাদি অনুশীলন পূর্ব্বক মনের উন্নতি তথা পবিত্রতা সংসাধন করিতে পারিলে বলবীর্য্য সম্পন্ন হইয়া

দীর্ঘজীবনে স্থির যৌবন রাখিতে পারিবে। আজীবন অঙ্গে শর্ষপ তৈল ও মস্তকে নারিকেল তৈল মাখিয়া স্নান করিবে। প্রাতে পরিস্কৃত শীতল জল দ্বারা চক্ষুর অভ্যন্তর ভাগ ধৌত, নিম্ব কাষ্ঠে দাঁতন ও আহারান্তে আচমনের পূর্ব্বে লবণ দিয়া দন্ত মার্জ্জন করিবে। কেরোসিনের তৈলের আলোক আদৌ ব্যবহার করিবে না। ইহাতে চক্ষের দোষ জন্মে, মস্তকের এবং বক্ষের পীড়া হয়। একটী ছোট ছেলে এক ছটাক কেরোসিন তৈল পান করিয়া তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করিয়াছে। একটী বালিকা কেরোসিন তেলের আলোর ধূমের উপর চক্ষু দিয়া অন্ধ হই-য়াছে। স্ত্রীলোকেরা প্রদীপের শিখার ধূমে কাজল প্রস্তুত করিয়া সন্তান সন্ততীর চক্ষে অঞ্জন দেন, কেরোসিন তেলের আলোর ধূমে কর্জ্জল করিয়া চক্ষে দিলে নিশ্চয়ই চক্ষু নষ্ট হইবে।

যৌবনকাল পবিত্র ভাবে অতিবাহিত করিবে। কাহাকে কোন ক্রমেই অপমান করিও না। যথাসাধ্য মিষ্টবাক্যে সকল-কেই সন্তুষ্ট রাখিবে। ক্রোধকে আদৌ মনোমধ্যে স্থান দিবে না। ক্রোধ উপস্থিত হইয়া একটা পাপ না করিয়া ক্ষান্ত হয় না। অনেক নরাধম ইতর লোক ক্রোধ করিয়া স্ত্রীকে প্রহার করে, এবং কেহ কেহ রাগ করিয়া গৃহ সামগ্রী ভাঙ্গিয়া নষ্ট করে। এই সকল লোক নিশ্চয়ই দরিদ্রদশা প্রাপ্ত হইয়া অশেষ ক্লেশ ভোগ করিতে থাকে। সকল বিষয়ে ক্ষমা ও সহিষ্ণুতা-বলম্বন করা সম্পদের লক্ষণ।

গ্রহণ করা অপেক্ষা দান করা উত্তম। অতএব সাবধান কথন কাহারও একখান পাত কাটিয়াও ভাত খাইও না। কথন ঋণ করিও না, ঋণের বাড়া পাপ আর নাই। উত্তমর্ণের সৌম মূর্ত্তি দর্শন করিলেও অধমর্ণের রক্ত বাস্তবিক শুষ্ক হইয়া যা

ঋণ মুক্ত না করিলে ঋণীর ইহকাল কি পরকাল কোন কালেই নিস্তার নাই। একবার ঋণ করিলে পর পুনঃ পুনঃ ঋণের হস্তে পড়িতেই হয়। ঋণের এই অদৃশ্য আকর্ষণী শক্তি আছে, ইহা নিশ্চয়। দৈবাৎ বা অগত্যা কিছু ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়িলে আদপেটা খাইয়া এমন কি ভিক্ষা করিয়াও ঋণ মুক্ত করিবে। ইন্সলভেণ্ট লইয়া মহাজনকে ফাঁকি দিওনা। তাহা হইলে জন্মে জন্মে অনন্ত কাল পর্য্যন্ত তুমি ফাঁকিতেই পড়িবে। তোমার রোগ যন্ত্রণা শোক মনস্তাপ ও দুঃখ দারিদ্র কোন জন্মেই ঘুচিবে না। হিন্দু শাস্ত্রে ঋণীর অনন্ত নরক বর্ণনা আছে। পুরাণ পাঠে জানা যায়, এক ব্রাহ্মণ কোন ডোমের নিকটে এক খানি কুলা ক্রয় করিয়াছিলেন, তাহার মূল্য এক পয়সা তখন দিতে পারেন নাই। তারপর সেই ডোম ও ব্রাহ্মণের মৃত্যু হয়। পরলোকে সেই ডোম ব্রাহ্মণের নিকটে আপন প্রাপ্য পয়সাটী আদায় করিতে যায়। ব্রাহ্মণ ইহকালে কাহাকেও কখন কিছু দান করেন নাই। সুতরাং পরলোকে তিনি নিঃসম্বল প্রযুক্ত উক্ত সামান্য ঋণও পরিশোধ করিতে পারিলেন না। ডোম ব্রাহ্মণকে বলিল, তবে আমি সেই কুলা পরিমাণে তোমার পৃষ্ঠদেশের চর্ম্ম কর্ত্তন করিয়া লইব। অগত্যা নিরুপায় ব্রাহ্মণকে তাহাতেই সম্মত হইতে হইল। ডোম ছুরিকা দ্বারা ব্রাহ্মণের পৃষ্ঠের চর্ম্ম কাটিয়া লয় আর কি, এমন সময় এক অশ্বত্থ বৃক্ষ যমপুরিতে গিয়া উপস্থিত হইল। বৃক্ষবর ব্রাহ্মণ বেশ ধারণ পুরঃসর ডোমকে বলিল, মহাত্মন্! এই ব্রাহ্মণ আমার পিতা। ইনি আমাকে রোপণ ও আমার মূলে বৈশাখ সে বারি সিঞ্চন দ্বারা আমাকে প্রতিপালন করিয়াছেন। অতএব ইহাঁর পরিবর্ত্তে তুমি আমার পৃষ্ঠদেশের চর্ম্ম গ্রহণ

কর। তাহাতে ডোম আপন কুলা পরিমাণে ব্রাহ্মণরূপী অশ্বথ বৃক্ষের বল্কল ছেদন করিয়া লইল এবং তরুরাজের অঙ্গ হইতে আঠারূপ রক্ত নির্গত হইতে থাকিল। অযোধ্যাবাসী এক ব্রাহ্মণ কিছু দিন আমাদের দরোয়ানি কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি নিজ বাটীতে দিন কত অশ্বথ বৃক্ষের শাখা পল্লবাদি ছেদন করিয়া, আপনাদের গো মহিষকে পত্র ভক্ষণ করাইতেন। তাহাতে তাঁহার অঙ্গে ধবলরোগ প্রকাশ পায়। একদা রাত্রি-যোগে তিনি স্বপ্নে দেখেন, যেন হস্ত ও অঙ্গুলি কাটা রক্তাক্ত এক ব্রাহ্মণ আসিয়া তাঁহাকে বলিতেছেন "তুই আমার এ দুর্গতি করিয়াছিস। আর এমন করিস না। আমার মূলে জল ঢালিয়া দিস, তোর রোগ ভাল হইবে। বলা বাহুল্য যে দরোয়ানজী দিন কত সেই অশ্বথ বৃক্ষে বারি সিঞ্চন করিলে তিনি সুন্দর রূপে আরোগ্য লাভ করিলেন।

যথাসাধ্য পরিশ্রম পূর্ব্বক সৎপথে থাকিয়া ধনোপার্জ্জন করিবে। প্রাণান্তেও অন্যায়, অধর্ম্ম পথে ধন উপার্জ্জন করিও না। যদি ভিক্ষা করিয়া উদর পোষণ করিতে হয়, সে অতি উত্তম। যদি অনাহারে মরিয়া যাইতে হয়, তাহাও ভাল। তথাপি মিথ্যাপথে জুয়াচুরি, বিশ্বাসঘাতকতা ও চুরি আদি দ্বারা ধনো-পার্জ্জন করিয়া অনন্ত নরকে গমন করা অতি পাষণ্ডের কর্ম্ম। দুঃখ ও বিপদে অবসন্ন হইও না, ধৈর্য্যধারণ করিয়া বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইবার চেষ্টা কর। সুখ দুঃখ রাতদিনের ন্যায় গমনা-গমন করিয়া থাকে। যে কখন দুঃখ পায় নাই, সুখ যে কি বস্তু, সে তাহা জানেনা এবং ঈশ্বরের মহিমা সে বড় বুঝে না। এইজন্য সাধু ব্যক্তিরা বিপদকেই সম্পদ বলিয়া উল্লেখ করিয়া-ছেন। সাধুর গতি উজানদিকে ও উর্দ্ধদিকে। যেখানে অসাধু

ব্যক্তি শোক দুঃখে মুহ্যমান হইয়া পড়িবে, সেখানে সাধুমহাজন আনন্দ করিবেন। যেখানে কেহ কেহ ধন লাভার্থে প্রাণদানে উদ্যত ও ধনক্ষয়ে শোকে প্রাণত্যাগ করে, সেখানে সাধুব্যক্তিরা রাজ্যসম্পদ তুচ্ছ ও কষ্টকর বোধে মলমূত্রের ন্যায় পরিত্যাগ করেন। "মানুষ মানুষ সবাই বলে, মানুষ কি ভাই সকলে? মানুষ যারা জীয়ন্তে মরা রথরথী উজান চলে।" বৃক্ষ যেমন ফলভরে অবনত হয়, তেমনি সুখসম্পদের সময় জ্ঞানবান ও বিদ্যাবান ব্যক্তি নত হইয়া থাকিবেন, তাহা হইলে তিনি পুত্র পৌত্রাদি ক্রমে সৌভাগ্যলক্ষ্মীকে স্থিরা রাখিতে পারিবেন। যাহারা ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে, বিজ্ঞ ও প্রাচীনের বশীভূততা স্বীকার না করিয়া আপনারাই প্রভুত্ব ও কর্তৃত্ব করিতে চাহে, তাহারা নিজের ও সমাজের বিষম অনিষ্টসাধন করিয়া থাকে। তুমি কখন একটী পয়সাও অপব্যয় করিও না। তোমার যেমন আয় তাহা হইতে তেমনি কিছু কিছু নিত্য সঞ্চয় করিবে। যতদিন পর্য্যন্ত দশ সহস্র মুদ্রা সংগ্রহ করিতে না পারিবে, ততদিন মহা কৃপণের ন্যায় আচরণ করিবে। তবে অভ্যাগত ভিখারী অতিথিকে মুষ্টি ভিক্ষা বা তোমার প্রস্তুতীকৃত অন্ন হইতে কিছু দিবে। ব্রাহ্মণ সজ্জন অতিথির যথাসাধ্য চরণ ধৌত করিয়া সেবা করিবে। অমূল্য সময় বিফলে একতিলও নষ্ট করিও না। জ্ঞানোপার্জ্জনে নিয়ত নিযুক্ত থাকিবে। গ্রন্থ অধ্যয়নে জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে আনন্দলাভ হইতে থাকে। অত-এব গ্রন্থ পাঠে সর্ব্বদা রত থাকিবে। অনেকে নিষ্কর্ম্মে থাকিয়া তাস পাশা সতরঞ্জ খেলিয়া ও লোকের নিন্দা কুৎসাদি পরচর্চ্চা করিয়া সময় কাটায়, পরনিন্দা মহাপাপ। কবির বলেন—

"নিন্দুক বেচারা মর্‌গিয়া কবিরা বৈঠ্‌কে রোয়।
পাপ সাফা কর্‌তা খুবি য্যায়সা ময়লা ধোয়॥"

এ জগতে বুদ্ধি হীন ও বিবেচনা বিহীন হইয়া অলস ভাবে চলিলে ভয়ানক দুর্দ্দশা ভোগ করিতে হয়। এক দিন ত্রিবেণীর ঘাটে গিয়া দেখি যে, ৪০ বৎসর বয়স্ক একজন ব্রাহ্মণ পীড়িতাবস্থায় ঘাটে অবস্থান করিতেছেন। তাঁহার স্ত্রী পুত্রাদি সকলেই মরিয়া যাওয়াতে ও তিনি একেবারে দরিদ্র দশায় পতিত হওয়াতে ভিক্ষাদ্বারা দিনপাত করেন। তিনি রেলওয়ের ষ্টেশন-মাষ্টার ছিলেন, যাহা কিছু উপার্জ্জন করিতেন, বেশ্যা ও মদে তৎসমস্তই ব্যয় করিয়া ফেলিতেন। এই নির্ব্বোধ মনে করিতেন, "আমার এমন দিন বুঝি চিরকালই সমান ভাবে যাইবে।" তাই তিনি সময় কালে বুঝিয়া চলেন নাই। অসময় ও বার্দ্ধক্য কালের জন্য কিছুই সঞ্চয় করেন নাই। এখন আপন নির্ব্বুদ্ধিতার ও অপব্যয়ের প্রতিফল ভোগ করিতেছেন। তাঁহার দারুণ দুঃখ ও দুর্দ্দশা দেখিয়া শৃগাল কুকুরেও এক একবার ঘেউ ঘেউ করিয়া কাঁদিয়া উঠে।

পুটী জুগিনী পূর্ণযুবতী হইয়া ভ্রষ্টা হয়। তাহার স্বামী তাহা জানিতে পারিয়াও তাহাকে লইয়া ঘরকন্না করিতেন। এইরূপে কিছুদিন গত হইলে, পুটীর স্বামী পীড়িত হন। তাঁহাকে সেই সঙ্কটাবস্থায় ফেলিয়া পুটী উপপতির সহিত বহির্গত হইয়া আইসে। চল্লিশ বৎসর বয়সে সে একটী মহোৎসব দিয়া ভেক লইয়া বৈষ্ণবী হয়। তাহার কিছুদিন পরে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করে। তদনন্তর নানা রোগে আক্রান্তা হইয়া ২।৩ বৎসর ক্রমাগত দুঃখ ভোগ করিতে থাকিলে, তাহার মেটে ঘরটী পড়িয়া যায়। সে নিরাশ্রয় হইয়া গ্রামের বাজারের হাটে

চালিতে গিয়া পড়িয়া থাকিত। বাতে পঙ্গু, চলত শক্তি হীন। গলিত কুষ্ঠ রোগে তাহার হাত পা প্রায় খসিয়া পড়িয়া গিয়াছে। সে ভিক্ষা করিতে যাইতে বা নিজে পাক করিতে সম্পূর্ণরূপে অক্ষম। কেহ কখন দয়া করিয়া তাহারে অন্ন ব্যঞ্জন অথবা অন্য কোন কিছু খাবার দিলে সে আহার করিত, নতুবা মাঝে মাঝে তাহারে অনেক দিন অনশনে দিনাতিপাত করিতে হইত। একদা সন্ধ্যাকালে সে সেই হাটচালিতেই প্রাণত্যাগ করিলে, রাত্রে শৃগাল কুকুরে তাহারে ভক্ষণ করিয়া ফেলে। পর দিন প্রাতঃকালে লাওয়ারিষ মৃত্যু বিষয়ের তদন্ত করিতে আসিয়া পুলিষ পুটীর অস্থি ভিন্ন একটু রুধির কি মাংস পায় নাই। পুঁটী লাওয়ারিষ। ইহার কিছু সম্পত্তি থাকিলে, গবর্ণমেণ্ট তাহা আত্মসাৎ করিতেন। কিন্তু হতভাগিনী পুঁটী যে জীবদ্দশায় অনাহারে ও রোগ যন্ত্রণায় বিনা চিকিৎসায় মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইল, গবর্ণমেণ্ট তাহা দেখিলেন না। নিরাশ্রয়, অক্ষম অথচ দীন দুঃখী পীড়িত অনাথ অনাথাদের গ্রাসাচ্ছাদন ও সেবা-শুশ্রূষার কারণ গবর্ণমেণ্টের কোন প্রকার উপায় বিধান করিয়া দেওয়া উচিত। সর্ব্বসাধারণেরও এ বিষয়ে মনোযোগ করা কর্ত্তব্য, নতুবা জগতের মঙ্গল নাই ও কাহারও প্রকৃত সুখ নাই।

পাঁচ সহস্র দীন দুঃখী অনাথ কাঙ্গালী ভিখারিরা ও অনাথ বালক বালিকারা যে নিরাশ্রয়ে কলিকাতায় থাকিয়া রোগ দুঃখে অনাহারে বিনাবস্ত্রে শীত, গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে ভয়ানক কষ্ট ভোগ করিতেছে, অনেক দরিদ্র ভদ্রলোক বেকার অবস্থায় পরিবার পালনে অক্ষম হইয়া আত্মহত্যা পর্য্যন্ত করিতেছে, অনেক ভদ্র মহিলাও অন্নাভাবে প্রাণত্যাগ

করিতেছে, সে দিকে কাহারও লক্ষ্য নাই। সমাজের বার আনা লোক দরিদ্র, ভ্রষ্টা, হীনাবস্থ, এমন কি পশুতুল্য থাকিলে, কিরূপে সমাজের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি সাধিত হইতে পারে? শরীরের কোন এক অঙ্গে জ্বালা যন্ত্রণা থাকিলে যেমন সমস্ত দেহই অসুস্থ থাকে, তেমনি পৃথিবীর অধিকাংশ লোক দুর্দ্দশাপন্ন থাকাতে সমস্ত পৃথিবীই দুঃখে নিমগ্ন রহিয়াছে। এই জন্যই এ জগতে সম্রাট পর্য্যন্ত কেহই প্রকৃত সুখী হইতে পারিতেছেন না। অনেক ধনী লোক, গরীবদিগকে পশুবৎ ঘৃণা করেন, কিন্তু তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ গরীব ছিলেন, এবং তাঁহারাও স্বয়ং না হয় তাঁহাদের পুত্র পৌত্রগণ কালক্রমে দীন হীন কাঙ্গালী হইতে পারে, ইহা স্মরণ রাখিয়া গরীবের প্রতি দয়া করা সকলেরই উচিত। কেহ কেহ বলেন. "অন্ধ, কুষ্ঠী ও দীনহীন লোকেরা পাপী, ঈশ্বর তাহাদিগকে শাস্তি দিতেছেন, তাহাদের সাহায্য করা মনুষ্যের কর্ত্তব্য নহে।" ঈশ্বর পরম-দয়ালু, তিনি মনুষ্য হৃদয়ে দয়ারূপে অবস্থান করিয়া দুঃখী-প্রাণীর জীবিকা সম্পাদন করেন, কিন্তু যাহাদের ঘটে তিনি নাই তাহারাই ঐ কথা বলিয়া থাকে। দরিদ্রের দুঃখ নিবারণ ও অবস্থার উন্নতি সাধন জন্য কলিকাতায় যে দরিদ্রসভা সংস্থাপিত হইয়াছে, আমরা আশা করি, দয়া ধর্ম্মবান ব্যক্তিগণ তাহাতে সাহায্য দান করিবেন। গৃহস্থ লোকের প্রত্যহ একটী অতিথি সেবা করাই পরমধর্ম্ম। পূর্ব্বে সকল গৃহস্থই নিত্য নিত্য এক এক জন অতিথির সেবা করিতেন, এখন সেটা বন্ধ হইয়া যাওয়ায় ও দুঃখীর প্রতি রাজার করুণ দৃষ্টি না থাকায় দুঃখীর সংখ্যা অধিক হইয়াছে।

অষ্টম অধ্যায়।

ভজন সাধন।

"পঞ্চাশোর্দ্ধে বনং ব্রজেৎ" এই বচন প্রমাণ পঞ্চাশ বৎসর বয়ক্রম অতিক্রম করিলেই যে, নরনারিগণকে বন গমন করিতে হইবে, তাহা নহে। পঞ্চাশৎ বৎসর বয়স হইলেই তাহাদের সন্তান উৎপাদিকা শক্তির হ্রাস হইতে থাকে। স্ত্রীলোকের রজো বন্ধ হয়। সেই বৃদ্ধ বয়সে পুত্র জন্ম দিলে, সে সন্তান প্রায়ই দীর্ঘজীবী হয় না। এজন্য পঞ্চাশ বৎসর বয়স উত্তীর্ণ হইলেই বিজ্ঞ ব্যক্তি আর পুত্রোৎপাদনের চেষ্টায় থাকেন না। তখন তিনি বয়ঃপ্রাপ্ত পুত্রের প্রতি সংসারভার সমর্পণ পূর্ব্বক বিষয় বাসনা কাম কামনাদি সকলই পরিহার পুরঃসর নিশ্চিন্ত হইয়া সস্ত্রীক সৎসঙ্গে বা নির্জ্জনে ধর্ম্মালোচনা করেন; ভজন সাধনে প্রবৃত্ত হয়েন। ঈশ্বরচিন্তা ও ভজন সাধন করিতে গেলে, বালকের চঞ্চল স্বভাবের ন্যায় মন অস্থির থাকিলে কিছুই হইবে না। অতএব কৈশোর কাল হইতেই মনস্থির রাখিতে অভ্যাস করিতে হইবে। মন ঠিক ও চিত্তশুদ্ধি করিয়া লইতে পারিলেই ত্রিভুবন বশীভুত করা ত তুচ্ছ কথা, ঈশ্বরকে বশ করিতে পারিবে। সাধন ভজন দ্বারা যতকাল পর্য্যন্ত সিদ্ধ না হওয়া যায়, ততকাল জীবকে পুনঃ পুনঃ নানা যোনিতে জন্ম ও মরণ-রূপ সংসার নরক ভোগ করিতে হয়। অতএব যাহাতে পুনঃ

পুনঃ জন্ম গ্রহণ করিতে না হয়, তজ্জন্য জ্ঞানিলোকেরা জীবনকে কুম্ভকাদি দ্বারা দীর্ঘ করিয়া লইয়া বর্ত্তমান জন্মেই ভজন সাধন পুরঃসর সিদ্ধি লাভ পূর্ব্বক নিত্যধামে গমন করিয়া থাকেন। "রথেচ বামনং দৃষ্ট্বা পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে" অর্থাৎ দেহ রথে আত্মারূপী বামনপুরুষকে দর্শন করিতে পারিলে আর জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না। কঠোপনিষদে আত্মাকে অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ বামন বলিয়া নির্দ্দেশিত আছে।

যাহার যেমন অবস্থা ও শক্তি, তদনুসারে অধিকারী ভেদে ঈশ্বরসাধনের নিয়ম প্রণালী সকল ভগবান্ যুগভেদে ও দেশভেদে সংস্থাপন করিয়া দিয়াছেন। শিশু যতদিন অজ্ঞান থাকে ও আত্ম নির্ভর করিতে না পারে, ততদিন মাতার প্রতিই তাহার সকলি নির্ভর থাকে। তেমনি মনুষ্য যতদিন ধর্ম্মে অজ্ঞান থাকেন, ততদিন তাঁহারা আদ্যাশক্তি মাতার প্রতি সমস্ত নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত থাকেন। তারপর ক্রমান্বয়ে তাঁহারা জ্ঞানের বৃদ্ধি ও অধিকার এবং শক্তি অনুসারে শৈব, গাণপত্য ও সৌর ধর্ম্ম অবলম্বন করেন। আরও উচ্চাধিকারী হইলে অনন্ত জ্ঞানস্বরূপ চৈতন্যময় সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বশক্তিমান্ নিরাকার পরব্রহ্মের উপাসনায় প্রবৃত্ত হয়েন। নিরাকার শব্দে কিছুই আকার নাই—কিছুই নাই, এরূপ বুঝিতে হইবে না। অনাদি অনন্ত সর্ব্বব্যাপী অনন্তরূপী নিত্য পুরুষের অচিন্তনীয় আকার নিরূপণ করা যায় না, ইহাই বুঝিতে হইবে।

বৈষ্ণব সাধকগণ ভক্তিবলে ঈশ্বরকে অবতার করাইয়া বৃন্দারণ্যে তাঁহার লীলা সন্দর্শন করেন। কলির মনুষ্য সকল অতিশয় দুর্ব্বল। তাহারা শুদ্ধ বা শুষ্ক জ্ঞান আলোচনা করিয়া নিরাকার ঈশ্বর সাধনায় ক্ষমবান্ হইবে না, ও তাহাতে সুখ বা

তৃপ্তি লাভ করিতে পারিবে না এবং তাহাদের চঞ্চলমন স্থির হইয়া নিরাকার ব্রহ্মে চিত্তসমাধান করিতে পারিবে না বলিয়া ভগবান চৈতন্যদেব পুরুষপ্রকৃতি একযোগে গৌরাঙ্গ অবতার হইয়া প্রেমভক্তি ও নামরসে জগৎ প্লাবিত করিয়াছেন। কলির জীব প্রেমভক্তিতে দিব্যবিশ্বাস সহকারে হরিনাম করিলেই পরিত্রাণ পাইবে। নিয়ম পূর্ব্বক নিত্য লক্ষ হরিনাম কর, কলিতে নাম ভিন্ন গতি নাই। রাজা পরীক্ষিত ও জন্মেজয় ভাগবত ও মহাভারত শ্রবণ করিয়া উদ্ধার হইয়াছিলেন। ভাগবতাদি হরি কথা শ্রবণ কীর্ত্তন কর, হরিনাম মহাপ্রায়শ্চিত্ত, মহাযজ্ঞ, মহাস্বস্ত্যয়ন স্বরূপ।

"যং যং বাপি স্মরণভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরং
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ॥"

সাধক! তুমি এখন বিষয় বাসনা পরিত্যাগ করিয়া সংসার হইতে একেবারে অবসৃত হওত ভজনসাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছ। যদি তুমি কৈশোর কি যৌবনাবস্থা হইতে ঈশ্বরে মনঃসংযোগ করিতে অভ্যাস করিয়া থাক, তাহাহইলে এক্ষণে অনায়াসে সিদ্ধিলাভ করিতে পারিবে।

সাধক বা যোগিজন কুম্ভকের কাল ভিন্ন দক্ষিণ নাসিকা রন্ধ্রে বায়ু প্রবেশ কালে ভোজন, বাম নাসিকায় বায়ু প্রবেশ কালে শয়ন করিবেন। কেন না বাম নাসিকাতে বায়ু বহন কালই কুণ্ডলিনী দেবীর নিদ্রার কাল। দক্ষিণ নাসিকাতে বায়ু বহন কালে কুণ্ডলিনী দেবী জাগ্রত থাকেন। কুলকুণ্ডলিনী দেবীর চৈতন্য সময়ে সাধক আপন আত্মাকে চৈতন্য করিয়া লইবেন। যোগ সাধন ও তৎপ্রকরণ নানা রকম। তৎসমস্ত আয়ত্ত করা কলির জীবের সাধ্যাতীত হইবে। অতএব

ভগবন্নাম সংকীর্ত্তনই অতি সহজ উপায়। আর ভজন সঙ্গীত দ্বারা ঈশ্বরকে যেমন আশু মোহিত ও বশীভূত করা যায়, এমন আর কিছুতেই নয়।

যুগভেদে আমাদের আয়ু ও শক্তি হ্রাস হইয়া যাইতেছে; আর সেই সঙ্গে সঙ্গে আমাদের বিশ্বাস ও প্রেম ভক্তিরও ন্যূনতা হইতেছে। তখনকার লোকের বিশ্বাস ও ভক্তির কথা এখন উপকথা বলিয়া বোধ হইয়া থাকে। আমাদের দেহে যতক্ষণ আত্মা আছে, ততক্ষণ আমরা জীবিত থাকি, আর আত্মা চলিয়া গেলেই মৃত হই। সুতরাং আত্মা বিহনে দেহ পচিয়া দুর্গন্ধ হয়। কিন্তু আধুনিক অনেক লোকে আর আত্মা স্বীকার করিতে চায় না। আমাদের শরীরের অধিষ্ঠাতা দেবতা যেমন আত্মা; তদ্রূপ জলেরও অধিষ্ঠাত্রী দেবী ও দেবতা আছেন। সমুদ্র সলিলের অধিষ্ঠাতা দেবতা বরুণ। সমুদ্রের জলরাশি সেই বরুণের কলেবর। জলরূপা গঙ্গাদেবী চিন্ময়ী। যে জলে অধিষ্ঠাত্রী দেবতা নাই, তাহা অচিরে পচিয়া দুর্গন্ধ হইয়া যায়।

সূর্য্য তেজোময় পদার্থ। তাহার অধিষ্ঠাতা স্বয়ং ব্রহ্ম। এই সূর্য্য হইতেই জগৎসংসারের সৃষ্টি ও তাহার সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ হইতেছে।

গীতা ভাগবতও চিৎ পদার্থ। কলির পাপী জীবের সহিত ভগবানের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই। এজন্য তিনি জীবের শিব-সাধনার্থে গীতা ও ভাগবতরূপে সংসারে অবস্থান করিতেছেন। সাধু অর্জ্জুন মিশ্র গীতা কাটকুট করাতে ভগবানের দেহে রক্ত-পাত হইয়াছিল। ভক্তমাল প্রভৃতি ভক্তি গ্রন্থ সকল দেখ।

শরীর, মন ও আত্মা এই তিনটী পৃথক পৃথক পদার্থ, কিন্তু এ তিনের এমনি মিল ও প্রণয় আছে যে, কেহ কাহারও

তাঁদার্দ্ধজন্য বিচ্ছেদ সহ্য করিয়া থাকিতে পারে না। শরীর গেলে মন ও আত্মা থাকে না। আর আত্মা গেলেও শরীর ও মন তিষ্ঠিতে পারে না। মন গেলে শরীর ও আত্মা উভয়ই ফাঁক হইয়া পড়ে। মনই মধ্যস্থ। মনহীন ব্যক্তিকে বাতুল বলিয়া উল্লেখ করা যায়। ফলে শরীর সুস্থ সুতরাং প্রফুল্ল ও পবিত্র থাকিলে মনও সবল এবং পবিত্র হয়। আর এ কথা কে না জানে যে পবিত্র মন ধর্ম্মের আধার। কিন্তু শরীর যদি অসুস্থ ও অপবিত্র হয়, তবে মনও অপবিত্র হইয়া যায়। অপবিত্র মন পাপেই লিপ্ত থাকে। তাই বলি সর্ব্বতোভাবে মনকে পবিত্র রাখিয়া ভগবদারাধনা কর। কত-দূর ধর্ম্মপথে অগ্রসর হইতেছ, তাহা নিত্য পরীক্ষা করিয়া দেখিও।

"অভিমানং সুরাপানং গৌরবং রৌববং সম
প্রতিষ্ঠা শূকরী বিষ্ঠা স্ত্রয়ং ত্যক্তা হরিং ভজেৎ।"
"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়া সদা হরি।"

চৈতন্য মহাপ্রভু বলিয়াছেন—আপনাকে তৃণ হইতেও নীচ, দীনহীন ও বৃক্ষ হইতেও সহনশীল করিয়া তুলিতে না পারিলে ভজন সাধন সিদ্ধ হয় না। বৃক্ষ শুকাইয়া মরিবে, তবু কাহারও নিকট হইতে বারিবিন্দু প্রার্থনা করিবে না। বৃক্ষকে ছেদন কর, সে নিজ দেহকাষ্ঠ দিয়া তোমার রন্ধন কার্য্য সম্পন্ন করিয়া দিবে। বৃক্ষতলে মলমূত্র পরিত্যাগাদি অত্যাচার করিলেও সে ছায়া ও ফল পুষ্প প্রদানে কখনই বিরত নহে।

কখন কখন পদাঘাতে তৃণের একপ্রান্ত উচ্চ হইয়া উঠে। বৃক্ষের শাখা ভাঙ্গিয়া পড়িয়া কখন কখন গৃহস্থদের ঘর দ্বার ভগ্ন হয় এবং কখন বা তদাঘাতে মনুষ্যাদি জীব জন্তুর প্রাণ বিয়োগ

হয়। এজন্য মহাপ্রভু বলেন, তৃণ হইতেও নীচ ও বৃক্ষাপেক্ষাও সহনশীল হইতে হইবে। অর্থাৎ তোমাকে কেহ আঘাত করিলে কি কটু কথা কহিলে একেবারে নত হইয়া সহ্য করিয়া থাকিবে। আর তোমার সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত সময়েও যেন তোমার কোন অঙ্গের আঘাতে পিপীলিকা পর্য্যন্ত ক্লিষ্ট না হয়, এরূপ সাবধান থাকিবে।

যাহা হউক যতক্ষণ পর্য্যন্ত ভগবন্নাম সুধা হইতেও মিষ্ট না লাগিবে, ততক্ষণ নিশ্চয় জানিবে, তোমার নাম সাধন সিদ্ধ হয় নাই। রোগী ব্যক্তির যেমন সুস্বাদ দ্রব্য মিষ্ট লাগে না, অরুচি বোধ হয়, তেমনি হরিনামে যাহার অরুচি ও তিক্ত বোধ হয়, তাহার পাপ রোগগ্রস্ত আত্মার উদ্ধারের নিমিত্তে ভগবান সন্নিধানে প্রার্থনা করা আবশ্যক।

গীত।

"নারদ ঋষি দিবা নিশি বীণাযন্ত্রে গান করে।
হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরেরাম হরেরাম রাম রাম হরে হরে।
বল মাধাই মধুর স্বরে—
নামে কতই সুধা পেয়েছ রে—
হরি নামে কতই সুধা পেয়েছেরে—

উপসংহার।

"A people that can feel no pride in the past, in its history and literature, loses the mainstay of its national character. When Germany was in the very depth of its political degradation, it turned to its ancient literature, and drew hope for the future from the study of the past. Something of the same kind is now passing in India." MAXMULLER.

জর্ম্মান দেশ যখন অধঃপাতে যাইতেছিল, তখন তত্রত্য অধিবাসিরা প্রাচীন সাহিত্যানুশীলন পূর্ব্বক উন্নতিলাভ করিয়াছিলেন। অধুনা ভারতবর্ষের দুর্দ্দশার চরমাবস্থা বলিতে হইবে। কি শারীরিক, কি মানসিক, কি আধ্যাত্মিক সকল বিষয়েই আমরা নিতান্ত হীন হইয়া পড়িয়াছি। তিন কোটি ইংলণ্ডীয় লোক ২৬ কোটি ভারতবাসীকে পদানত করিয়া রাখিয়াছেন।

ধর্ম্মে প্রাণ প্রতিষ্ঠিত এবং প্রাণ দ্বারা শরীর সুরক্ষিত থাকে। প্রাণ বা আত্মা বিহীন দেহ যেমন মৃত, ধর্ম্মহীন আত্মাও তেমনি মৃত। আমাদের দেহে যতক্ষণ জীবন থাকে, ততক্ষণ আমরা মৃত্যুকে ভয় করি—সর্প দৃষ্টে পলাই, অগ্নি হইতে সাবধান থাকি ইত্যাদি। আত্মা যতক্ষণ ধর্ম্মের আশ্রিত থাকে, ততক্ষণ পাপকে ভয় করে। আধুনিক লোকদের ধর্ম্ম নাই, সুতরাং পাপ ভয়ও নাই। পূর্ব্বতন ভারতবাসিগণের উন্নত অবস্থার সহিত তুলনা করিলে, আধুনিক ভারতবাসিদিগকে পশুরও অধম বলিয়া বোধ

হয়। সিংহ ও কুকুরাদি হিংস্রক জন্তুদের অদ্ভুত কৃতজ্ঞতার অপূর্ব্ব কাহিনী সকল শ্রবণ করিয়া মনমুগ্ধ হইয়া থাকে, কিন্তু দ্বিপদ নর পশুদের অকৃতজ্ঞতা ও বিশ্বাসঘাতকতা ও জঘন্য পাপাচার সকল দেখিলে বা মনে পড়িলে মনুষ্যজাতির প্রতি বিজাতীয় ঘৃণার উদ্রেক হয়! যদি প্রকৃত মনুষ্য হইতে চাও, তবে ভারতীয় প্রাচীন ইতিহাস ও সাহিত্যাবলির অনুশীলন কর।

আর্য্যজাতীয় প্রাচীন ঋষিগণ বলেন, পিতামাতার সেবা ভিন্ন পুত্রের অন্য ধর্ম্ম নাই। একথা আমরা তৃতীয় অধ্যায়ে লিখিয়াছি। এস্থলে তাহাই আবার স্মরণ করাইয়া দিতেছি। পিতামাতা যতদিন জীবিত থাকেন, ততদিন, বিশেষতঃ তাঁহাদের বৃদ্ধকালে পুত্রের কর্ত্তব্য কর্ম্ম অতি গুরুতর। পুত্র সস্ত্রীক বৃদ্ধ বিশেষতঃ পীড়িত পিতামাতার আজ্ঞাবহ হইয়া তাঁহাদিগকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর ঈশ্বরী জানিয়া পূজা ও সেবা করিবে। ভক্তিপূতচিত্তে নিত্য তাঁহাদিগকে প্রণাম পূর্ব্বক তাঁহাদিগের চরণামৃত পান ও পদধূলি গ্রহণ করত মস্তকে এমন কি সর্ব্বাঙ্গে লেপন করিবে। কিছু আহার করিতে হইলে, তাঁহাদিগেরই প্রসাদ ভক্ষণ করিবে। তাঁহাদের ভোজন কালে বায়ুবীজন ও শয়নকালে পাদ সম্বাহন করিবে। বৃদ্ধকালে বিশেষতঃ পীড়ার সময়ে মাতাপিতার যে যে দ্রব্য খাইতে ইচ্ছা হয়, পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিয়া সাধ্যানুসারে তাহা আয়োজন করিয়া দিতে পারিলেই পুত্রের জন্ম সার্থক হয়। মরণান্তে যাহাতে দেহের সদ্গতি হয়, জ্ঞানবান বৃদ্ধ মনুষ্যের তৎপ্রতি বিশেষ লক্ষ্য থাকে। অতএব পিতামাতার মৃত দেহের সুন্দর সৎকারপূর্ব্বক শ্রাদ্ধ শান্তি করতঃ গয়ায় পিণ্ডদান করিতে পারিলেই সৎপুত্রের মত কার্য্য করা হয়।

পিতা মাতার মৃত্যুর পর শোক প্রকাশার্থে এবং তাঁহাদিগের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও ভক্তি প্রদর্শন জন্য একমাত্র বস্ত্র পরিধান করিয়া গলায় কাচা বাঁধিয়া ভূমিতে বা কম্বলাসনে উপবেশন, শয়ন, নিরামিষ ও হবিষান্ন ভক্ষণ এবং তৈল ও ক্ষৌরী ত্যাগ করিয়া নগ্ন পদে (পিতৃ মাতৃহীন) দীনহীন কাঙ্গালীর ন্যায় ভ্রমণ করা প্রকৃত মনুষ্যত্বের লক্ষণ কি না? সহৃদয় নিরপেক্ষ পাঠক মহোদয়গণ কি বলেন? পাশ্চাত্যসভ্যতা যদি এ কথাকে কুসংস্কার বলে, তবে তাহার ঘোরতর মুর্খতার ও বানুরে বুদ্ধির নিমিত্ত তাহারে বিরাশী ওজনে ভৎ'সনা করা উচিত কি না? জ্ঞানবান লোকেরা যদি বলেন "উচিত, উচিত, উচিত" তবে আমি তাঁহাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিয়া সমুচিত কথা বলিতে সাহস করিতে পারি।

'দেবতার আদ্দি বোল্লে হয়, দেবতারা তুষ্ট।
মানুষের আদ্দি বোল্‌তে গেলে মানুষ হয় রুষ্ট।"

তবে এখন ভয় ক'রে বল্‌বো, কি নির্ভয়ে বল্‌বো? দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ছন ছন করিয়া প্রস্রাব করার পরিবর্ত্তে বসিয়া প্রস্রাব করতঃ জল গ্রহণ করা কি কুসংস্কার? প্রস্রাবান্তে জল দিয়া শরীর ধৌত করিলে দেহ মন শুদ্ধ হয় এবং কোন কোন রোগের হাতও এড়ান যায়। আর ইহা অতি পবিত্র ও ভদ্রব্যবহার। একবার একটী লোক মিথ্যা ডাকাতি অপবাদে ধৃত হইয়া হাজতে থাকে। স্বয়ং মাজিষ্ট্রেট সাহেব (অবশ্য ইউরোপীয়ান) তাহার তদারকে যান। তিনি সেই আসামীকে প্রস্রাব করিতে বসিয়া জল লইতে দেখিয়া 'এ ভদ্র ব্যক্তি কখন দস্যু নহে' বলিয়া তাহাকে তৎক্ষণাৎ ছাড়িয়া দেন। সেদিন রাজ-প্রতিনিধি লর্ড দফাঋণ হ্যাট কোটধারী বিজাতীয় পোষাকপ্রিয়

বাঙ্গালীদিগকে বেশ একটু বিদ্রূপ করিয়াছিলেন। কিন্তু 'লজ্জা বড় পদার্থ' কৈ, তাহাতে কি কেহ হ্যাটকোট পরা পরিত্যাগ করিলেন? তবে হিন্দু স্ত্রীলোকদিগের বস্ত্র পরিধান রীতিটা ভাল নহে, ইহা আমাদিগকে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে। করযোড়ে কহিতেছি, হে হিন্দু মহাশয়গণ! আপনাদের স্ত্রীলোকদের সূক্ষ্ম পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন করিয়া দিয়া একটু আবরু রক্ষা করুন।

ডারউইন সাহেব আবিষ্কার করিয়াছেন যে, 'বানর হইতে মনুষ্য উৎপন্ন হইয়াছে।' কথা মিথ্যা নয়। রাম রাবণের যুদ্ধের পর লঙ্কার বিধবা রাক্ষসিদের গর্ভে রামের নানাজাতীয় বানরদের ঔরসে ম্লেচ্ছজাতীয় যে মনুষ্যগণের জন্ম হইয়াছিল, তাহারাই দ্বীপ দ্বীপান্তরাদি ইউরোপীয় নানাস্থানে বিস্তীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। উহারা যে বানর ও রাক্ষসী সঙ্গমে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা উহাদের আহার ব্যবহারাদিতে প্রকাশ পাইতেছে। ইহারা শিক্ষা প্রভাবে অনেকটা উন্নতি ও সভ্যতা লাভ করিয়াছে বটে, তথাপি অনেক বিষয়ে আর্য্যজাতির নীচে ঝুলিতেছে।

পবিত্র আহার ও পবিত্র শিক্ষাই মনুষ্যত্বের মূল। আর্য্যজাতি বিজাতীয় রাজার অধীনে পড়িয়া অবধি ঐ সকল বিষয় ভুলিয়া যাওয়াতে ও ক্রমশঃ উদ্যমহীন, অলস ও দুর্ব্বল হইয়া পড়াতে, আমরা আপনাদের সর্ব্বনাশ আপনারাই করিতেছি। আমরা আমাদের জাতীয় উত্তমোত্তম রীতি নীতি ধর্ম্ম কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া বিজাতীয় অধম রীতি নীতি সকলের অনুকরণ করাতেই দুর্দ্দশাপঙ্কে পতিত হইয়াছি। এবং ডুবেছি না ডুবতে আছি পাতাল কত দূর দেখিবার চেষ্টায় রহিয়াছি। কৃষ্ণ বন্দো প্রভৃতি বিধর্ম্মী হিন্দুকুলাঙ্গারদিগকে আমরা ঘৃণা না করিয়া

তাহাদিগকে আদর করিতেছি। আবার সভা সমিতির সভা-পতি ও সমাজের নেতা করিয়া তুলিতেছি। হায়! আমরা কি ভয়ানক অধোপাতেই গিয়াছি। আমাদের দুর্ব্বল বিধবা অবলা-দের মধ্যে যদি কেহ ব্যভিচারিণী হয়, তবে তাহার আর নিস্তার নাই। সে সমাজ হইতে বিতাড়িত হইয়া অসহায় ও নিরাশ্রয় অবস্থায় বেশ্যাবৃত্তি ও ভিক্ষাবৃত্তি, অবশেষে বৃদ্ধবয়সে অনশন বৃত্তিতে বিবিধ দুঃখ ও রোগ যন্ত্রণা ভুগিতে ভুগিতে প্রাণত্যাগ করিবে; তাহাকে কেহই দয়া করিবে না। কিন্তু বিষম লম্পট ও মদ্যপায়ী পুরুষেরা সমাজে প্রভুত্ব করিবে। ঐরূপ হিন্দু-কুলাঙ্গারগণ সমাজে আদর পাইলে কিরূপে সমাজের উন্নতি হইতে পারে?

আমাদের জাতীয় সংস্কৃত ও বঙ্গভাষার পুস্তক পত্রিকাদির প্রতি অনাদর করিয়া আধুনিক শিক্ষিত অভিমানী লোকেরা ইংরাজী পুস্তক ও পত্রিকাদির প্রতি বিশেষ অনুরাগ প্রকাশ করিয়া আপনারাই আপনাদের মাথা খাইতেছেন। তাঁহাদের এই রোগেই কিন্তু এমন সোণার দেশটা ছারক্ষার হইয়া যাই-তেছে। ইংরাজী ভাষায় উন্নতি লাভ করিলে কি ফল হইবে? মুসলমান রাজ্যাবসানে যেমন পারস্য ও উর্দ্দু ভাষা পরিত্যাগ করিতে হয়, তদ্রূপ ইংরাজ রাজ্যান্তে ইংরাজী ভাষারেও ছাড়িয়া দিতে হইবে। তাইবলি সংস্কৃত ও বাঙ্গলা ভাষার সবিশেষ উন্নতি সাধন কর, দেশের স্থায়ী মঙ্গল লাভ ও শ্রীবৃদ্ধি হইবে।

কি বালক কি যুবক কি বৃদ্ধ কি মূর্খ কি পণ্ডিত কি ধনী কি নির্ধন সকল প্রকার পুরুষ মানুষেরই এক একটী স্বাভাবিক অভিমান ও আত্মশ্লাঘা আছে। সেই অভিমান বশে প্রায় সকলেই পরস্পর আপনাকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বুদ্ধিমান ও

জ্ঞানবান বলিয়া বোধ করে। "আমি যেমন বুঝি, অন্যে তেমন বুঝিতে পারে না। আমি যেমন জানি, অপরে তেমন জানে না। আমার যেরূপ বুদ্ধি, আর কাহারও তদ্রূপ বুদ্ধি নাই। অমুক জুয়াচোর, বড় পাজী। অমুক মদ্যপ, লম্পট, বড় পাপী। অমুক এটা জানেনা। অমুক সেটা পারে না। ফল না উহা করে না। সে কেবল অপব্যয় করে, দেশের হিত বা পরার্থে একটী পয়সাও দান করে না। সে ভারত উদ্ধারের চেষ্টা করে না। ও ব্যক্তি বিশ্বনিন্দুক। অমুক কেবল ক্রীড়া কৌতুক ও আলস্যেই কালহরণ করে। আমার চোকে একটাও মানুষ ঠেকে না; আমার মত মানুষ কৈ, আমি ত কাহাকে গ্রাহ্যই করি না।" এইরূপ ভাব মানব নিবহের প্রায় স্বভাবসিদ্ধ বলিলেই হয়। বিশেষতঃ বর্ত্তমানকালে ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে এই ভয়ানক মূর্ত্তিমান অভিমান ভাবের বড় বাড়াবাড়ি দেখা যাইতেছে। সেইজন্যই এখনকার বালকেরাও আপনাদিগকে সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া বোধ করে। তাহারা আর বৃদ্ধের মর্য্যাদা করে না, পিতা মাতা প্রভৃতি গুরুজনকেও ভক্তি করে না। গুরু উপদেশ ও গুরুমন্ত্র গ্রহণ করে না। ইহারা এখন গুরুর গুরু হইয়া জ্ঞানবান ও প্রাচীন লোকদিগকে শিক্ষাপ্রদানে উদ্যত ও সাহসী হইয়াছে। এ সকল শিক্ষাপ্রণালী ও সঙ্গদোষের বিষময় ফল। গুপ্তগৃহের প্রথম অধ্যায়ে "শিক্ষা ও সঙ্গ" নামধেয় প্রস্তাবে তাহার সবিস্তার বর্ণন করা গিয়াছে।

এই দোষ এখন যেমন আপামর সাধারণে সংক্রামক হইয়া দাঁড়াইয়াছে, পুরাকালে এতদ্রূপ প্রবল ছিল না। তথাপি তাহার দৃষ্টান্ত নিতান্ত বিরল নহে। রাজা যযাতি ত এই দোষেই স্বর্গভ্রষ্ট হইয়াছিলেন, বাবিলোনের রাজা নেবুকডনেজর এই দোষের

আতিশয্যেই রাজ্যভ্রষ্ট ও ভয়ানক দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছিলেন। ফলতঃ আত্মশ্লাঘা বল, অভিমান বল, অহঙ্কার বল, কি গর্ব্ব বা দম্ভ বল, অথবা দর্পই বল, ক্ষণভঙ্গুর, মর্ত্ত্য ও মরণান্তে দুর্গন্ধময় পচা ও গলিত দেহধারী মনুষ্যের এই দোষটী ঈশ্বর কথন সহ্য করেন না বা সহিতে পারেন না। যিনি প্রকৃত মনুষ্য, তাঁহাকে কখনই এ দোষ স্পর্শ করিতে পারে না। দ্বিপদ নরপশুকেই এ দোষ বিশেষরূপে আক্রমণ করিয়া থাকে।

যশোলিপ্সা লোকের বড় প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। তাই আজকাল এখনকার উচ্চ শিক্ষিতদলের মধ্যে মাতৃ ভক্তির বিলক্ষণ ভাণ প্রচলিত হইয়াছে। ক্রমশঃ ইহা এক প্রকার ফ্যাশান হইয়া দাঁড়াইতেছে। রামগোপাল ঘোষ বড় মাতৃভক্ত ছিলেন। অমুক বারিষ্টার বাবুসাহেব অতিশয় মাতৃভক্ত। মাতার মনে দুঃখ দিয়ে, জাতি কুল ধর্ম্ম ও পরকালের মাথাটী খেয়ে, মাতাকে পিণ্ড হইতে বঞ্চিত করিয়া কিরূপে মাতৃভক্ত হওয়া যায়, আমরা তাহা বুঝিতে পারি না। যাহা হউক, সৎকার্য্যের কপটতাও ভাল। সেদিন পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে মহামহোপাধ্যায় উপাধি প্রদান করিতে গবর্ণমেণ্ট ইচ্ছা করিয়াছিলেন, বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহা অস্বীকার করেন, তাহাতে তাঁহার যশোঘোষণা হয়। তার পর রাজা সূর্য্যকান্ত আচার্য্য বাহাদুরকে গবর্ণমেণ্ট কোন বিশেষ উপাধি ভূষণে সাজাইতে চাহিলে, রাজা বাহাদুরও তাহাতে অসম্মত হয়েন। গবর্ণমেণ্ট প্রদত্ত নিকড়িয়া উপাধি ব্যাধির শান্তি হইলেই মঙ্গল।

যাহাহউক পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্ম্মাক্রান্ত ঈশ্বরের এই অনন্ত বিচিত্রময় বিশ্বরাজ্যের সকল বিষয় ও সকল কার্য্যই অসীম, কিছুরই অন্ত নাই। যত উর্দ্ধে উঠি, ততই উঠা যায়। এই-

রূপে উচ্চ হইতে উচ্চতর এবং তাহা হইতে উচ্চতম স্থানে আরোহণ কর, অনন্তকালেও উচ্চতার সীমা নির্দ্ধারণ করিতে পারিবে না। আর যতই নীচে যাও, ততই যাইবে। অনন্ত-কালেও পাতালের তল প্রাপ্ত হইবে না। তেমনি সুখেরও উন্নতির সীমা নাই। দুঃখেরও অবনতির শেষ নাই। দীন হীন নিরাশ্রয় কাঙ্গালী হইতে সসাগরা ধরাধিপতি সম্রাট পর্য্যন্ত দেখ, পরস্পর সকলেরই অবস্থা উৎকৃষ্ট হইতে উৎকৃষ্টতর ও তাহা হইতে উৎকৃষ্টতম। সম্রাট কি বলিতে পারেন, "আমি ঐশ্বর্য্যের ও প্রভুত্বের শেষ সীমায় দণ্ডায়মান হইয়াছি।" না কখনই না। তাহা হইলে সগর রাজা ইন্দ্রত্ব লাভ কামনায় ষষ্টি সহস্র সন্তান ক্ষয়কর অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেন না, যুধিষ্ঠিরও রাজসূয় যজ্ঞে দীক্ষিত হইতেন না। আবার যখন সম্রাট হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমান্বয়ে দীনহীন নিরাশ্রয় কাঙ্গাল দুঃখীর নিকট গমন করি, তখন পর পর সকলেরই অবস্থা নিকৃষ্ট হইতে নিকৃষ্টতর ও তাহা হইতে নিকৃষ্টতম দেখিতে পাই। এখন দারুণ যন্ত্রণাযুক্ত গলিত কুষ্ঠরোগে রুগ্ন গতিশক্তিবিহীন দীনহীন নিরাশ্রয় অনাথ বৃদ্ধ কাঙ্গালী কি বলিবে যে আমাপেক্ষা দুঃখী আর কেহই নাই; সে তাহা কখনই বলিতে পারিতেছে না, কেননা সে তাহার চারিদিকে তত্তুল্য বা তাহা অপেক্ষা অধিক দুঃখী দেখিতে পায়। তাহা না হইলে সে কি আর তিলার্দ্ধ জীবন ধারণ করিতে পারিত? নিরাশার ঘোর অন্ধকারে ও দুঃখের সাগরে পড়িয়া কোন্‌কালে আত্মহত্যা করিয়া বসিত। পশু পক্ষী কীট পতঙ্গাদির দুঃখ যন্ত্রণার তুলনাই হয় না। দ্বিপদ নরপশুগণ ইহাদের প্রতি ঘোরতর অত্যাচার করিয়া থাকে। বাস্তবিক পশুদিগের কিছুই জ্ঞান নাই। অনেক পশু আপন

শিশু ভক্ষণ ও মাতৃ গমন ও মাতৃসংহার করিয়া থাকে। দ্বিপদ নরপশুরা কি তাহা করে না? রোমীয় মহারাজ নিরো মাতৃ হত্যা করিয়াছিল। পুথি বৃদ্ধি ভয়ে এরূপ দৃষ্টান্ত আর উদ্ধৃত করিলাম না। সাক্ষাৎ আদ্যাশক্তি মা ভগবতী, তাঁহার সন্তান-সন্ততীদিগকে দুগ্ধ দিয়া প্রতিপালন করিবার কারণ গাভীরূপে এই পৃথিবীতে বিচরণ করিয়া থাকেন। ধর্ম্মজ্ঞ কৃতজ্ঞ হিন্দুগণ ভগবতী জ্ঞানেই গাভী পূজা করিয়া থাকেন। অভিধানে গাভীর নাম মাতা বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। দুরাত্মারা সেই মাতৃহত্যা করিয়া তন্মাসে স্বকীয় শূকর দেহ পরিপুষ্ট করিতেছে।

সত্য, সরলতা, বিশ্বাস, ভক্তি, দয়া, ন্যায়পরতা, পরোপ-কারিতা ও পবিত্রতা প্রভৃতি স্বর্গীয় জিনিস সকল অধুনা মর্ত্ত্য-লোকে অত্যন্ত দুর্ল্লভ হইয়া উঠিয়াছে। তৎপরিবর্ত্তে মিথ্যা, কপটতা, অবিশ্বাস বা বিশ্বাসঘাতকতা ও স্বার্থপরতা প্রভৃতি রাজত্ব করিতেছে। ধর্ম্মালোকের বিনিময়ে অধর্ম্মান্ধকারে জগৎ আচ্ছন্ন হইতেছে—দুর্দ্দশা চরম সীমায় উপনীত হইয়াছে। যেমন আলোর পর অন্ধকার ও অন্ধকারের পর আলোকের আবির্ভাব হয়, সারাণীর ভাঁটা পড়িলেই জোয়ার হয়, তেমনি বঙ্গের দুর্দ্দশার পর আবার সুখের অবস্থা ফিরিয়া আসিবে। বোধ হয় এখন সেই সুখাবস্থার প্রথম জুয়ার।

নদীতে জুয়ার আসিলে যেমন প্রথমে নানা আবর্জ্জনা ও ময়লা সকল ভাসিতে থাকে, ক্রমে ক্রমে তাহা তিরোহিত হইয়া জল সুনির্ম্মল হয়, তেমনি বঙ্গের সুখ নদীতে অধুনা নানা আবর্জ্জনা ও ময়লা রাশি ভাসিতেছে। পূর্ব্বে যাঁহারা হিন্দুধর্ম্ম, হিন্দু-সমাজ ও হিন্দু রীতি নীতির বিষম বিদ্বেষী ছিলেন, তাঁহাদের অধিকাংশই এক্ষণে সকল বিষয়েই হিন্দু পক্ষপাতী হইয়াছেন।

আজ কাল ইংরাজী নবিশ অনেক সুশিক্ষিত হিন্দুলোকের মুখে প্রায়ই শুনিতে পাই—"আমাদের আর্য্যঋষিগণ অতিশয় জ্ঞানী ছিলেন। চন্দ্রের সহিত যেমন জুয়ার ভাঁটার সম্বন্ধ রহিয়াছে, গ্রহ নক্ষত্রের সহিত মানবদেহেরও তেমনি সম্বন্ধ আছে। ঋষিগণ তাহা জ্ঞাত ছিলেন। এজন্য তাঁহারা স্বাস্থ্যরক্ষার উদ্দেশে একাদশী ও তিথি বিশেষে বিশেষ বিশেষ খাদ্য নিষেধ করিয়া গিয়াছেন। ইহা অতি উত্তম বলিয়া আমরাও স্বাস্থ্য রক্ষার্থে একাদশী করিয়া থাকি, ইত্যাদি।" একাদশীতে কেবল শারীরিক স্বাস্থ্যলাভ হয়, ইঁহারা এখন এই পর্য্যন্তই স্বীকার করিতেছেন, এতদ্দ্বারা যে আধ্যাত্মিক উপকার হইয়া থাকে, তাহা তাঁহারা অঙ্গীকার করেন না। ভাল, তোমরা পূর্ব্বে "অল হাম্বক" বলিয়া সকলই উড়াইয়া দিতে, এখন যে ঋষিগণের কিছু কিছু মর্য্যাদা করিতে শিখিতেছ, ইহাতে আমরা পরমাপ্যায়িত হইয়াছি। আরও কিছু অগ্রসর হও, তাহাহইলেই স্পষ্ট বুঝিতে পারিবে যে ঈশ্বর প্রীত্যর্থ একাদশী আদি ব্রত উপবাসাদিতে শারীরিক স্বাস্থ্যের সঙ্গে সঙ্গে আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভও হইয়া থাকে। "দেবে তীর্থে দ্বিজে মন্ত্রে দৈবজ্ঞে ভেষজে গুরৌ। যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।"

পরিশিষ্ট।

দীক্ষা—দিব্যজ্ঞান লাভ ও সম্যক্‌রূপে পাপক্ষয় যাহা দ্বারা হয়, সেই ক্রিয়া বিশেষকে দীক্ষা কহা যায় (১)। বেদ বা তন্ত্র বিহিত মন্ত্র বিশেষ সদ্‌গুরুকর্ত্তৃক সৎশিষ্যে সমর্পণ দ্বারা এই ক্রিয়া সাধিত হইয়া থাকে। সর্ব্ববর্ণের গুরু ব্রাহ্মণ ভাগবত-শ্রেষ্ঠ হইলে তাঁহাকেই গুরুত্বে মনোনীত করিয়া যেমন হরি পূজ্য, সেইরূপ তাঁহার পূজা করিতে হইবে। আর যদি শূদ্র ভগবৎ প্রেমময় ও ভগবত্তত্ত্বজ্ঞ হন, তাহা হইলে তিনিও গুরু হইতে পারেন।

যথাশাস্ত্র সদ্‌গুরু কর্ত্তৃক দীক্ষিত হইয়া সাত্বিক আহার অর্থাৎ হবিষ্যাশী কিম্বা নিরামিষ-ভোজী হইয়া ভজন সাধন করিবে। সৈন্ধবলবণ ব্যবহার করিবে। প্রচলিত লিবরপুলী লবণ অশুচি, তাহা ব্যবহারে দেহের পীড়া ও মনের বিকৃতি হয়।

---

(১) দিব্যজ্ঞানং যতোদদ্যাৎ কুর্য্যাৎ পাপস্য সংক্ষয়ং।
তস্মাৎ দীক্ষেতি সা প্রোক্তা দেশিকৈস্তত্ত্বকোবিদৈঃ॥

* শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যাঁহাকে গুরু বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। সেই কেশব ভারতী শূদ্রজন্মা ছিলেন।

কোন কোন গ্রন্থকার বলেন, রতিশক্তি বহুকাল পর্য্যন্ত সতেজ রাখিবার চেষ্টা করা উচিত। কেন না উহার সহিত মানব স্বাস্থ্য অচ্ছেদ্য বন্ধনে বদ্ধ। যে সকল নিয়ম অনুসরণ করিয়া কার্য্য করিলে উৎপাদিকাশক্তি অপেক্ষাকৃত অধিককাল স্থায়ী হয়, সে সকল নিয়ম পালন করা সকলেরই উচিত। সেই সকল কথাই আমরা এই গ্রন্থের আগা গোড়া বলিয়া আসিতেছি।

বিংশতি বৎসর বয়সের পূর্ব্বে যাহারা বিহারাদি দ্বারা বীর্য্য অপচয় করে, তাহারাই রোগে ভগ্নদেহ ও যৌবনে বৃদ্ধত্ব দশা প্রাপ্ত হয় এবং রতিশক্তি অনেক দিন সতেজ রাখিতে পারে না। বীর্যস্তম্ভন ও কামোদ্দীপক ঔষধাদি ব্যবহার এবং সুরা, অহিফেণ ও গাঁজা গুলি সিদ্ধি সেবন পূর্ব্বক রতি ক্রীড়া করিলে, আশু তেজোহীন হইতে হয়। স্বভাবাতিরিক্ত অতিরিক্ত রতিশক্তি বৃদ্ধিতে স্বাস্থ্যহানি হইয়া থাকে। মদ, তামাক, আফিম গাঁজা গুলি সিদ্ধি সেবনে প্রথম প্রথম কামোদ্দীপন হয় বটে, কিন্তু পরে উহা অত্যন্ত হানিজনক হইয়া উঠে। হরিতকি, কর্পূর ও কাম প্রবৃত্তি নিবারক।

অত্যন্ত মৈথুনকারীদিগের শুক্রক্ষয় সহকারে মজ্জা ও অস্থি ক্ষীণ হইয়া ধাতুক্ষীণ হয়। এবং আনুষঙ্গিক যক্ষা ও শোষ রোগ উপস্থিত হইয়া থাকে।

যক্ষা রোগীর শুক্রক্ষয় ও মল পরিচালন না হওয়াই ভাল। তাহার শুক্রক্ষরণ ও মল পরিচালন হইলে জীবিতাশা নাই।

অত্যন্ত মৈথুন, মল মূত্রাদির বেগধারণ ও শোকগ্রস্ত ব্যক্তির অনাহার জন্য ক্ষয়কাস রোগ হইয়া থাকে। বলবান অথচ অল্পবয়স্ক ব্যক্তির এ পীড়া জন্মিলে চিকিৎসা চলে।

সামান্য কাসরোগ অল্প হইলেও উপেক্ষা না করিয়া আশু তৎউপশম চেষ্টা পাইবে। নতুবা জ্বর, অরুচি, হৃল্লাস, স্বরভেদ ও ক্ষয় প্রভৃতি বিবিধ পীড়া উৎপন্ন হইয়া থাকে।

কাঁকড়া বা সিঙ্গী মাচের ঘৃতপক্ক ঝোল শুঁঠচূর্ণ সহযোগে সেবন করিলে বাতজনিত কাস নাশ হয়।

দশমূলী জল দ্বারা যবাগু প্রস্তুত করিয়া সেবন করিলে শ্বাস, কাস, হিক্কা ও বাতরোগ নষ্ট হয়। এবং অগ্নিবৃদ্ধি ও শুক্রবৃদ্ধি হইয়া থাকে।

বৃহতী, কন্টকারি, কিসমিস; পিপুল, শুঁঠ, বাকস, কর্পূর ও বালার ক্বাথ চিনি ও মধু দিয়া খাইলে পিত্তজনিত কাস দূর হয়।

পিপুল, শুঁঠ, কাকড়াশৃঙ্গী, বামনহাটী, মরিচ, করবী, কণ্টিকারি, নিশিন্দা, যোঁয়ান, চিতা এবং বাকসের ক্বাথ পিপুলের গুঁড়া দিয়া সেবন করিলে কফজনিত কাশ নাশ হইয়া থাকে।

ইক্ষু, ইক্ষুবালিকা, পদ্মকাষ্ঠ, মৃণাল, নীলোৎপল, শ্বেতচন্দন, যষ্টিমধু, পিপুল, দ্রাক্ষা, লাক্ষা, কাকড়াশৃঙ্গী ও শতমূলী সমপরিমাণ, বংশলোচন ইক্ষুর দ্বিগুণ, চিনি সমস্ত বস্তুর চতুর্গুণ মিলাইয়া মধু ও ঘৃত দিয়া লেহন করিলে ক্ষতকাস নিবারণ হয়।

সিমুল গাছের মূল মধুর সহিত বাঁটিয়া খাইলে ক্ষয়কাশ ভাল হয়।

অর্জ্জুন বৃক্ষের ছালের গুঁড়া বাসকের রস দ্বারা সাতবার ভাবনা দিয়া মধু, ঘৃত ও মিসরির সহিত মিশ্রিত করতঃ লেহন করিলে ক্ষয়কাস ও রক্তোদ্গীরণ বারণ হইয়া যায়।

কাস দ্বারা তাপিত, নাসাস্রাব, স্বরের জড়তা, হাঁচি, এবং ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের শক্তি হ্রাস হইলে মনঃশিলা হরিতাল, মরিচ, জটামাংসী, মুস্তক এবং ইঙ্গুদী বৃক্ষদ্বারা তিন দিবস ধূমপান

করিবেক। ধুম পানের পর গুড় মিশ্রিত দুগ্ধ পান করিলে ত্রৈদোষিক সর্ব্বপ্রকার এবং অসাধ্য কাস সকল নিশ্চয়ই প্রশমিত হয়।

মনঃশিলা দ্বারা বদরী পত্র লেপন করত রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া তদ্দারা ধুমপান এবং পরক্ষণে দুগ্ধ পান করিবে। ইহার দ্বারা প্রবৃদ্ধ কাসও নিশিষ্ট হয়।

কণ্টকারি দ্বারা কাথ প্রস্তুত করতঃ পিপুল চূর্ণ মধুসহযোগে পান করিলে সর্ব্ব প্রকার কাস বিনষ্ট হয়।

লঙ্গ, জাতিফল ও পিপ্পলী এই তিনটীর চূর্ণ প্রত্যেকে ২ তোলা মরিচ চূর্ণ ৪ তোলা শুঁঠ চূর্ণ ৩২ তোলা এবং চিনি ৪২ তোলা এই সকল একত্র করিয়া অথবা মোদক প্রস্তুত করিয়া যথা মাত্রায় সেবন করিলে কাস, জ্বর, অরুচি মেহ, গুল্ম, শ্বাস, অগ্নিমান্দ্য এবং গ্রহণীরোগ নষ্ট হয়।

মনঃশিলা, সৈন্ধব, ত্রিকুট, বিড়ঙ্গ, কুড় ও হিঙ্গু এই সকল চূর্ণ করতঃ ঘৃত ও মধু সহ লেহন করিলে কাস, শ্বাস এবং হিক্কা নিবারণ হয়।

হরিতকী, পিপ্পলী, শুঁঠ ও মরিচ, এই সকল গুড়সহযোগে সেবন করিলে কাস ও শ্লেষ্মা নষ্ট হয়, এবং অগ্নি বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

মরিচ ২ তোলা, পিপুল ৪ তোলা, দাড়ীম ফলের ছাল ৮ তোলা, গুড় ৬ তোলা, এবং যবক্ষার ৪ তোলা এই সকল একত্র করিয়া অথবা মোদক প্রস্তুত করিয়া ॥০ অর্দ্ধ তোলা পরিমাণে সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার অসাধ্য কাস নষ্ট হয়, পুয বমনকারী-দের পক্ষেও এই ঔষধ উপকারী।

মরিচ ২ তোলা, পিপ্পলী ২ তোলা, যবক্ষার ১ তোলা,

দাড়ীম ফলের ছাল ৪ তোলা, গুড়ুক ১৬ তোলা, এই সকল একত্রে মোদক প্রস্তুত করিয়া ॥৹ তোলা পরিমাণে গুটিকা করত মুখে ধারণ করিলে সর্ব্বপ্রকার কাস নষ্ট হয়।

বড় বড় শামুক আনিয়া হাঁড়িতে ভরিয়া অগ্নিতে চাপাইয়া চূর্ণ করিয়া পরে ভূমিকুষ্মাণ্ডের রস দিয়া সাতটা ভাবনা দিবেক। এক প্রহর খলে মাড়িয়া বড় মটর প্রমাণ বটিকা করিবেক। ঐ বটিকা ঘৃত মধু চিনি মাখাইয়া খাইবেক। পরে এক বলকের দুগ্ধ /।৹ এক পোয়া খাইবেক। শাক অম্ল নিষেধ। ইহাতে শত বৎসরের বৃদ্ধ যুবার তুল্য হইবেক।

পুষ্টিসাধন—মধু চিনি নবনীত একত্র মিশ্রিত করিয়া লেহন করতঃ ঘৃত দুগ্ধ পান করিলে পুষ্টি সাধন হয়।

ধাইফুল ও সোঁমরাজ পেষণ করতঃ মধুর সহিত ভক্ষণ করিলে দুর্ব্বল ও কৃশ ব্যক্তি স্থূলকায় হয়।

অর্দ্ধসের দুগ্ধ, কচিলাউ আধ পোয়া একত্রে অল্প অল্প জ্বালে পাক করিলে লাউ গলিয়া ক্ষীর হইবেক। তিন দিন সেই ক্ষীর খাইলে প্রমেহ ভাল হইবে।

যজ্ঞডুম্বুরের আটা অর্দ্ধ তোলা, মধু অর্দ্ধ তোলা একত্র করিয়া খাইলে প্রমেহ পীড়া ও ধাতু দৌর্ব্বল্য ভাল হয়।

পদ্ম ফুলের মূল পোড়া ১টা, শ্রীফলের পাতার গাঢ় রস সের ও ভাল ঘৃত /॥৹ সের এই তিন দ্রব্য একত্র করিয়া বাঁটিয়া পিতলের বাটীতে করিয়া পান করিলে ধ্বজভঙ্গ ২।১ দিনে ভাল হয়। পথ্য শাক অম্ল নিষেধ।

নারিকেল তৈল এক ছটাক, চারি আনা মুরদার শঙ্খের সহিত পাক করিয়া গরমীর ঘায়ে দিলে ঘা ভাল হয়।

আসস্থাওড়া বা আচ্ছুটির সাতটা পাতা বিছানার চারি

কাণে, পাশে ও মধ্যস্থলে রাখিয়া প্রত্যহ পরিবর্ত্তন-শয়নে, স্বপ্ন-দাষ নিবৃত্তি হয়। ইহা দেবাজ্ঞা।

বহুমূত্র রোগ হইবার উপক্রম হইয়াছে এমন জানিতে পারিলে, প্রত্যহ যজ্ঞডুম্বুর ভাতে দিয়া তাহাতে কেবল তৈল মাখিয়া খাইলে অল্পদিনের মধ্যে বহুমূত্ররোগ আরাম হইয়া থাকে।

পথ্য।—রুটী, লুচি, উদ্ধৃতসার দুগ্ধ, মাংস, যজ্ঞডুম্বুর, মোচা, লা ও ঝিঙ্গা প্রভৃতি ব্যঞ্জন, ব্যায়াম ইত্যাদি।

অপথ্য।—কফজনক ও গুরুপাক দ্রব্য, দধি, দুগ্ধ, গুড়াদি, বানিদ্রা ও শ্রমবর্জ্জন ইত্যাদি।

মহিষ দুগ্ধের নবনীত ও লালিগুড় সমপরিমাণে লইয়া দুইয়ের সমান মধুকুলের বীজের ভিতরের শাঁস বাটিয়া যে লোক আপন অঙ্গে মর্দ্দন করে, তাহার তেজ ও সৌন্দর্য্য দ্ধ হয়।

যবচূর্ণ, শ্বেত সর্ষপ, যষ্টিমধু সমভাগে চূর্ণ করিয়া স্ত্রীলোকে ত্রে মাখিলে উত্তম কান্তি বিশিষ্টা হয়।

বচ ও দাড়িম্ব পেষণ করিয়া তাহা সর্ষপ তৈল দ্বারা পাক রিয়া, সেই তৈল স্তনে লেপন করিলে নারীর স্তনদ্বয় অতিশয় া উন্নত ও সুশ্রী হয়।

মুখে দুর্গন্ধ হইলে কচি আমপাতা দগ্ধ করতঃ দন্ত মার্জ্জন রিলে ভাল হয়।

আকুলা বেলের শিকড় কোমরে বাঁধিয়া দিলে স্ত্রীলোকের ক্স্রাব ভাল হয়।

চাঁপানটের শিকড় ২ তোলা ও দুই টা জবা ফুলের কুঁড় টয়া জল দিয়া গুলিয়া খাইলে স্ত্রীলোকের প্রদর পীড়া রোগ্য হয়।

বন্য কুকুরের লোম কলার ভিতর করিয়া খাওয়াইলে কুকুর দংষ্ট্র রোগী ভাল হয়।

অপর শৃগালের লোম কলার ভিতর করিয়া খাওয়াইলে জম্বুক দষ্ট ব্যক্তি ভাল হইবে।

সর্পদংষ্ট্র ব্যক্তির দংষ্ট্র স্থানে উত্তমরূপে মনসা বৃক্ষের আঠা লাগাইয়া দিয়া উক্ত বৃক্ষের পত্রের এক ছটাক রস রোগীকে পান করাইলে তাহাতে সর্পদংষ্ট্র ব্যক্তি আরোগ্য লাভ করিবে।

ওলাউঠা অতি ভয়ানক পীড়া। এজন্য গৃহস্থ মাত্রেরই এক এক শিশি রুবেনি কর্পূরের আরক ঘরে রাখা উচিত। ওলাউঠার লক্ষণ বা পূর্ব্বলক্ষণ দেখিবামাত্র অর্দ্ধ ছটাক পরিমাণে ৩।৪ বার রোগীকে সেবন করাইলে পীড়ার বৃদ্ধি হয় না।

চিকিৎসা শাস্ত্র অগাধ অমৃত সমুদ্র বিশেষ। গৃহস্থগণের মঙ্গলোদ্দেশে আমরা তাহার এক বিন্দু মাত্র গুপ্তগৃহে ছিটাইয়া দিলাম। দেহ রক্ষার্থ আয়ুর্ব্বেদ ও আত্মরক্ষার্থে ধর্ম্ম শাস্ত্র ও ভজন সঙ্গীত শিক্ষা করা সকলেরই কর্ত্তব্য।